# কবীর সুমন

# দূরের জানলা



নিউটন দা

"চাঁদ গাছের ওপর দাঁড়ান"



পাঁচমি, সন্ত. ২০১৬.

# দূরের জানলা

কবীর সুমন



সপ্তর্ষি প্রকাশন

সপ্তর্ষি প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৯
© : কবীর সুমন
প্রচ্ছদ : রাজীব চক্রবর্তী
সঞ্জীব চক্রবর্তী

সপ্তর্ষি প্রকাশন-এর পক্ষে স্বাতী রায়চৌধুরী কর্তৃক
৪৪এ, চক্রবর্তী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলি থেকে
প্রকাশিত এবং টাইপ সেটার, ১৯ই, গোয়াবাগান স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত

প্রকাশন-এর সঙ্গে যোগাযোগ

৬৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কল-৯
চলভাষ : ৯৮৩০৩-৭১৪৬৭/৯৮৩০২-১৪৬৮১

সপ্তর্ষি-র বই পাবেন

দে'জ/ দে বুক স্টোর/বুকফ্রেন্ড/চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জী/আদি নাথ ব্রাদার্স-কলেজস্ট্রিট
বুকওয়ার্ম (উত্তরপাড়া) বুকস্ এবং সেন্ট্রাল বুক হাউস (শিলিগুড়ি)/
পুস্তকমহল (ভুবনডাঙা, শান্তিনিকেতন)

দাম : ১২৫ টাকা

উৎসর্গ

শ্রী সাগরময় ঘোষ-এর স্মৃতিতে
যাঁর প্রশ্রয় ছাড়া এই লেখাগুলি তৈরি হত না।

# নতুন সংস্করণের ভূমিকা

১৯৭৬ সাল থেকে আমি কলকাতার দেশ পত্রিকার জন্য নিবন্ধ লেখা শুরু করি। এমনভাবে শুরু করলাম যেন আমি বিরাট কেউ, যার লেখা পাওয়ার জন্য দেশ পত্রিকা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে থাকতেন। সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মহাশয়, যাঁর মতো স্নেহশীল মানুষ আমি কমই দেখেছি, আমার আর্জি-চিঠি আর একটি লেখা পড়ে হয়ত মনে করেছিলেন ছোকরার লেখা ছাপা যেতে পারে। আমার বয়স তখন ২৭, থাকি তখন পশ্চিম জার্মানিতে। এইভাবে আমি জার্মানির সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য বিষয়ে থেকে থেকেই প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখতে এবং সেগুলি সাগরময় ঘোষ মহাশয়কে পাঠিয়ে দিতে থাকি। উনি সেগুলি দেশ পত্রিকায় ছাপাতে থাকেন। এর পর আমি ১৯৭৯ সালে কিছু মাস কলকাতায় ছিলাম, ভয়েস অফ জার্মানির বাংলা বিভাগের হয়ে সংবাদদাতার কাজ করতাম ফ্রি-লান্সার হিসেবে, আর প্রবন্ধ লিখতাম। সেরকম কিছু লিখলেই লেখাটি নিয়ে সটান চলে যেতাম দেশ পত্রিকার দপ্তরে সাগরময় ঘোষের কাছে। তাঁকে পড়তে দিতাম। তিনি বলতেন, রেখে যাও, পড়ে দেখব। পরে কখনও তাঁর মতামত জানতে চলে যেতাম তাঁর দপ্তরে। প্রত্যেক বারই শুনতাম : ও, ঐ লেখাটা? ওটা তো আমি ছাপতে দিয়ে দিয়েছি। —আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি। লেখা নিয়ে এ-ছাড়া কোনও মন্তব্যই তিনি করতেন না। তখনও আমি সুমন চট্টোপাধ্যায় নামেই লিখতাম। ১৯৮০ সালে আমি চাকরি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চলে গেলাম। সাগরময় ঘোষ আমায় একদিন চিঠি

লিখে জানালেন আমার কাছ থেকে তিনি প্রতি মাসে একটি লেখা চান। ফিচারের নাম কী দেওয়া যায়? আমার প্রস্তাব ছিল 'দূরের জানলা।' তিনি মেনে নিলেন। ওয়াশিংটনে ভয়েস অফ আমেরিকার অফিসে শুনছিলাম নিজের নামে আমি বাইরে কিছু লিখতে পারব না। তাই নাম নিলাম 'মানব মিত্র।' তার পর থেকে কয়েক বছর ধরে লিখে গিয়েছি মাসিক ফিচার। আমেরিকা থেকে চলে আসার পর কলকাতায় বসেও প্রবন্ধ লিখেছি দেশ-এর জন্য। ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় দফায় জার্মানিতে বেতার সাংবাদিকের চাকরি করতে গিয়েও মাঝেমাঝে লিখেছি দেশ পত্রিকায়। 'দূরের জানলা'র সময় থেকে সেই যে মানব মিত্র নামে লিখেছি, অন্য কোনও নাম আর ব্যবহার করিনি।

কিছু বছর আগে কয়েকজন বাঙালি তরুণ তরুণী 'দূরের জানলা' নামে আমার সেই সময়কার লেখাগুলির একটি সংকলন প্রকাশ করেন। কী হল সেই সংকলনের কে জানে। বইটি চোখে দেখেছিলাম বিলক্ষণ। প্রকাশকদের তারপর না দেখেছি চোখে, না শুনেছি তাঁদের বাঁশি। বইটি আদৌ কেউ কিনল কিনা, কিনলে ক'জন, তার কিছুই জানাননি তাঁরা আমায়। পরে লোকমুখে শুনেছি তাঁদের মধ্যে এক যুবক আমার সম্পর্কে নানান কথা বলে বেড়াচ্ছেন, যার একটি হল আমি 'শোধনবাদী' হয়ে গিয়েছি। কবে যে শোধন-না-করে-খাও-বাদী ছিলাম জানি না। ঠিক যেমন জানি না বইটি ক' কপি বিক্রি হয়েছিল। এই যে সপ্তর্ষি প্রকাশন 'দূরের জানলা' বইটি আবার প্রকাশ করছেন তার কারণ কী আমি জানি না। আশ্চর্য, সপ্তর্ষি আমায় প্রত্যেক বছর রয়্যালটি দেন। যেরকম বিক্রি হয় সেই হিসেবে। এটাও এক রহস্য। সপ্তর্ষি আমার লেখা গানের সংকলন ছাড়াও আমার আরও কিছু বই বের করেছেন, এমনকি দুটি উপন্যাস। বই মেলায় ওঁদের স্টলে গেলে বইগুলি দেখা যায়। মাঝেমাঝে বই মেলায় গিয়ে দেখি। বেশ লাগে। আমার নাম উল্লেখ করার সময়ে বাঙালি অবশ্য আমায় 'গায়ক'ই বলেন। কেউ কেউ আবার শখ করে আমায় 'কবি'ও বলে থাকেন। তাঁদের ধারণা আমি কবিতা লিখেছি, এখনও লিখছি। এই হল কবিতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা। 'দূরের জানলা' কেউ পড়বে বলে আমার মনে হয় না। হিসেব করে দেখেছি জনা তিরিশ মানুষ আমার গানবাজনা সম্পর্কে বেশ খোঁজখবর রাখেন। হয়ত তাঁরাই পড়বেন, ভালবাসার জায়গা থেকে।

যা বুঝেছি, সপ্তর্ষি আমায় ভালবাসেন। আমিও তাঁদের ভালবাসি। ল্যাঠা চুকে গেল।

সুমন চট্টোপাধ্যায় মানব মিত্র হয়েছিল একদিন। তারও ঢের পরে একদিন সুমন চট্টোপাধ্যায় আর মানব মিত্র মিলে কবীর সুমন হয়ে গিয়েছিল। সেই নামেই আমি বর্তমান। এই তো, হয়ে এল। শিগ্‌গিরিই একদিন আমার অসংখ্য শত্রুর মুখে মধু দিয়ে আমি এই নামটি নিয়েই অতীত হয়ে যাব।

বিনীত

**কবীর সুমন**

১৯/জি, বৈষ্ণবঘাটা বাই লেন

কলকাতা ৭০০০৪৭

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ছেলেবেলা থেকে ব্যাপক সংগীত শিক্ষা এবং বেশ অল্প বয়সে সংগীত জগতে প্রবেশ সত্ত্বেও সংগীতকে আমি প্রথমে পেশা করে তুলতে পারিনি। অথচ সব দিক বিচার করলে বোঝা যায় এই কাজটাই আমার পেশা হওয়া উচিত ছিল, কারণ এটা ছাড়া জীবনে আর কিছুই তো বিশেষ শিখিনি।

কলেজের একটা ডিগ্রি কোনওরকমে জোগাড় করে আমি চাকরিতে ঢুকি একুশ বছর বয়সে। তারপরে ঘটনাচক্রে, কালক্রমে যুক্ত হয়ে পড়ি তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির শর্টওয়েভ বেতার কেন্দ্রর সঙ্গে। ভয়েস অফ জার্মানির কাজ করতে গিয়ে অনুবাদ, লেখা ইত্যাদি শুরু। তারপর তেরো-চোদ্দো বছর প্রধানত লেখাই ছিল আমার পেশা। সেইসঙ্গে—বলা। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি দু'দফা ভয়েস অফ জার্মানির আর এক দফা ভয়েস অফ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। চাকরি করেছি ওই দুই বেতারকেন্দ্রে লেখক-ঘোষক-পাঠক-সাংবাদিক হিসেবে।

১৯৭৬ সালে আমি জার্মানি থেকে 'দেশ' পত্রিকার জন্য লিখতে শুরু করেছিলাম। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের প্রশ্রয় ও উৎসাহ ছাড়া এটা সম্ভব হতো না।

আমেরিকা থেকে পাঠানো আমার লেখাগুলি 'দেশ'-এ ছাপানো হতো 'দূরের জানলা' শিরোনামে। নামটি আমারই দেওয়া। ভয়েস অফ আমেরিকার চাকরি করতে গিয়ে জানলাম যে আমি আর বাইরের পত্রিকার জন্য লিখতে পারব না। অগত্যা আমি 'মানব মিত্র' ছদ্মনামে লেখা শুরু করলাম। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমি এই নামেই 'দেশ' ও সমর সেনের 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার জন্য লিখেছি।

১৯৮৬ সালে তিন বছরের চুক্তিতে দ্বিতীয় বার ভয়েস অফ জার্মানির চাকরি নিয়ে কোলোন শহরে গেলাম। সেখান থেকে আবার কিছু লেখা পাঠালাম 'দেশ'-এ। ওই পত্রিকায় আমার শেষ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। সে-বছর

আমি বিদেশের পাট পাকাপাকি চুকিয়ে কলকাতায় চলে আসি। ১৯৯১ সাল থেকে সংগীতই আমার পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

'দেশ' পত্রিকায় আমার লেখা যত নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বেছে নিয়ে তৈরি করলাম এই সংকলনটি। বিষয়গুলির সঙ্গে 'দূরের জানলা' নামটির মিল আছে। সংকলনটি তাই এই নামটাই পেল। উল্লেখ করা দরকার, কলকাতায় বসে লেখা তিনটি নিবন্ধও এতে স্থান পেয়েছে : 'ছাত্র আন্দোলনের দশক ও রুডি ডুচ্‌কে', 'হালরাফ : এক অ-সাধারণ লেখক' এবং 'নিকারাগুয়া : বন্ধন ও মুক্তি।' এই তিনটি লেখা 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল '৭৯, '৮০, '৮৬ সালে।

নিবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণ ও সংকলিত করার অনুমতি দিয়েছেন 'দেশ'। আমি কৃতজ্ঞ।

**কবীর সুমন**

সূচি


| | |
|---|---|
| কাহিনিকার হাইন্‌রিখ ব্যোল্‌ | ১৩ |
| হ্যালরাফ : এক অ-সাধারণ লেখক | ২৬ |
| ছাত্র আন্দোলনের দশক ও রুডি ডুচ্‌কে | ৩৯ |
| ''নাইনটিন এইট্টিফোর'' | ৫৬ |
| গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস | ৬৪ |
| প্রসঙ্গ : দেওয়াল | ৮০ |
| তলিয়ে যাবার আগে | ৮৪ |
| এক ঝলক রোদ্দুর একটা পোস্টার | ৯৫ |
| কাহিনিকার সল বেলো | ৯৯ |
| অ্যাটেনবোরোর গান্ধী | ১০৪ |
| মিরোস্‌লাভ হোলুব | ১০৯ |
| জর্জ ষ্টাইনার | ১১৬ |
| আমেরিকার বই বাজার | ১২৩ |
| আমেরিকার শিক্ষা জগৎ | ১৩০ |
| পারিশ্রমিকের বৈষম্য | ১৩৭ |
| সাক্ষাৎকার : মার্গারেট র‍্যানডাল | ১৪৩ |
| নিকারাগুয়া : বন্ধন ও মুক্তি | ১৫১ |
| আট বছর পরের একদিন | ১৬৭ |
| ক্লাউন কিন্তু মেয়ে | ১৭২ |
| গান ও নির্বাসন | ১৭৬ |
| বার্‌বারার চোখে রবীন্দ্রনাথ | ১৮১ |

# কাহিনিকার হাইন্‌রিখ ব্যোল্‌

"১৯৪৫ সালের ৮ই মে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। সীমাহীন গ্লানি ও ক্লান্তির মধ্যে হিটলারের জার্মানি পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। জার্মানির পেছনে তখন ফ্যাসিবাদের সদ্য ফুরোনো অমানুষিক অধ্যায়। জার্মানির ওপরে রয়েছে যুদ্ধ জয়ী মিত্রশক্তিরা। জার্মানির ভেতরে ভগ্নস্তূপ, উদভ্রান্ত মানুষ, চূড়ান্ত দুর্দশা, কালোবাজারিদের মগের মুলুক। আর জার্মানির সামনে? না, সেই মুহূর্তে অন্তত জার্মানির সামনে অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

সেদিনের সেই ভাঙা জার্মানিরই এক ভাঙা শহরের কথা ভাবুন একবার। নাম তার কোলোন। যুদ্ধ শেষের কোলোন বোমা বিধ্বস্ত এক শহরের কঙ্কাল। লক্ষণীয় ভাবে অক্ষত আছে কেবল কোলোনের প্রসিদ্ধ গির্জা আর অলক্ষ্যে অক্ষত রয়েছে যা কিছু তাদের মধ্যে একটি হল পুরনো টাইপরাইটার, যুদ্ধ সত্ত্বেও যা আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গিয়েছিল।"—এ কথা যিনি লিখছেন তাঁর নাম হাইন্‌রিখ ব্যোল্‌!

১৯১৭ সালে ২১ ডিসেম্বর ঐ কোলোন শহরেই হাইন্‌রিখ ব্যোলের জন্ম। ঐ শহরেই বড় হয়েছেন তিনি, লেখাপড়া করেছেন। ঐ কোলোন শহর থেকেই তিনি যুদ্ধে গেছেন। ছ'বছর পর ফিরে এসেছেন আবার সেই কোলোনেই। এবং ঐ শহরেরই বোমা বিধ্বস্ত এক বাড়িতে বসে পুরনো সেই টাইপরাইটারে লিখেছেন তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস, যা আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত থেকে গেছে। উপন্যাসটি লিখেছিলেন

তিনি ১৯৪৬ সালে। লেখার প্রেরণা ছিল এক রচনা প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী পাণ্ডুলিপিখানি কোনও মন্তব্য ছাড়াই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ব্যোল্ স্মৃতিচারণ করেছেন : "প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীকে বাদ দিই যদি লেখাটা যাঁরা, আশা করি, সত্যিই পড়েছিলেন—উপন্যাসটির পাঠক তা হলে দাঁড়ায় মোট চারজন : আমার স্ত্রী, আমার বোন, আমার এক শ্যালিকা ও তাঁর বান্ধবী।" আর আজ? ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে হাইন্‌রিখ ব্যোল্ ১৯৭২-এর নোবেল পুরস্কার-সহ মোট কুড়িটি দেশি ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কারে ও খেতাবে ভূষিত হয়েছেন—এই তথ্যই আমাদের অনুমান করতে সাহায্য করবে, তাঁর পাঠক সংখ্যা আজ কত হতে পারে।

সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ বেতার নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লেখায় হাইন্‌রিখ ব্যোল্ সিদ্ধহস্ত হলেও মুখ্যত তিনি কাহিনিকার হিসেবেই পরিচিত। যুদ্ধোত্তর জার্মান সাহিত্য জগতে তিনি নিঃসন্দেহে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার।

এ লেখার শুরুতেই যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির উল্লেখ ধান ভানতে শিবের গীত নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জার্মানির সমাজ ও জনজীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। সাহিত্য তো সমাজ ও জনজীবন থেকেই জন্মায়। কাজেই যুদ্ধের ধ্বংসকাণ্ড থেকে সাহিত্যও রেহাই পায়নি। অবশ্য যুদ্ধই যে জার্মান শিল্প সাহিত্যের বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ, তা নয়। এ ব্যাপারে জাতীয় সমাজতন্ত্র, তার প্রবক্তাগণ ও অনুগামীদের অবদান আরও বেশি বই কম নয়। ১৯৩৩ এ নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পরই জার্মানিতে সুস্থ সাহিত্য পঙ্গু হয়ে যায় মানে তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। ফ্যাসিবাদের ধামা না ধরে (সে প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক), নাৎসিদের মন যুগিয়ে না চলে তখন জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মানিতে বসে লেখা ও সে লেখা প্রকাশ করা অসম্ভব। ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারি হিটলার ক্ষমতায় আসেন। আর সে বছরেরই ৭ মে প্রশীয় শিল্প অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট হাইন্‌রিখ মানকে পদচ্যুত করে এবং ১৩ মে জার্মানির বড় বড় শহরে জাতীয় সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক ও অসুবিধাজনক বইপত্তর ঘটা করে পুড়িয়ে নাৎসিরা ৪৪ জন লেখকের নাম উল্লেখপূর্বক একটি কালো তালিকা বের করে। ঐ ৪৪ জনের মধ্যে ছিলেন ঠোমাস্ মান্, হাইন্‌রিখ মান্, বের্টোল্ট ব্রেষ্ট্, রেমার্ক, আর্নোল্ট ও স্টেফন্ টস্ ভাইখ, কুর্ট টুখলস্কি প্রভৃতি। এঁরা সকলেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। ফলে জার্মান সাহিত্য তারপর থেকে প্রধানত নির্বাসনেই রচিত হতে থাকে। আর জার্মানির সাহিত্য জগতে জার্মানির অন্যান্য 'জগতের' মতই বিরাজ করতে থাকে অন্ধকার। যুদ্ধ শেষে দেশ ছাড়া লেখকরা ফিরে এলেন বটে, তবে ফিরলেন তাঁরা এক অন্ধকার জার্মানিতে। ৬ বছর ফ্রন্টে কাটিয়ে আর একজনও ফিরেছিলেন সেদিন সেই অন্ধকারে। আর সেই অন্ধকার থেকেই সেদিনের নবীন লেখক হাইন্‌রিখ ব্যোলের যাত্রা শুরু।

হাইন্‌রিখ ব্যোলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম "Der Zug war Puenktlich"। হুবহু বাঙলা অনুবাদ ঠিক জুতসই হবে না। অর্থ বজায় রেখে একটু ঘুরিয়ে তর্জমা করলে দাঁড়ায় "ট্রেন দেরি করেনি"। প্রকাশকাল ১৯৪৯। তার ঠিক দু বছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "Wo warst du Adam?" বা "আদম তুমি কোথায় ছিলে?" দুটি উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু হল যুদ্ধ। প্রথম উপন্যাসে কাহিনির কাঠামোটি হল এইরকম : এক তরুণ সৈনিক ছুটি কাটিয়ে ট্রেনে করে ফ্রন্টে ফিরে যাচ্ছে। এইখানেই কাহিনি শুরু। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় একঘেয়েমি ফ্রন্ট যাত্রী অন্যান্য সৈনিকদের কথা—এই নিয়ে উপন্যাসের মাঝের অংশ। কাহিনির শেষে সেই সৈনিকের মৃত্যু। প্রথম উপন্যাসেই একটা ব্যাপার লক্ষ করার মত। ব্যোল্ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিচ্ছেন না। কাহিনির অগ্রভূমিতে যারা রয়েছে তারা মানুষ। সাধারণ মানুষ। যাদের মধ্যে বেশির ভাগই অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। "ট্রেন দেরি করেনি" উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র হল অমনই এক অনিচ্ছুক সৈনিক, ফ্রন্টগামী ট্রেন ধরতে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় সে তার বন্দুকটা নিতেই ভুলে গেছে। প্রথম উপন্যাসটি হয়ত ব্যোলের উত্তীর্ণ কাহিনিগুলোর দলভুক্ত করা যাবে না। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্যের ও ক্ষমতার আভাস সেখানে যথেষ্ট মিলেছে। বোঝা গেছে, যুদ্ধ জর্জরিত জার্মান চেতনার প্রতিভূ হয়েও, মনে প্রাণে কট্টর যুদ্ধ-বিরোধী হয়েও ব্যোল্ অতিনাটকীয়তায় ও ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন না—যুদ্ধকে কাহিনির বিষয়বস্তু করলেও না। দেখা গেছে, বাহুল্য বর্জিত বর্ণনার মাধ্যমে ছোট ছোট ঘটনা জোড়া দিয়ে তিনি এক বিস্তৃত পটভূমি তৈরি করতে পারেন (১৯৭১ এ প্রকাশিত "Gruppenbild mit Dame" বা "মহিলাসহ গ্রুপ ছবি" উপন্যাসে যার চূড়ান্ত স্ফুরণ দেখা গেছে)। আর দেখা গেছে যে, ছোট পরিসরের মধ্যে অনেকগুলি চরিত্রকে এনে তাদের প্রত্যেকের প্রতিই সুবিচার করার ক্ষমতা তিনি রাখেন।

১৯৫১ সালে প্রকাশিত "আদম, তুমি কোথায় ছিলে?" বোধ হয় হাইন্‌রিখ ব্যোলের প্রথম উত্তীর্ণ উপন্যাস। প্রথম উপন্যাসটিতে তাঁর ক্ষমতার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। আর দ্বিতীয়টিতে পাওয়া গেল তার সাক্ষাৎ। এখানে বলে রাখা দরকার, ব্যোলের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আগেই বলেছি সেগুলির চমকপ্রদ কিছু প্রতিভূ স্বরূপ তাঁর লেখা ছোট গল্পের একটি সংকলন দ্বিতীয় উপন্যাসটির আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ছোটগল্পগুলি স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন বলে সেই সংকলনটির কথা পরে বলব।

"আদম, তুমি কোথায় ছিলে?" বাইবেলের গল্প না। তারও উপজীব্য হল যুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নামটি ব্যোল্ ধার করেছেন ঠেওডোর হ্যেকারের একটি লেখা থেকে। শিথিল তর্জমায় তা এইরকম দাঁড়ায় : এক বিশ্ব বিপর্যয় নানান কাজে লাগতে পারে। এমনকি ঈশ্বরের সম্মুখে এক অজুহাত খোঁজাতেও। আদম, তুমি কোথায় ছিলে?—"আমি ছিলাম বিশ্বযুদ্ধে।"

বলাবাহুল্য ব্যোল্ নিজেই তাঁর কাহিনির আগে কথাগুলি উদ্ধৃত করেছেন। উপন্যাসের নাম ও উদ্ধৃতি দেখেই বোঝা যায়, যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যোলের মনোভাব কেমন? এই উপন্যাসে ব্যোল্ মাঝে মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে সে বর্ণনায় যুদ্ধ জর্জরিত যোদ্ধাদের ভূমিকাই আসল। কাহিনির শেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও তার শেষ ধাপে এসে গেছে। অবশ্য একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কাহিনির নায়ক ফাইন্হালস্, যে সৈনিক ছিল, যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরছে। যে অঞ্চলে তার বাড়ি সে অঞ্চল মার্কিনিদের দখলে এসে গেলেও জার্মানরা মাঝে মধ্যে আক্রমণ করছে। ফাইন্হালস্ পথ থেকেই দেখতে পাচ্ছে তার বাবার বাড়ির ওপর সাদা নিশান। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই কাহিনি শুরু হল। ফাইন্হালস্ বাড়ি পৌঁছল বটে, তবে বাড়িতে ঢোকা আর তার হল না। যে গ্রেনেড তাকে শেষ করল তার আগের গ্রেনেডটা পড়ার আগেই সে মাটিতে শুয়ে পড়েছে,—কতকটা আঁচ করেই—এবং সে বুঝতে পেরেছে যে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। এই উপন্যাসে গঠনের দিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কাহিনির শেষ ভাগ। ফাইন্হালস্‌ের যে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হবে তা বই-এর একেবারে শেষের দেড় পাতা আগে বোঝা যায়নি। এই আকস্মিকতা ব্যোল্ প্রশংসনীয় ভাবে এনেছেন। এরিখ মারিয়া রেমার্কের লেখা "Zeit Zu Leben Zeit Zu Sterben" এ (ইংরেজি অনুবাদে বইটি "A time to love and a time to die" নামে এত পরিচিত যে, এ নামের বাঙলা অনুবাদ বাহুল্য) নায়ক গ্রেবার যে শেষে মারা যাবে তা রেমার্কের লেখার ধরন থেকে বেশ কিছুটা আগেই যেন আঁচ করা যায়। তার মানে এই নয় যে, রেমার্কের উপন্যাসটি নিকৃষ্টতর। লক্ষণীয় হল এই যে, রেমার্কের উপন্যাসে মৃত্যুর স্বাদ এক, ব্যোলের উপন্যাসটিতে তা আবার অন্য। রেমার্কের নায়ক ছুটি কাটাতে এসে ঘর বেঁধে আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে গেল। আর ব্যোলের নায়ক যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরেও ফিরল না। ঐ 'ফিরেও না ফেরার' মধ্যে যুদ্ধের সাংঘাতিক অনিশ্চয়তার স্বাদ পাওয়া যায়। ফরাসি বৈমানিক লেখক আঁতোয়ান দ্য স্যাঁতেগ্জ্যাপারির সুরে সুর মিলিয়ে হাইন্রিখ ব্যোলও বলেছেন, "যুদ্ধ হল এক অসুখ।" মারাত্মক এক অসুখ প্রায় আরোগ্যর কুহক সৃষ্টি করেও যে অসুখ আচমকা মরণ কামড় দিতে পারে।

দ্বিতীয় উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই ১৯৫০ সালে হাইন্রিখ ব্যোলের লেখা ছোটগল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়ে গেছে। এবং এই বইটি লিখে ব্যোল্ যুদ্ধোত্তর জার্মান সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। কালানুক্রমে লিখলে "আদম তুমি কোথায় ছিলে?"—এই বইয়ের আগেই ছোটগল্পের এই সংকলনটির ("Wonderer Kommst du nach spa...") কথা বলা উচিত। প্রকাশকাল অনুসারে ব্যোলের সাহিত্য কর্ম সম্বন্ধে লিখতে বসেও আমি তাঁর দ্বিতীয় বইটির কথা তাঁর তৃতীয় বইটির পরে লিখছি, কারণ হাইন্রিখ ব্যোলের প্রথম উপন্যাস দুটির মূল বিষয়বস্তু যেমন শুধুই যুদ্ধ, তাঁর গল্প সংকলনের কাহিনিগুলির উপজীব্য তেমনি যুদ্ধ ও যুদ্ধ শেষের

জার্মানি। যুদ্ধ শেষে জার্মানি আর যুদ্ধোত্তর জার্মানি আলাদা। যুদ্ধোত্তর জার্মানি বলতে আজকের জার্মানিকেও বোঝায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষের জার্মানি বলতে বোঝায় ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮-এর মুদ্রাসংস্কারের মধ্যবর্তী সময়কার জার্মানি। ঐ সময়ে জার্মানির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। ব্যোলের ছোটগল্পগুলিতে তারই পরিচয় মেলে।

ছোটগল্পের এই প্রথম সংকলনেই গল্পকার হিসেবে ব্যোলের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায়, যুদ্ধ ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময়কার মানুষী দুর্দশা, সমাজের মর্মান্তিক ভগ্নদশা তিনি ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে কি নিটোল ভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখেন। প্রতিটি গল্প শুধু সাহিত্যের মাপকাঠিতেই যে ছোট তা নয়, নিছক আকৃতির দিক দিয়েও তা ছোট। অথচ ঐ স্বল্প পরিসরের মধ্যেও ব্যোল্, এক একটি গল্পে যুদ্ধ জর্জরিত মানুষের সমাজ ভাঙা মুখের এক একটি স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। শত দুর্দশার মধ্যেই আবার কখনও কখনও মানুষী আশা জ্বলে উঠেছে আশ্চর্য চক্‌মকিতে জ্বালা স্ফুলিঙ্গের মত। মানুষই যুদ্ধ করেছিল। এত রক্তপাত, এত ধ্বংসের জন্য মানুষই দায়ী। এই সার কথা মেনে নিয়েও ব্যোল্ সেদিন আবার মানুষের মধ্যেই, সাধারণ মানুষের ভেতরই আশার স্ফুলিঙ্গ খুঁজেছেন। তিনি আশাবাদী, তবে নম্রতার সঙ্গে নিজের ও কালের সীমা মেনে নিয়ে সরব না হয়ে।

ঐ একই সংকলনের অন্তত তিনটি গল্পে লেখক ব্যোলের আর এক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। দেখা যায়, শ্লেষ ও বিদ্রূপ তাঁর হাতে ভাল আসে। "Mein trauriges Gesichi" বা "আমার বিষণ্ণমুখ" নামে একটি গল্পে যেমন, গল্পের নায়ককে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে, কারণ তার মুখের অভিব্যক্তি বড় করুণ। তার ৩৬ ঘণ্টা আগেই দেশে এই মর্মে নতুন আইন প্রণীত হয়েছে যে, সকলকে সুখী হতে হবে। পরে, থানায় জানা গেল যে তার সর্বশেষ অপরাধের জন্য জেল খেটে সে তার আগের দিনেই সবে ছাড়া পেয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু উপলক্ষে যেখানে সর্বত্র শোক উদ্‌যাপনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তার মুখ ছিল সুখী সুখী। এই ছিল গতবার তার অপরাধ। তবে মোটের ওপর দেখতে গেলে যুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময় থেকে ব্যোল্ যথা সম্ভব ক্ষমতার সঙ্গেই তাঁর গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদি বৃত্তি তাই বলে যে তিনি শিকেয় তুলেছেন তা নয়। অথচ সবকিছু সত্ত্বেও মমতার এক প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা তাঁর সেই সময়কার গল্পে অনুভব না করার জো নেই। কিন্তু ১৯৫২ সালে প্রকাশিত "Nicht nur Zur Weihnachtszeit" বা "শুধুমাত্র বড় দিনেই নয়" নামে বড় গল্পে তিনি নির্মম। ঐ গল্পে শ্লেষ ও বিদ্রূপকেই করলেন তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর লেখার বাহন। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই এক শ্রেণীর মানুষ যাবতীয় মানসিক দায়িত্ব ভুলে কেমন অন্তঃসারশূন্য উৎসব আনন্দের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে ব্যোল্ বলছেন তাঁরই কাহিনি।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে হাইন্‌রিখ ব্যোলের তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। "Und sagte kein einziges Wort" বা "কোন কথা না বলে" "Haus Ohne Hueter" বা রক্ষকহীন সংসার ও "Das Brot derfruehen Jahre" বা ছেলেবেলার রুটি"। এই উপন্যাসগুলির বাঙলা নাম জার্মান থেকে হুবহু অনুবাদ করলে তেমন দাঁড়ায় না বলে মূল জার্মান নামের প্রতি আমার সীমায়িত সাধ্য অনুযায়ী যথা সম্ভব সুবিচার করে কাহিনির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই আমি বাঙলা নামগুলো লিখলাম। এই তিনটে উপন্যাসেরই উপজীব্য হল যুদ্ধোত্তর জার্মানি। "কোন কথা না বলে" ও "রক্ষকহীন সংসার" উপন্যাস দুটিতে পারিবারিক জীবনই হল কেন্দ্রবিন্দু। পরিবেশ সম্পর্কে কর্তব্যবোধ ঔপন্যাসিককে নীতিবাদীর ভূমিকা দিতে পারে। ব্যোল্‌র সব উপন্যাসেই এই মৌল নীতিবাদ লক্ষ্য করার মত। তবে তিনি নীতিবাগীশ নন। উল্লেখিত দুটি উপন্যাস সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। তাঁর সাহিত্যের শেকড় রয়েছে সমাজের ভূমিতে গাঁথা। সামাজিক ও মানবিক কর্তব্য বোধ তাঁর এত বেশি বলেই আজ পর্যন্ত তিনি পশ্চিম জার্মানির সমাজে যেখানেই অন্যায়, অবিচার, সংকীর্ণতা দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদে বিদ্রুপে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এজন্য হাইন্‌রিখ ব্যোল্‌কে ব্যক্তিগত ভাবে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে কম মূল্য দিতে হয়নি।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত উপন্যাস তিনটির মধ্যে শেষেরটিই (অর্থাৎ "ছেলেবেলার রুটি") বিষয়বস্তু ও শৈলীর দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য। শুধু তাই নয়, "ছেলেবেলার রুটি" হল ব্যোলের লেখা দীঘতম প্রেমের কাহিনি। এ উপন্যাসের তেইশ বছর বয়সী নায়ক "ভাল্‌টার" তার বাবার অনুরোধে একটি মেয়েকে (যে এখন শিক্ষিকা হবার উদ্দেশ্যে পড়াশুনো করার জন্য বড় শহরে আসছে) স্টেশন থেকে আনতে গেল। ভাল্‌টার, ছেলেবেলায় যুদ্ধ শেষের দিনগুলোর ক্ষিদের ও অভাবের স্মৃতি যে ভুলতে পারেনি, এক কট্টর বস্তুবাদী। ক্ষিদের মুখে রুটিই হল তার জীবনে সুখের ও পূর্ণতার একমাত্র প্রতীক। অভাবের মর্ম সে এত ভাল বোঝে যে, অর্থ, ও অর্থ দিয়ে যা কিছু কেনা যায় তাই-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর জীবনের কেন্দ্র। এ হেন ভাল্‌টারের জীবনে 'হেড্‌ভিখ' নামে ঐ মেয়েটি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিল। তার সঙ্গে পরিচিত হবার পর সে প্রথম বুঝতে পারল যে, ক্ষিদে ও নিছক ক্ষুন্নিবৃত্তির বাইরেও জীবনের এমন একটা দিক আছে, যে দিকটা তার অচেনা। কিন্তু অচেনাকে চিনে নেবার, খুঁজে নেবার, নতুন পথে পা বাড়াবার সাধ্য তার কই? যে সমাজ তাকে দাক্ষিণ্যমাখা রুটির কোষ্টি পাথরে জীবনকে, মানুষী সম্পর্ককে যাচাই করতে শিখিয়েছে, সেই একই সমাজ, মূলত অপরিবর্তিত অবস্থায়, বিচ্ছিন্নতা পেরিয়ে সম্মুখ পানে নতুন পথ দেখাবে কি করে? ভাল্‌টার নেহাতই পোড়-খাওয়া সাধারণ ছেলে। ব্যোল্ যদি তাকে প্রেমে ফেলে আচমকা বিপ্লবী বানাতেন, তা হলে প্রথমত তা অবাস্তব হতো, দ্বিতীয়ত তাতে করে ঘটত রসের ভরাডুবি। তার অসহায়তাকে ঘিরে যুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির পার্থিব ক্রমোন্নতির পথে

প্রথম পদ সঞ্চারের ঝোঁকে উপেক্ষিত বিস্মৃত মানবিকতা, সমাজে মানুষে, মানুষে সমাজে নেহাত ফেলো কড়ি মাখো তেলের সম্পর্কের বাইরে না যেতে পারার, না যেতে চাওয়ার আত্মিক জাড্য এই উপন্যাসে এইটুকু দেখানোই ছিল ব্যোলের উদ্দেশ্য। কারণ সেকালে তাই-ই ছিল সামাজিক বাস্তবতা। "ছেলেবেলার রুটিতে" ব্যোল্, অনর্থক সরব না হয়ে সেই বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছেন।

যা দেখা যাচ্ছে, প্রথম দুটি উপন্যাসে হাইন্‌রিখ ব্যোল্ লিখেছেন যুদ্ধ নিয়ে। প্রথম গল্প সংকলনের ছোটগল্পগুলিতে তিনি ব্যস্ত আছেন প্রধানত যুদ্ধ শেষের জার্মানিকে নিয়ে। আর ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত তিনটি উপন্যাসে তিনি পশ্চিম জার্মানির তথাকথিত "অর্থনৈতিক বিস্ময়" কালীন সমাজকেই করেছেন তাঁর লেখার পটভূমি। স্থান ও কালের দাবি অনুযায়ী নিজস্ব এক সীমানা বেঁধে নিয়ে তারই মধ্যে সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের ঘাত প্রতিঘাতকে ফুটিয়ে তোলা হাইন্‌রিখ ব্যোলের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। ফলে, তাঁর কাহিনিগুলি রচনাকাল অনুসারে পড়লে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানির সামাজিক বিবর্তনের এক মোটামুটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়। ব্যোলের পাঠকদের পক্ষে এ এক বাড়তি লাভ। ১৮৮৮ সালে মার্গারেট হার্কনেস্‌কে লেখা একটি চিঠিতে ফ্রীডরিখ অ্যাংগেলস ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি ঔপন্যাসিক 'বালজাক' সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, বালজাকের উপন্যাস থেকে ফ্রান্সের তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে তাঁর কথাই তুলে দিই—
"I have learned more than from all the professed historians, economists and statisticians of the period together."

ভবিষ্যতের কোনও এক সুধী হাইন্‌রিখ ব্যোল্ সম্বন্ধেও হয়ত এই কথাই বলবেন। তবে ব্যোল্ স্থান কালের ফ্রেমে সামাজিক বাস্তবতা শুধু তুলে ধরেই ক্ষান্ত থাকেন না, তিনি সমালোচনা করেন। আর ক্ষুরধার বিদ্রূপই হল তাঁর সমালোচনার বাহন। অথচ তাঁর সমালোচনা কখনই কাহিনির গতি রোধ করে না। বরং তা যেন কাহিনিরই সম্পূরক। এর একটা কারণ হল এই যে, ব্যোল্ হাসাতে জানেন। এই গুণটি কিন্তু জার্মান সাহিত্যিকদের মধ্যে সুলভ নয়। ব্যোলের সমালোচনার বাহন যেমন তার বিদ্রূপ, তেমনি হাসি হল তাঁর বিদ্রূপের উজ্জ্বল পোশাক। অতএব, ব্যোলের পাঠক সাবধান। কারণ, পাঠককে হাসিয়ে কৌশলী কাহিনিকার চরম নাড়া দিতে পারেন, আঘাত করতে পারেন। জার্মান তত্ত্ববিদ ও শিল্প সমালোচক ঠেওডোর আডর্নো হাইন্‌রিখ ব্যোল্ সম্বন্ধে বলেছেন 'যেখানে ব্যথা করে তিনি সেখানেই আঘাত করেছেন।'

১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর "Irisches Tage buch" বা আয়ারল্যান্ডের ডায়রি" ওরকমই এক লুকোনো আঘাত। আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণকে ভিত্তি করে সে দেশের জনজীবনকে নিয়ে লেখা ১৮টি ছোট ছোট স্কেচের মধ্যে দিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে তাঁর নিজের দেশের সমাজেরই সমালোচনা করেছেন। আয়ারল্যাণ্ডে এসে তাঁর মনে

হয়েছে "দরিদ্র যে (সেখানে) শুধু মাত্র অলজ্জাকর তাই নয়, তা না সম্মানজনক, বা লজ্জাকর : সামাজিক অচেতনার অঙ্গ হিসেবে তা ধন সম্পদের মতই গুরুত্বহীন।" বলবাহুল্য, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে "অর্থনৈতিক বিস্ময়ের" পীঠস্থান পশ্চিম জার্মানির সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিই ব্যোল্ বক্রোক্তি করছেন—পশ্চিম জার্মানির নাম উচ্চারণ না করেই।

"আয়ারল্যান্ডের ডায়রি" যেমন পশ্চিম জার্মান সমাজের পরোক্ষ সমালোচনা-১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ব্যোলের বড় গল্প "Dr. Murkes gesammeltes Schweigen" বা ডক্টর মুর্কের সংগৃহীত নীরবতা" তেমনি সমালোচনাধর্মী এক স্পষ্ট বিদ্রূপাত্মক কাহিনি। এই কাহিনিটি দিয়ে ব্যোল্ আজকের যুগের আওতায় চলে এসেছেন। রচনা কালের প্রেক্ষিতে এ গল্পের বিচার সম্ভব না। কারণ এ গল্পে হাইন্‌রিখ ব্যোল্ যে কালের কথা বলছেন সে আমাদেরই কাল, সমকাল—চলতি যুগ। আর চলতি যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সংস্কৃতি ব্যাপারটাই এখন ভোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে না সুখের কথা তা তর্কের বিষয়। তর্কাতীত হল এই চেতনা যে, আমাদের যুগে সংস্কৃতির এ হেন রূপান্তর এক ঐতিহাসিক সত্য। কাঁচা মাল থেকে পণ্য তৈরি করার জন্য যেমন কল-কারখানা নির্মিত হয়েছে, শিল্প সাহিত্য থেকে তথাকথিত সাংস্কৃতিক পণ্য তৈরি করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি প্রচার মাধ্যমগুলির সাংস্কৃতিক বিভাগ। ব্যোলের গল্পের নায়ক "ডক্টর মুর্কের সংগৃহীত নীরবতা" ব্যোলের জনপ্রিয়তম কাহিনিগুলির মধ্যে অন্যতম। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে গল্পটি এতই অভিনব যে, যথাসম্ভব ছোট করে তা আপনাদের বলার লোভ সামলাতে পারছি না। এই গল্প বলার আর এক সার্থকতা আছে। অতি উপভোগ্য, চমকপ্রদ একটি কাহিনির মধ্যে দিয়ে সমাজ সমালোচক এক ওস্তাদ লেখক কি আশ্চর্যভাবে এবং কতটা সাফল্যের সঙ্গে তাঁর কার্যসিদ্ধি করতে পারেন "ডক্টর মুর্কের সংগৃহীত নীরবতা" হল তার স্মরণীয় এক উদাহরণ।

"ডক্টর" খেতাব থেকেই বোঝা যায় যে "মুর্কে" যাকে বলে উচ্চশিক্ষিত। খুব কাজের লোক তিনি। এখন হয়েছে কি, জনৈক বেতার-তারকা, যিনি এক নামী লেখক ও বক্তা, শিল্প বিষয়ে একটি কথিকা লিখেছেন। কথিকাটি "টেপে" রেকর্ডও করা হয়ে গেছে। সেখান তিনি ২৭ বার "ঈশ্বর" কথাটি বলেছেন। রেকর্ড করার পর তাঁর খেয়াল হয়েছে যে "ঈশ্বর" না বলে 'সেই মহান সত্তা' বললে বিভিন্ন কারণে (রাজনীতিও যেগুলির একটি) আরও ভাল হয়। অতএব তিনি আবার এসেছেন স্টুডিওয় "সেই মহান সত্তা" বলতে—২৭ বার। যন্ত্রের কারবার। কখন কি হয় বলা যায় না। তাই হাতের পাঁচ হিসেবে ওই তিনটি শব্দ তাকে ২৭ বার নয়, ৩৫ বার রেকর্ড করতে হবে। তারপর মূল টেপ থেকে "ঈশ্বর" শব্দটি ছেঁটে দিয়ে কাটা জায়গায় "সেই মহান সত্তা" জুড়ে দেওয়া হবে। এই কাটা-জোড়া পর্ব শেষ হবার পর স্টুডিওর প্রকৌশলীর হাতে ২৭ টুকরো "ঈশ্বর" জমা রইল। গল্পের শেষের

দিকে দেখা যাচ্ছে একটি বেতার-নাটকের জনৈক পরিচালককে, যিনি স্টুডিওয় বসে টেপ রেকর্ড করা সেই নাটকটি বাজিয়ে বাজিয়ে শুনছেন। নাটকটির এক জায়গায় জনৈক নাস্তিক একটি গির্জার ভেতর দাঁড়িয়ে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করেই কিছু অস্তিত্ববাদী প্রশ্ন রাখছেন। মূল নাটকের পাণ্ডুলিপিতে প্রতিটি প্রশ্নের পরেই ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে "নীরবতা"। এত 'নীরবতা'র ছড়াছড়ি পরিচালকের পছন্দ নয়। ঘটনাচক্রে আবার পূর্বে উল্লেখিত প্রকৌশলীই কাজ করছেন তাঁর সঙ্গে। পরিচালক চান- এবং নাট্যকারেরও তাতে আপত্তি নেই—নাস্তিকের প্রতিটি প্রশ্নের "নীরবতা"র বদলে কোনও এক কণ্ঠ উত্তর দিক "ঈশ্বর"। প্রকৌশলী এ সমস্যার সমাধান করলেন বেতার-তারকার কথিকা থেকে কাটা ২৭ টুকরো "ঈশ্বর" হাজির করে। নাটকটির মূল 'টেপে' নাস্তিকের প্রতিটি প্রশ্নের পর যে 'টেপিত' নীরবতা ছিল, সেই "নীরবতা" কেটে নিয়ে ২৭ টুকরোর মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় মাত্র ১২ টুকরো "ঈশ্বর" জুড়ে দেওয়া হল। প্রকৌশলীর হাতে রইল ১২ টুকরো "নীরবতা"। তিনি ওগুলো জমিয়ে রাখলেন, যথাসময়ে ডক্টর মুর্কের হাতে সেই "নীরবতা" তুলে দেবেন বলে। কারণ, কথা/কথা/কথা—একঘেয়ে অর্থহীন মূল্যহীন কথার গোলাম "মুর্কে" "নীরবতা" সংগ্রহ করে থাকেন। বেতার-ভবনের স্টুডিওয় যত কথিকা টেপ করা হয়, সেগুলো যাকে বলে 'এডিট' করার সময়ে মূল টেপের অনেক 'নীরব' অংশ ছেঁটে ফেলা হয়ে থাকে। ডক্টর মুর্কে সেই অংশগুলো সংগ্রহ করেন। নিজের বাড়িতে বসে তিনি বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো জোড়েন এবং টেপ রেকর্ডারে সেই জোড়াতালি দেওয়া টেপ চালিয়ে তিনি "নীরবতা" শোনেন। যেসব প্রচার মাধ্যমে সংস্কৃতি ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত হয়ে থাকে নির্মমভাবে, তাদেরই একটির যন্ত্রণাদায়ক অথচ হাস্যকর শব্দকল্পদ্রুমের বিরুদ্ধে এ হল বেতার কর্মী ডক্টর মুর্কের ব্যক্তিগত মৌন প্রতিবাদ।

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় ব্যোলের ষষ্ঠ উপন্যাস "Billard um halbzehn" বা "সাড়ে নটায় বিলিয়ার্ড"। রাইন-অঞ্চলবাসী এক স্থপতি-পরিবারের তিন পুরুষের এই কাহিনিটি এ শতকের প্রথমার্ধে জার্মানির ভাগ্যেরই প্রতীক। তবে, বাইরের দিক থেকে ১৯৫৮ সালের একটি মাত্র দিন নিয়েই ঘটনার কাঠামো তৈরি। এই উপন্যাসটিকে ব্যোলের প্রধান কাজগুলির মধ্যে গণ্য করা যায় কিনা তা নিয়ে সাহিত্য-সমালোচকরা নানান কথা বলে থাকেন। তবে এ কথা ঠিক যে, এ উপন্যাসটি ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত ব্যোলের চারটি উপন্যাসের মত উল্লেখযোগ্য নয়।

জার্মান লেখক এরিখ ক্যেস্টনার একবার লিখেছিলেন : "Vergesslichkeit ist eine bekannte deutsche Augenkrankheit und kann zur voelligen Erblindung fuehren."

অর্থাৎ, বিস্মৃতি হল এক সুপরিচিত জার্মান চোখের ব্যারাম এবং তা সম্পূর্ণ

অন্ধত্বে নিয়ে যেতে পারে। "Ais der krieg Ausbrach" বা "যুদ্ধ যখন লেগে গেল" নামে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হাইন্‌রিখ ব্যোলের একটি গল্প-সংকলন থেকে মনে হয় ব্যোল যেন ক্যেস্টনারের ওই কথা শিরোধার্য করতে চাইছেন। যুদ্ধপরবর্তী যুগের জার্মানিকে ব্যোল্ ১৯৬২ সালেও যুদ্ধের ও যুদ্ধশেষের সময় নিয়ে লেখা গুটিকতক গল্পের মাধ্যমে যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান। লেখকের সামাজিক, মানবিক দায়িত্ব সম্বন্ধে হাইন্‌রিখ ব্যোল্ যে সচেতন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার ১৭ বছর পর প্রকাশিত এই গল্পগুলোই তা প্রমাণ করে।

ঠিক তার পরেই বছরেই প্রকাশিত হল ব্যোলের সাড়াজাগানো উপন্যাস "Ansichten eines Clowns" বা "জনৈক ক্লাউনের মতামত"। বিতর্কিত এই উপন্যাসটি লিখে ব্যোল্ (যিনি নিজে বিশ্বাসী ক্যাথলিক) পশ্চিম জার্মানির ক্যাথলিক সমাজের প্রচুর নিন্দে কুড়িয়েছেন। শুধু ক্যাথলিক কেন, এই উপন্যাসটি পড়ার পর থেকেই পশ্চিম জার্মানির রক্ষণশীল পাঠককুল ধরে নিয়েছেন যে, ব্যোল্ তাঁদের জাতশত্রু।

কাহিনির নায়ক 'হান্সশ্লিয়ার' ধনীর সন্তান। ছোটবেলায় সে তার মা-বাবার বিশেষ করে মা'র নাৎসি-পনা দেখেছে। যুদ্ধ শেষ হবার পর নাৎসি ঔদ্ধত্য (সরকারিভাবে অন্তত) চুরমার হবার পর দেখেছে সে তার মা-বাবা এবং তার চেনাজানা বিত্তশালীরা কীভাবে রাতারাতি ভোল পাল্টে প্রগতিশীল ও ধার্মিক সেজেছেন। ভণ্ডামিতে ভরা ওই পরিবেশ থেকে চলে এসে হান্স হয়েছে পেশাদার ভাঁড় (ক্লাউন)। ছ' বছর সে তার বান্ধবী মারীর সঙ্গে একত্রে বাস করেছে কিন্তু তাকে বিয়ে করেনি। বিয়ের প্রয়োজনও হয়নি। এই সহজিয়ার ফসলস্বরূপ যে সন্তান আসবে তাকে বা তাদের ক্যাথলিক মতে মানুষ করা হোক্ হান্স তা চায় না বলে 'মারী' তাকে ছেড়ে গিয়ে পরিচিত এক 'প্রগতিশীল' ক্যাথলিককে বিয়ে করল। মারী চলে যাওয়ার পর থেকে পেশাদার ভাঁড় হিসেবে হান্সের পতন শুরু হল। মারীকে ছাড়া সে অচল। কাহিনির শেষে দেখা যাবে ব্যর্থ ক্লাউন হান্স গিটার হাতে রেল স্টেশনের ধারে বসে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। মধুচন্দ্রিমা সেরে তার পূর্বপ্রেমিকা মারীর ও তার 'প্রগতিশীল ক্যাথলিক স্বামীর ওই স্টেশনে পৌঁছবার কথা।...এই উপন্যাসটিতে ব্যোল্ পশ্চিম জার্মানির কুপমণ্ডুক ক্যাথলিকদের ও একদা নাৎসি ঘেঁষা অধুনা-ভণ্ড প্রগতিশীলদের কথা বলেছেন সোজাসুজি। "জনৈক ক্লাউনের মতামত" পড়ে পশ্চিম জার্মানির এত পাঠক রাতারাতি ব্যোল্-বিদ্বেষী হয়ে গেলেন দেখে খটকা লাগে। সন্দেহ হয়, এই বিদ্বেষ 'কথা পড়ল সবার মাঝে/যার কথা তার গায়ে বাজে' গোছের নাকি!

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হাইন্‌রিখ ব্যোলের অষ্টম উপন্যাস "Ende einer Dienstfahrt" বা "এক কর্মযাত্রার শেষ" (অনুবাদ আদৌ সুবিধের হল না) এক অতি উপভোগ্য ও অভিনব উপন্যাস। এ উপন্যাসে মজার ছড়াছড়ি। এ উপন্যাস রঙ্গ ও ব্যঙ্গ ভরা। এক সময়ে পশ্চিম জার্মানিতে যুবকদের একটি বিশেষ বয়েসে

বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে তালিম নিতে হত। (এখন অবশ্য এ নিয়ম অনেক শিথিল হয়ে গেছে।) কাহিনির প্রধান দুই চরিত্রের মধ্যে একজন হলেন অমনই এক যুবক। সৈন্যগিরি (সাময়িক হলেও) যাঁর ধাতে সয় না। এঁর ওপর ভার পড়ল সেনাবাহিনীর একটি জিপ গাড়িকে চালিয়ে চালিয়ে তার একটি মিটারকে কিলোমিটারের একটি বিশেষ রাশিতে নিয়ে আসার। যুবকটি ও তাঁর বাবা (যিনিও এক সময়ে 'বাধ্যতামূলক'ভাবে যোদ্ধা ছিলেন) দুজনে মিলে ওই জিপ গাড়িটি প্রকাশ্য সড়কে আনুষ্ঠানিকভাবে পুড়িয়ে দেন। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোট একটি শহরের আদালতে তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হল। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার প্রয়োজনীয়তা যে রাষ্ট্রের আছে, সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি মানুষের মূলত শান্তিকামী মানুষের এ হল এক প্রতীকী বিক্ষোভ। তথাকথিত অপরাধী দু'জনকে যখন চৌকিদার গ্রেপ্তার করল তখন তাঁরা বাধা প্রদান না করে নির্বিবাদে ধরা দিলেন। এই ঘটনা সচেতন বিক্ষোভের মত। উপন্যাসটির একটি আদালত-দৃশ্যে জনৈক ধর্মযাজকের মুখে দারুণ যুক্তিবাদী ও প্রগতিবাদী কথা শোনা গেলেও পশ্চিম জার্মানির ধর্মপ্রাণ ব্যোল্-বিদ্বেষীদের মন তাতে একটুও টলেনি।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবিচারের বা সংকীর্ণতার মুখে ব্যক্তি-মানুষের অবস্থা কাহিনিকার হাইন্‌রিখ ব্যোল্‌কে যে দিনে দিনে ক্রমশই বেশি বিচলিত করেছে তা তাঁর সদ্য আলোচিত দুটি উপন্যাস থেকে বোঝা যায়। তবে তাঁর শেষের দুটি উপন্যাস পড়লে পর বোঝা যাবে বর্তমান পশ্চিম জার্মানির সামাজিক অবস্থা নিয়ে তিনি কতটা চিন্তিত ও শংকিত।

১৯৭১ সালে প্রকাশিত Gruppenbild mit Dame" বা "মহিলা সহ গ্রুপ ছবি" উপন্যাসটি রচনা শৈলীর দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর অন্য সব উপন্যাসের চেয়ে স্বতন্ত্র। জনৈক অনুসন্ধানকারী 'লেনি' নামে এক মহিলার জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্য ও বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্যের মাধ্যমে ধারণা গড়ে তুলছেন। উপন্যাসটি তাই পরোক্ষভাবে লেখা। ব্যোলের উদ্দেশ্য লেনির জীবনের বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটন করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিকে ঘিরে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী জার্মানি থেকে যুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিম জার্মানির একটি বিশ্রুত চিত্র তুলে ধরা। এই উপন্যাসে ব্যোলের "এপিক" ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় মেলে। শুধু তাই নয় উপন্যাসটি অনুসন্ধান মায় তদন্তের ভঙ্গিতে লেখা বলে পাঠকও যেন সহ-অনুসন্ধানকারী হয়ে ওঠেন। ঘটনার, তথ্যের, চরিত্রের বিভিন্ন অংশ জুড়তে জুড়তে ব্যোল্ পাঠককেও যেন তাঁর লেখার কাজে, গল্পের জাল বোনার কাজে সঙ্গী করে নিচ্ছেন। এই উপন্যাসটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। এবং অধুনা পশ্চিম জার্মানিতে লাল-আতঙ্কগ্রস্ত বহু পাঠক ব্যোলের লেখায় যেসব বিস্ফোরক উপাদানের সাক্ষাৎ পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, সেই ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ এ উপন্যাসে প্রচুর আছে। যেমন ধরুন যুদ্ধের সময় লেনি এক রুশ যুদ্ধবন্দীর প্রণয়ে আসক্তা হয়েছিল বলে দীর্ঘদিন ধরে তাকে কি ধরনের সামাজিক অবিচারের শিকার

হতে হয়েছে তার কাহিনি। ''মহিলা-সহ গ্রুপ ছবি'' হাইন্‌রিখ ব্যোলের দীর্ঘতম ও গঠনের দিক দিয়ে জটিলতম এবং ঘটনার ও চরিত্রের সমাবেশে বিশ্রুততম উপন্যাস। এ ধরনের উপন্যাসের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে গেলে বোধ হয় কালের দূরত্ব প্রয়োজন।

"Die verlorene Ebre der Katharina Blum" বা ''কাথারিনা ব্লুমের হারানো ইজ্জত'' নামে উপন্যাসটি এখন পর্যন্ত ব্যোলের শেষ প্রকাশিত উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯৭৪। যদি বলা যায় যে ''জনৈক ক্লাউনের মতামত'' পড়ে পশ্চিম জার্মানির অসংখ্য পাঠক চটে গেছেন তবে বলতে হবে যে, ''কাথারিনা ব্লুম'' পড়ে পশ্চিম জার্মানির রক্ষণশীল পাঠককুল আঁতকে উঠেছেন।

এ উপন্যাসে কাথারিনা ব্লুম নাম্নী এক মহিলা যদি হন নায়িকা তো নায়ক হল একটি খবরের কাগজ। নাৎসি জার্মানিতে হিটলারের "Mein Kampl" বা ''আমার সংগ্রাম'' ছিল অবশ্যপাঠ্য। আজকের পশ্চিম জার্মানিতে ''বিল্ট্ জাইটুং'' (শিথিল তর্জমায় : 'সচিত্র-পত্রিকা') নামে একটি অদ্ভুত খবরের কাগজ যদিও তা পড়ার ব্যাপারে কোনও হিটলারী চাপ নেই—অসংখ্য জার্মানের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। দিনকে রাত করে, তিলকে তাল করে, মানুষের কেচ্ছা গেয়ে অর্থাৎ এক কথায় 'সাংবাদিকতা'র শ্রাদ্ধ করে ওই দৈনিক পত্রিকাটি ''সর্বাধিক পঠিত সংবাদপত্রের'' গৌরব অর্জন করেছে। এ ধরনের পত্রিকা আমাদের দেশেও যথেষ্ট। কাজেই এইরকম কোনও পত্রিকা বিকৃত সাংবাদিকতার মাধ্যমে যে কি বিকৃত জনমত সৃষ্টি করতে পারে তা আপনাদের সহজেই অনুমেয়।

কাথারিনা ব্লুম জনৈকা তরুণী। পেশা তাঁর সাধারণ হলেও তিনি সাধারণের দলে গা না ভাসিয়ে কষ্টে গড়া এক নিজস্ব অনুচ্চ জীবনযাপন করেন। কোলোন শহরের উৎসবমুখর কার্নেভালের এক পার্টিতে কাথারিনা দৈবক্রমে এমন একজন যুবকের প্রেমে পড়লেন যিনি এক 'র‍্যাডিকাল' আইন ভঙ্গকারী ও যাঁর নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। কাথারিনা যুবকটিকে পালাতে সাহায্য করে প্রথমত পুলিসের ও দ্বিতীয়ত ''জাইটুং'' (সংবাদপত্র/পূর্বোক্ত কেচ্ছা-পত্রিকা ''বিল্ট্ জাইটুং''-এর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়) নামে একটি পত্রিকার খপ্পরে পড়লেন। ওই পত্রিকাটিতে তারপর প্রতিদিন কাথারিনার নামে আজগুবি কেচ্ছাকাহিনি, অসহ্যরকম মিথ্যে ও ক্ষতিকর খবর ছাপা হতে লাগল। সেই সঙ্গে শুরু হল উড়ো চিঠি ও উড়ো টেলিফোন কল আসা। এই ব্যাপার দুটি অশ্লীলতা ও রাজনৈতিক আক্রমণ মেশানো। একটি কণ্ঠ যেমন টেলিফোনে তাঁকে বলছে : ''স্তালিন যা পারেনি তুইও তা পারবি না রে।'' এই আক্রমণ, বলা বাহুল্য, জাইটুঙের সাংবাদিকতার পরিণতি। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে কাথারিনা ব্লুম যাঁকে পুলিস, খবরের কাগজ ও কাগজ পড়ুয়া অন্ধ সমাজ মনের দিক দিয়ে পিষে দিয়েছে, ওই পত্রিকারই এক দুর্নীতিপরায়ণ সাংবাদিককে গুলি করে মারলেন। কাথারিনার সামাজিক বিপর্যয়ের জন্য এই ব্যক্তিই ছিল সবচেয়ে বেশি দায়ী।

অন্যায়, অবিচারে কোণঠাসা হয়ে পড়লে সাধারণ নিরীহ মানুষও যে কতটা

মরিয়া হয়ে উঠতে পারে ছোট্ট এই উপন্যাসটিতে ব্যোল্ তা নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন। এ উপন্যাসটিও বিবৃতির আঙ্গিকে লেখা। ব্যোলের লেখার ভঙ্গি এ উপন্যাসে নৈর্ব্যক্তিক বলেই পরিস্থিতির কাঠিন্য ও তীব্রতা এত ভাল ফুটেছে। নিজের কাহিনির সঙ্গে হাইন্‌রিখ ব্যোল্ নিজেই এমন এক দূরত্ব তৈরি করে নিয়েছেন যে, কাথারিনার পরিণতির জন্য তার প্রতি সমবেদনাতুর হবার আগে পাঠক সমগ্র পটভূমি সম্বন্ধে সচেতন হবেন। ব্যক্তি থেকে সমাজের দিকে, বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা থেকে তার বৃহত্তর কার্যকারণের দিকে দৃষ্টি যাবে পাঠকের। আর পাঠককুলের দৃষ্টি সেদিকে গেছে বলেই পশ্চিম জার্মানির এই প্রবীণ কাহিনিকারকে নিয়ে বিতর্কের মায় রাগারাগির অন্ত নেই।

কাহিনিকার ব্যোল্ আর (নীতিবাগীশ না) নীতিবাদী ব্যোল্ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নন। উপভোগ্য কাহিনি লিখেও মানুষকে যে দস্তুরমত ভাবিয়ে তোলা যায়, হাইন্‌রিখ ব্যোল্ই তার প্রমাণ। বের্টোল্ট্ ব্রেষ্ট্ তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"সত্য বহু উপায়ে চাপা যায় এবং বহু উপায়ে বলা যায়। হাইন্‌রিখ ব্যোল্ তাঁর নিজস্ব উপায়ে 'সত্য' বলেন—সামাজিক সত্য। তাই বলে তাঁর কাহিনি মার খায় না। মার খান তিনি নিজে। তাঁর নিজ বাসভূমে। সামাজিকভাবে।"

# হ্যাল্‌রাফ্‌ : এক অ-সাধারণ লেখক

এক

"এ কেমন কাল, যখন
গাছপালা নিয়ে কোনো আলোচনা প্রায় গর্হিত
অন্যায়
কারণ তা অ্যাতোগুলো দুষ্কৃতি বিষয়ে নীরবতা
বোঝায়।"

: **বের্টোল্‌ট্‌ ব্রেষ্‌ট্‌।**

"আমি অনুরোধ করছি, ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের ব্যাপার স্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য।"

: **হাইন্‌রিখ ব্যোল্‌।**

১৯৭৭ সালে পশ্চিম জার্মানির বইয়ের বাজারে প্রবীণ জার্মান সাহিত্যিক হাইন্‌রিখ ব্যোলের লেখা সাম্প্রতিক প্রবন্ধের একটি বই বেরোয়। বইটির নাম : "হস্তক্ষেপ কাম্য"। ওই একই নামাঙ্কিত যে প্রবন্ধটি এই বইয়ের কেন্দ্রবিন্দু তার এক জায়গায় ব্যোল্‌ লিখছেন : "আমরা লেখকরা জন্ম থেকেই হস্তক্ষেপকারী। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, স্পেন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল ও পর্তুগালের আইন-

সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক নীতিতে নাক গলাই এবং আমরা যুগোশ্লাভিয়ার ভয়াবহ ব্যাপার স্যাপারেও নাক গলাচ্ছি....। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, কিউবা ও মেকসিকোতেও নাক গলাব। ব্যাপারটা আদর্শবাদী ঠেকলেও আসলে কিন্তু তা নয়। হস্তক্ষেপ হল বাস্তববাদী থাকার একমাত্র উপায়।"

মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে ব্যোলের কথাটা ভেবে দেখার মতো কারণ, ভাবলেই দেখতে পাই যে, সব লেখক হস্তক্ষেপকারী নন। লেখকদের মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : যাঁরা হস্তক্ষেপ করেন, আর যাঁরা করেন না। গ্যুন্টার আইশের মতো যাঁরা বিশ্বাস করেন : "যা কিছু ঘটছে, সব কিছুর সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক আছে।" আর যাঁরা তা করেন না তারা দুষ্কর্ম ও দুষ্কৃতকারীর বিষয়ে নীরব থেকে গাছপালা নিয়েই বেশি আলোচনা করেন।

ভারতীয় পাঠকমহলে আজ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে অপরিচিত পশ্চিম জার্মান লেখক গ্যুনটার হ্বাল্‌রাফ্ হস্তক্ষেপকারী :

হাইন্‌রিখ্ ব্যোলের জবানে, জন্ম থেকেই হস্তক্ষেপকারী।

আমাদের দেশে হ্বাল্‌রাফ্ ব্যাপকভাবে অপরিচিত। তার কারণ বোধ হয় এই যে ভারতীয় কোনও ভাষায় তো দূরে থাক, ইংরেজিতেও তাঁর কোনও লেখার অনুবাদ আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। অবশ্য এটা আমার দেখার ভুল হতে পারে। কিন্তু খোদ জার্মান পাঠকমহলে হ্বাল্‌রাফ্ এক অতি পরিচিত, বহু বিতর্কিত নাম। পত্র-পত্রিকা ও বই পড়ার অভ্যেস একটু আধটুও আছে যাঁদের, তাঁরা সকলেই হ্বালরাফ্‌ের লেখার সঙ্গে পরিচিত। যাঁরা রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, জগতের হালচাল, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে থাকেন তাঁদের কাছে—অর্থাৎ ব্যাপকভাবে ছাত্রসমাজে, বুদ্ধিজীবী মহলে এবং শ্রমিক ও কর্মী মহলে হ্বাল্‌রাফ্ অবশ্য পাঠ্য। আধুনিক পশ্চিম জার্মানির ইতিহাস যাঁরা অনেক কষ্ট করে লিখে চলেছেন হ্বাল্‌রাফ্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

## দুই

"আজকের দিনে যিনি মিথ্যে ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়তে এবং সত্যিকথা লিখতে চাইবেন তাঁকে পাঁচটা সমস্যার বাধা অতিক্রম করতে হবে। সত্যিকথা যদিও তা সর্বত্র চেপে রাখা হয়, লেখার সাহস তাঁর থাকা দরকার, তা চেনার মতো চাতুর্য থাকা দরকার যদিও তা সর্বত্র ঢেকে রাখা হয়, তাকে একটা হাতিয়ারের মতো ব্যবহারোপযোগী করে তোলার শিল্প জানা থাকা দরকার, যাঁদের হাতে তা কার্যকর হবে তাঁদেরকে খুঁজে বের করার মতো বিচারবোধ থাকা দরকার, তাঁদের মধ্যে প্রচারিত করার কৌশল জানা থাকা দরকার। ফ্যাসিবাদের অধীনে যাঁরা লিখছেন তাঁদের পক্ষে এই সমস্যাগুলো বড়ো। যাঁদের জন্য সন্ধান চলছে অথবা যাঁরা পলাতক তাঁদের সামনেও এগুলো রয়েছে। এগুলো এমনকি তাঁদের সামনেও আছে যারা বুর্জোয়া স্বাধীনতার দেশে দেশে লিখে চলেছেন।"

: **বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্**

সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ ইতিহাস এবং ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে পৃথিবীটা আজ এমন এক অবস্থায় রয়েছে, যেখানে পৃথিবীর বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে অভাবের রাজ্য। ঐতিহাসিক কারণেই কয়েকটা দেশ 'প্রগতির' ঘোড়দৌড়ে প্রযুক্তির ঘোড়ায় চেপে কামাল করেছে। চন্দ্রাভিযান, কমপিউটার ও আই. সি. বি. এম-এর যুগে বিশ্ববাসী প্রায়োগিক উন্নতিকেই সাধারণভাবে উন্নতির মাপকাঠি ঠাউরে নিয়েছে। কারণ, প্রায়োগিক উন্নতি করেছে যারা, তারা বেশ আছে। বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে এই ''বেশ থাকার'' প্রকারভেদ আছে অবশ্য। কিন্তু সে যাই হোক, পৃথিবীর ''উন্নয়নশীল'' দেশগুলো আজ প্রযুক্তির ঘোড়সওয়ারদের ক্ষুরের চিহ্ন ধরে এগোচ্ছে। কাজেই আর্থিকভাবে যারা বেশ আছে, তাদের সমাজ কেমনধারা চলছে তা জানা একান্তই দরকার। বিত্ত এমন একটা ব্যাপার যা তার অধিকারীর সম্পর্কে বিত্তহীনের মনে বিভিন্ন ধারণা জন্ম দেয়। তার কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে তা যাচাই করে দেখা দরকার। দ্বিতীয়ত, আজ জগতে প্রগতির পাঠশালায়, প্রযুক্তির ঘোড়সওয়াররাই গুরুমশাই। তাঁরা আবার একাধিক রাজনৈতিক মতাদর্শের লেবেল নিয়ে পাঠ্যশালার পোড়োদের উন্নতির পাঠ দিচ্ছেন। কেউ বলছেন : ডানহাতি রাস্তা নাও। কেউ বলছেন: না, বাঁহাতি। এখন ডানহাত বাঁহাতের প্রতিযোগিতায় প্রচার এক মস্ত ভূমিকা নিয়ে ফেলেছে। একে তো লোকগুলো আমাদের চেয়ে এমনিতে অনেক ভালও আছে, তার ওপর আবার বিভিন্ন মুখে প্রচার। বিত্তবানের প্রচারে বিত্তাকাঙ্ক্ষী বিত্তহীনের মন যে কতটা ভেজে বা কতটা বিভ্রান্ত হয় তা উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সাধারণ মানুষের মনে ডানহাতি বা বাঁহাতি রাস্তা নেওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশত প্রচারভিত্তিক, প্রচার নির্ধারিত অভিলাষ ও সিদ্ধান্ত দেখলে দিব্যি বোঝা যায়। এ-হেন প্রচারাকীর্ণ অর্ধ সত্য ও ডাহা মিথ্যের এমনিতে ভাল থাকা সামাজিক জীবেরা অমনিতে কেমন আছে সেই সত্যি কথাটা যাঁরা বলেন তাঁদের সততা ও সাহসের ওপর ''প্রায়োগিক'' উন্নতি নয়, মানুষের প্রগতি বড্ড বেশি নির্ভর করে থাকে—বিশেষত আজকের দিনে।

অগ্রণী, শিল্পোন্নত দেশ ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের এমনিতে-সচ্ছল সমাজ ওমনিতে যে কেমন আছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে একনাগাড়ে লিখে যাওয়ার সাহস যাঁদের আছে, গ্যুন্টার হ্বাল্‌রাফ্ তাঁদের প্রথম সারিতে। আর্থিক সচ্ছলতা তজ্জনিত মানসিক জাড্য ও ঔদাসীন্য এবং ঝকমকে প্রচার ও প্রায়শই ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার আড়ালে লুকোনো বিভিন্ন সত্য উদ্‌ঘাটন করে থাকেন তিনি। তত্ত্বকথা নয়। রূপকের ছদ্মবেশ নয়। বাস্তবে যা ঘটছে তার হুবহু সংবাদ দেন তিনি। অর্থাৎ হ্বালরাফ্ সাংবাদিক। কেবল, প্রচারমাধ্যম ও সাংবাদিক অধ্যুষিত আজকের এই পৃথিবীতে তিনি দুটি বৈশিষ্ট্য রাখেন।

যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ ও প্রায় সমস্ত লেখক বিভিন্ন অমানবিকতাকে, অন্যায়কে প্রদত্ত সত্য বলে এক রকম ধরেই নিয়েছেন, সেই সমাজে হ্বাল্‌রাফ্ যে-

কোনও অন্যায় দেখলে এত বিস্মিত হন যে সেই অন্যায় সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার জন্য ও তার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হন। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল : তাঁর বিষয়ের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যান। অর্থাৎ কেবলমাত্র খোঁজখবর, পড়াশুনো, জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি তাঁর বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন না। যে ব্যাপার বা যে পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি লিখতে চান, সেই ব্যাপার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন তিনি সশরীরে, সেই পরিস্থিতিতে তিনি স্বয়ং সামিল হন। যেমন, তিনি যদি কোনও কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে লিখতে চান তো সেই কারখানায় তিনি নিজে শ্রমিকের কাজ নেবেন, শ্রমিকের জীবনযাপন করবেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখবেন। অর্থাৎ গ্যুন্টার হ্যাল্‌রাফ্‌ বাস্তব পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র চিন্তার মাধ্যমেই নয়, সশরীরে, প্রত্যক্ষভাবে নাক গলান।

## তিন

গ্যুন্টার হ্যাল্‌রাফ্‌ের জন্ম ১৯৪২ সালে। কোলোনের কাছেই। তাঁর বাবা ছিলেন শ্রমিক। অসুস্থতার দরুন তাঁর রোজগার কম ছিল। ফলে পারিবারিক অবস্থা ভাল ছিল না। প্রাইমারি স্কুলে হ্যাল্‌রাফ্‌ ভালো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু সেকেন্ডারি স্কুলে উঠতেই পরিস্থিতি পাল্টাল। পরীক্ষায় ভাল করতে গেলে বাড়িতে যে সাহায্যটা দরকার সেটা তিনি পেতেন না। অর্থাভাবের জন্য পয়সা দিয়ে ঘনঘন অতিরিক্ত পাঠ নেওয়াও সম্ভব হত না। ফলে তিনি একবার পাশ করতে পারলেন না। এরপর তিনি স্কুল ছেড়ে দেন এবং এটা-ওটা চেষ্টা করার পর অবশেষে তিনি পুস্তক বিক্রেতার কাজ শেখেন। এই সময়েই হ্যাল্‌রাফ্‌ একটু একটু করে লিখতে শুরু করেন। কবিতা লেখায় হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিজীবনে, শ্রমজীবনে রক্ষণশীল-প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন সামাজিক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের প্রথম স্বাদও তিনি পেতে শুরু করেন। বিভিন্ন সামাজিক দ্বন্দ্ব। যেগুলোর কিনারা করার সাধ্য সেই মুহূর্তে তাঁর ছিল না। কিছুকাল আগেও পশ্চিম জার্মানিতে সামরিক শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। এ নিয়মটা এখনও আছে। তবে কেউ যদি এই ব্যাপারটাকে মন থেকে গ্রহণ করতে না পারেন তো এখন তিনি আর সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য নন। তার বদলে তিনি সমাজসেবামূলক কোনও কাজও বেছে নিতে পারেন। যাই হোক, একটি বিশেষ বয়েসে হ্যাল্‌রাফ্‌েরও ডাক আসে। হ্যাল্‌রাফ্‌ এদিকে কট্টর যুদ্ধ-বিরোধী। সাময়িকভাবে হলেও সৈন্য হতে তিনি কোনও অবস্থাতেই রাজি নন। সে সময়ে সমাজসেবামূলক প্রতিকল্প ব্যবস্থাটা পশ্চিম জার্মানিতে ছিল না। তিনি অবশ্য এই মর্মে একটি আবেদন করলেন যে, সামরিক শিক্ষা বা সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে তাঁর বিবেকে বাধে। কিন্তু তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত যতদিন না নেওয়া হচ্ছে, ততদিন অন্তত তাঁকে সেনাবাহিনীতে

থাকতেই হবে। অন্যথায়, দেশের আইন অনুযায়ী, তাঁর শাস্তি হতে পারে। অতএব তিনি সেনাবাহিনীতে গিয়ে হাজিরা দিলেন।

পশ্চিম জার্মান সেনাবাহিনী থেকেই গ্যনটার হ্যাল্‌রাফ্‌ের যোদ্ধা-জীবন শুরু। অবশ্যই অন্য অর্থে। হ্যাল্‌রাফের লেখক-জীবনই হল তাঁর যোদ্ধাজীবন। গোটা পশ্চিম জার্মান সেনাবাহিনী, তার শিক্ষককুল, মনস্তত্ত্ববিদ, তার মগজ-ধোলাইয়ের বন্দোবস্ত, তার অত্যাচার একদিকে আর অন্যদিকে একা হ্যাল্‌রাফ্‌।

চার

"যুদ্ধ মানেই
শত্রু শত্রু খেলা
যুদ্ধ মানেই
আমার প্রতি তোমার অবহেলা।"

: নির্মলেন্দু গুণ।

পশ্চিম জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গে গ্যনটার হ্যাল্‌রাফ্‌ের (তাঁর দিক থেকে) শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রতিদিন দিনলিপি লিখতেন। এই সব লেখা তিনি বুদ্ধি করে নিয়মিত পাচার করে দিতেন তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে তাঁর হাত দিয়ে। পশ্চিম জার্মান সেনাবাহিনী হ্যাল্‌রাফকে বাগে আনার বিস্তর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা তাঁকে রেহাই দেবার পর হ্যাল্‌রাফ্‌ এই সব দিনলিপি বই আকারে প্রকাশ করেন। সেই বইটি থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই যুগে আর গাছপালা নিয়ে আলোচনা করতে চান না এমন একজন লেখকের সঙ্গে আপনাদের প্রত্যক্ষ আলাপ করিয়ে দেওয়া যাক :

১. **আমার পদ হল রাইফেলম্যান। আমি ইউনিফর্ম পরছি। কিন্তু অস্ত্রটা আমি নিইনি। আমি সামরিক শিক্ষা নিতে নারাজ।**

**"হ্যাল্‌রাফ্‌ সব কিছু সত্ত্বেও রিপোর্ট করছে"। "প্রথমত, আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে আপনি সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। আর তারপর ঠিক করে রিপোর্ট করুন। তার মানে : রাইফেলম্যান হ্যাল্‌রাফ্‌ যথাস্থানে রিপোর্ট করছে, বুঝেছেন।"**

**"হ্যাঁ, তা বটে, কিন্তু রাইফেলম্যান কেন? আমি তো হাতে রাইফেল নিইনি, আর কোনোদিন গুলিও ছুঁড়ব না, মজার জন্যেও না।"**

**"আপনি কি হাঁদাগংগারাম? আপনার পদ হল রাইফেলম্যানের এবং ঐভাবেই আপনাকে সব সময়ে রিপোর্ট করতে হবে, নয় তো আদেশ অমান্য করার অপরাধে আমি আপনাকে শাস্তি দেব।"**

**"ও, এই ব্যাপার। একজন রাইফেলম্যান, যে গুলি ছোঁড়ে না...বেশ,**

আপনি যখন ব্যাপারটাকে এতই গুরুত্ব দিচ্ছেন : রাইফেলম্যান হ্যাল্‌রাফ্ যথাস্থানে রিপোর্ট করছে।"

২. পরের দিন আমি বন্দুক বল্টনের সময়ে হাজির হলাম না। পরে ক্যাপটেন সক্কলের সামনে আমায় বললেন যে অস্ত্র বহন করার যোগ্যতা আমার নেই এবং অস্ত্র বহন করার পক্ষে আমি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নই। পরে আমি আমার দলীয় নেতার কাছ থেকে ফিতে লাগানো একটা লাঠি পেলাম। আমি প্রতিদিন তাতে একটা টাটকা মেঠো ফুল লাগাই আর সন্ধেবেলা বন্দুকের স্ট্যাণ্ডে আমার সতীর্থদের চকচকে বন্দুকগুলোর পাশে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখি। পাছে তাঁরা আমার পাশে লজ্জা পান, তাই আমি তাঁদের বন্দুকের নলেও ফুল লাগিয়ে দিই—এই ফুলের যাদুর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। আমার লাঠিটাও আমি আর সর্বসমক্ষে নিয়ে বেরোবার অনুমতি পেলাম না, কারণ ওটা নিয়ে বেশ হইচই পড়ে গেছে, আশেপাশের অন্যান্য সেনাদলে সবাই ওটাকে চিনে ফেলেছে। কাজেই অন্যরা যখন গুলি ছোঁড়ে আমি তখন খালি হাতে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি।...

হ্যাল্‌রাফ্ মানসিকভাবে সুস্থ কিনা তা যাচাই করার জন্যে সেনাবাহিনীর সাইকিয়্যাট্রিস্টদের কাছে তাঁকে পাঠানো হয়। তিনি যখন কিছুতেই ভাঙলেন না মচকালেনও না, তখন সেই বিশেষজ্ঞরা অবশেষে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছোন যে, হ্যাল্‌রাফের ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক। এবং যুদ্ধ বা শান্তি কোনও কিছুর জন্যেই তাঁকে বেশিদিন ব্যবহার করা সম্ভব না।

## পাঁচ

"এবার আমি বুঝতে পারলাম যে সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলো ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক কারণসম্ভূত। অতএব ব্যক্তিগতভাবে একা হাতে সেগুলো দূর করা যাবে না। এই চেতনা, বলা বাহুল্য, রাতারাতি আসেনি। সময় লেগেছিল। তবে ধীরে ধীরে আমি রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করতে শুরু করলাম।"

আমাদের যুগের এক অন্যতম হস্তক্ষেপকারী লেখক এইভাবে জন্ম নিলেন। সেনাবাহিনী থেকে ফিরে হ্যালরাফ্ প্রথমে ঠিক মনস্থির করতে পারেননি। কিন্তু তারপর, খানিকটা উপার্জনের তাগিদেই তিনি চাকরির খোঁজে বেরোন। তিনি গেলেন ফোর্ড কোম্পানিতে। শ্রমিক হয়ে। হ্যাল্‌রাফ্ জানতেন যে চেষ্টা করলে তিনি আরও ভালও কাজ পেতে পারেন। কিন্তু পরিচিত কয়েক জনের কাছে তিনি ঐ কোম্পানিটি সম্পর্কে এমন কিছু কথা শুনেছিলেন, যেগুলো বিশ্বাস করতে তাঁকে বেগ পেতে হচ্ছিল। কাজেই শোনা কথার সত্যতা যাচাই করতে তিনি কাজ নিলেন ফোর্ড কোম্পানির অ্যাসেম্বলি লাইনে।

দু বছর ধরে পাঁচটি বিভিন্ন কারখানায় টানা কাজ করেন গ্যনটার হ্যাল্‌রাফ্ ।

প্রযুক্তির অন্যতম ঘোড়সওয়ার শিল্পোন্নত পশ্চিম জার্মানিতে কারখানাগুলো কীভাবে চলে, কারখানার শ্রমিকদের, কর্মীদের অবস্থা এখন কেমন তা দু বছর ধরে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে বুঝেছেন হ্যাল্‌রাফ্‌। ওই বোধ থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর সাড়া-জাগানো বই "কারখানার রিপোর্ট।" সহজ, জীবন্ত ভাষায়, কোন বাহুল্য না রেখে তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছেন তিনি। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এই যে, সমস্ত লেখাগুলো রাজনৈতিক চেতনাসম্ভূত হলেও কোথাওই কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের চেষ্টা নেই। তিনি সংবাদ দিচ্ছেন। যে সংবাদ দিতে লোকে সাধারণত ভয় পায়, কিন্তু কিন্তু করে থাকে, সেই সংবাদ দিচ্ছেন তিনি। ফোর্ড কোম্পানির অ্যাসেম্বলি লাইনে কর্মরত শ্রমিকদের কাজের বিবরণ দিতে দিতে তিনি গোটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার হাড়-মাস-মজ্জার ছবি তুলে ধরেছেন। শিল্পোন্নত, ধনতান্ত্রিক দেশে ভোগ্যপণ্যের ছয়লাপের পেছনে মানুষরূপী পণ্যসমূহের শোচনীয় অবস্থার গ্রাফিক বিবরণ দিচ্ছেন হ্যাল্‌রাফ্‌। নাটকীয়তা করছেন না। এই ধরনের লেখায় এই বিপদের গোপ্পদে অনেকেই ডোবেন। সামাজিক অন্যায়ের অ্যানাটমি তিনি এত ভাল বোঝেন এবং সেই অন্যায়ের নিকেশ করার উদ্যোগ নিতে তিনি এতই তৎপর যে অন্যায়টিকে তিনি পাঠকদের সামনে ঠিক সেই ভাবে রাখেন যেভাবে রাখলে পাঠকরা অন্যায়ের কার্যকারণ বুঝে নিতে পারবেন, টের পাবেন তার দুর্বল জায়গাগুলো কোথায় এবং নাটকীয়তা ও ভাবালুতার রসায়নে ব্যাপারটাকে তরল করে না দিয়ে তাঁরা বাস্তবিকভাবে সে-অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবেন।

ছয়

"অকাজ করো, সেই গান গাও যা লোকে তোমাদের মুখ থেকে আশা করে না। অস্বস্তিকর হও, পৃথিবীর যন্ত্রে, তেল নয় বালি হও।" : **গুন্‌টার আইশ্‌**

হ্যাল্‌রাফ্‌ এরপর পশ্চিম জার্মানির প্রগতিশীল পত্রিকা 'কংক্রিট' ও 'পার্‌দ'-তে সাংবাদিকের কাজ নেন। অর্থাৎ 'কারখানার রিপোর্ট' লেখার পর তিনি পেশাদার সাংবাদিক ও লেখক হলেন। এই সময়ে তাঁর লেখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সড়াজাগানো বইটি হল : '১৩টি অবাঞ্ছিত রিপোর্ট'। প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এর আগের রিপোর্টগুলোয় হ্যাল্‌রাফ্‌ তাঁর কৌতূহল কলকারখানায় সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু এবারে, ১৩টি বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে তিনি পশ্চিম জার্মান সমাজের ১৩টি বিভিন্ন জায়গায় নাক গলালেন—সাপের খোঁজে। এবং সাপই বেরলো।

প্রায় প্রত্যেকটি রিপোর্টের মালমশলা জোগাড় করতে গিয়ে তাঁকে এক একটি ছদ্মবেশ ধরতে হয়েছে। পশ্চিম জার্মানিতে যাঁরা গৃহহীন, ভবঘুরে, তাদের প্রতি সরকারিভাবে এবং বেসরকারিভাবে, ব্যক্তিগতভাবে এবং চার্চার মতো একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কেমনধারা আচরণ করা হয়ে থাকে তা

যাচাই করার জন্য তিনি ভবঘুরে সাজেন। মদের নেশার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য লোকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যায়। হ্যাল্‌রাফের কানে আসে যে ঐ ধরনের একটি নিরাময়কেন্দ্রে রোগীদের ওপর অত্যাচার করা হয়ে থাকে। অতএব তিনি স্বয়ং মদ্যপ সেজে চিকিৎসার জন্য ওই হাসপাতালে ভর্তি হন। বেশ কিছুদিন 'চিকিৎসাধীন' থাকার পর তিনি কোনওক্রমে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং অবশ্যই একটি রিপোর্ট লেখেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে প্যারিসে, পশ্চিম বের্লিনে হাইডেলবেয়র্গে ছাত্রবিপ্লব ঘটে। তা শেষ হবার পর হ্যাল্‌রাফ্‌ বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী এক ছাত্র সেজে পশ্চিম বের্লিনের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। অবশ্যই বিক্ষোভ করার জন্য নয়। বিক্ষোভ-প্রদর্শনের পালা তখন শেষ। তাঁর গলায় ঝোলানো একটা লিপিতে লেখা ছিল যে তিনি থাকার জায়গা ও কাজ খুঁজছেন। পথচারী ইত্যাদিদের কাছ থেকে তিনি যে আচরণ পান, তার কথা তিনি লেখেন একটি রিপোর্টে। প্রত্যেকটি রিপোর্টেই এক বা একাধিক সাপের কথা লেখা, যে সাপগুলো সমাজের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এই পর্যায়ের সবকটা রিপোর্টই মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। যেসব দেশগুলোকে আমরা দারুণ সভ্য বলে ভাবি, সেইসব দেশের সভ্যতার তলায় কোন মানবতাবিরোধী ব্যাপার স্যাপার যেভাবে বাড়ছে, তা জানতে হলে হ্যাল্‌রাফের 'অবাঞ্ছিত রিপোর্ট' পড়া দরকার। এই ধরনের একটি রিপোর্ট হল : 'ন্যাপাম? হ্যাঁ এবং তথাস্তু'। ভিয়েতনাম যুদ্ধ তখন চলছে। এবং পৃথিবীর একটি 'সভ্য' দেশ একটি 'অসভ্য' দেশের 'অসভ্য' মানুষদের ঢিট করার জন্য যেসব মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে সেগুলোর মধ্যে ন্যাপাম অন্যতম। হ্যাল্‌রাফ্‌ সেই ন্যাপাম বোমারই জনৈক নির্মাতা সেজে বিভিন্ন ধর্মযাজকের কাছে উপদেশ নিতে যান, ওই বোমা তৈরি করা এবং ব্যবসার খাতিরে বিক্রি করা উচিত কিনা সেই ব্যাপারে। ওইসব ধর্মযাজকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ক্যাথলিক। এবং এঁরা প্রায় সকলেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের, ন্যাপাম বোমা ব্যবহারের এবং তা তৈরির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পর পশ্চিম জার্মানির 'ক্যাথলিক বার্তা সংস্থা' হ্যাল্‌রাফের বিরুদ্ধে প্রায় একটি ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের নাম উল্লেখ করে এবং তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনের উদ্ধৃতি দিয়ে হ্যাল্‌রাফ্‌ যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা যুক্তিসংগতভাবে উড়িয়ে না দিতে পেরে বার্তা সংস্থা ১৯৬৭ সালের ৯ই মার্চ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে পাঠকদের জানান যে, পশ্চিম জার্মান সেনাবাহিনী হ্যাল্‌রাফ্‌কে 'অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ঘোষণা করে যে হ্যাল্‌রাফ্‌ 'যুদ্ধ ও শান্তি দুটোর জন্যেই অযোগ্য'।

হ্যাল্‌রাফ্‌ যে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিচয় দিয়ে ''যুদ্ধ ও শান্তি দুটোর জন্যে যোগ্য'' ব্যক্তিদের ও প্রতিষ্ঠানসমূহের (সরকারি ও বেসরকারি) হাঁড়ির খবর দিচ্ছেন এর বিরুদ্ধেও ''ক্যাথলিক বার্তা সংস্থা'' সোচ্চার

হয়ে ওঠেন। মজার কথা হল, এই তথাকথিত "অগণতান্ত্রিক" কর্ম পদ্ধতির অভিযোগ পশ্চিম জার্মানির প্রায় সমস্ত মালিকপক্ষ তো বটেই, এমনকী একাধিক শ্রমিকসংস্থাও হ্যাল্‌রাফের বিরুদ্ধে এনেছেন। হ্যালরাফের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল এই যে, তিনি গোপন করে বেনামে ভেতরকার খবর সংগ্রহ করেন। যেন, আত্মপরিচয় দিয়ে ভেতরকার খবর জানতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসে তাঁর কানে কানে সব বলে যাবেন। হ্যাল্‌রাফ্ যে খবরগুলো দিচ্ছেন সেগুলোর সত্যতা বিষয়ে হ্যাল্‌রাফ্ বিরোধীদের কোনও বক্তব্য নেই। তাঁর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত প্রচুর মামলা রুজু করা হয়েছে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর বিরোধীপক্ষ তাঁর সাংবাদিকতাকে নীতিবিরুদ্ধ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। যাতে করে আদালত হ্যাল্‌রাফের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। নিজের সাংবাদিকতার এই নৈতিক দিকটির ওপর মন্তব্য করে হ্যাল্‌রাফ্ জানিয়েছেন যে, নিজে ঠকে না যাবার জন্য তিনি ঠকাতে বাধ্য হন।

"১৩টি অবাঞ্ছিত রিপোর্টের একটি রিপোর্টে হ্যাল্‌রাফ্ তাঁর পাঠকদের জানাচ্ছেন, নাৎসি অপরাধীদের ব্যাপারে পশ্চিম জার্মান আইন কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তাঁর ভাষায় : "পশ্চিম জার্মান আইন নাৎসি অপরাধীদের পেছনে বেশি সময় নষ্ট করে না। তাদের মুক্তি দেয়।" ফেডারেল আইন মন্ত্রণালয় তাঁদের একটি রিপোর্টে ১৫০ জন নাৎসি অপরাধীর কথা উল্লেখ করেন। হ্যাল্‌রাফ্ পরীক্ষামূলকভাবে তাঁদের মধ্যে থেকে ৩৮ জনের খবর নেন। এই খবরের ভিত্তিতে তিনি তাঁর রিপোর্টটি লেখেন। এই প্রেক্ষিতে খান দুই উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

১. **ফ্রিৎস এইচ। ইহুদিদের ওপর অত্যাচারে অংশ নিয়েছিলেন। প্রমাণ আছে যে তিনি পাঁচজন ইহুদিকে নিজে হাতে গুলি করেছিলেন। এর জন্যে তিনি রে মনে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দু'বছর তিনি কারাবাস করেন। তারপর ছুটি।**

২. **ফ্রান্‌ৎস্ এফ। ২৭ জন রুমেনীয় যুদ্ধ বন্দীকে গুলি করেন, তাঁরা খাবার দাবার চুরি করেছিলেন। শাস্তি : ৯ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ৪ বছর পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।**

এই খবরগুলো জোগাড় করার জন্য হ্যাল্‌রাফ্‌কে নাম ভাঁড়াতে হয়নি। কারণ এসব খবর তো সরকারি কাগজপত্র ঘাঁটলেই পাওয়া যায়।

১৯৭০ থেকে ৭২-এর মধ্যে হ্যাল্‌রাফ্ এই ধরনের রিপোর্ট আরও লেখেন। এই রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হয় তাঁর "নোতুন রিপোর্ট ও অনুসন্ধানে"। একটি রিপোর্টের নাম : কারখানার প্রাচীরের পেছনে লুকোনো সত্য প্রকাশের সমস্যা। বিভিন্ন কাগজে, বেতারে ও টেলিভিশনে কাজ করতে গিয়ে হ্যাল্‌রাফ্‌কে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেগুলোর কথা লিখেছেন তিনি এই রচনাটিতে। একেবারে শুরুতেই তিনি লিখছেন : ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে প্রেস স্বাধীনতা হল "দুশোজন ধনী ব্যক্তির

তাঁদের ধারণা প্রচারের স্বাধীনতা''। এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি যাঁর সেই পাউল সেঠেকে কম্যুনিজমের জন্য সন্দেহ করা হয় না, তিনি এক রক্ষণশীল-উদারপন্থী লেখক....।

বস্তুতপক্ষে, পশ্চিমি দেশগুলোয় বাক্-স্বাধীনতা, পাক্-স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে গরম গরম কথার পেছনে বাক্-স্বাধীনতা যে কীভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে তা আমরা সচরাচর টের পাই না, তার খবরও পাওয়া যায় না। হ্যালরাফের লেখা পড়লে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়। পূর্বোক্ত রিপোর্টটিতে হ্যাল্‌রাফ্ লিখেছেন সামাজিক সত্য গোপনে পশ্চিম জার্মান প্রচারমাধ্যম ও তাঁদের বিভিন্ন প্রতিভূর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টার কথা। ব্যাপারটা মূলত আর্থিক। আজকাল পত্রপত্রিকাগুলোকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হয়। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোই মোটা টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। এখন কোনও কাগজ যদি এমন কোনো খবর বা রচনা ছাপে যা কিনা প্রচুর বিজ্ঞাপনদাতা কোনও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী তো মাঝে মধ্যেই দেখা যায় যে ঐ প্রতিষ্ঠান ঐ কাগজটিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধই করে দিল। এর ফলে কাগজটি উঠেও যেতে পারে। এমন ঘটনা আদৌ বিরল নয়। অর্থাৎ, ''মুক্ত পশ্চিমে'' ডাকসাইটে শিল্পপতিরা প্রচারমাধ্যমগুলোর ওপর বিস্তর প্রভাব খাটিয়ে থাকেন। এমনকী জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত বেতার ও টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানের ওপরেও। সেখানেও বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বিভিন্ন শিল্পপতির সুহৃদ। ফলে বাক্‌স্বাধীনতা, প্রেস স্বাধীনতা ইত্যাদি শব্দগুলো প্রায়ই প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে আবার পশ্চিম জার্মানিতে এমন একজন প্রকাশক আছেন যিনি প্রচুর অর্থ এবং একাধিক বহুপঠিত সংবাদপত্রের মালিক। এমনকী শিল্পপতিরা যেমন তাঁদের স্বার্থের খাতিরে অর্থের জোরে প্রেসস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অর্থাৎ সম্পদের, অর্থের অসম বন্টনের সুযোগ নেন, এই প্রকাশক শিল্পপতিটি তেমনি নিজের স্বার্থে বিকৃত সাংবাদিকতার ছয়লাপে সৎ সাংবাদিকতাকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানিতে প্রচলিত সাংবাদিকতার বিপরীতে ইনি এক সমান্তরাল সাংবাদিকতাকে শুধু ট্যাকের গরমে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ওদেশের পত্রপত্রিকার জগৎ এমনকি অংশত সাহিত্যজগৎ, রাজনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা পেতে হলে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকলেই নয়। এঁর নাম অক্‌সেল্ স্প্রিংগার।

## সাত

হিটলারের আমলে জার্মানিতে ''মাইন্‌কাম্পফ'' (আমার সংগ্রাম) পড়া ছিল বাধ্যতামূলক। আজকের দিনে পশ্চিম জার্মানিতে লোকে যে হারে স্প্রিংগারের দৈনিক পত্রিকা ''বিল্ট্'' পড়ে থাকে তা হঠাৎ দেখলে মনে হবে যে এই পত্রিকা পাঠের পিছনেও বুঝি বাধ্যতামূলক কোনও ব্যাপার আছে। বিকৃত সাংবাদিকতা যে কতদূর যেতে পারে তা জানতে হলে 'বিল্ট্'-এর সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। এবং একথা

অস্বীকার করার জো নেই যে পশ্চিম জার্মান জনসাধারণের বিরাট একটি অংশ বর্তমানে এই পত্রিকাটির শিকার।

পশ্চিম জার্মানির একাধিক বিশিষ্ট লেখক নিয়মিতভাবে এই পত্রিকাটির বিরুদ্ধাচারণ করে থাকেন। হাইন্‌রিখ্‌ ব্যোল্‌ "ক্যাথারিনা ব্লুমের হারানো ইজ্জৎ" নামে তাঁর চাঞ্চল্যকর উপন্যাসে এই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর তার চেয়েও বড় আঘাত হেনেছেন গ্যুনটার হ্যুল্‌রাফ্‌ "বিল্‌ট্‌" পত্রিকা কিভাবে চালানো হয়ে থাকে, কিভাবে ঐ পত্রিকার পরিচালকরা সাংবাদিকদের দিয়ে মিথ্যে খবর পরিবেশন করান এবং নিরীহ মানুষের সর্বনাশ করেন সেই ভেতরকার খবর ফাঁস করে দেবার উদ্দেশ্যে হ্যুলরাফ্‌ বেনামে এমনকি ছদ্মবেশ ধরে ওই পত্রিকার হানোফার অফিসে চাকরি নেন। এই কাজটা তিনি যে সময়ে করেন, উদ্‌ঘাটক হিসেবে তিনি তার আগেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন। "হ্যুল্‌রাফ্‌" তখন এক পরিচিত নাম। তাঁর চেহারাও তখন অনেকের কাছেই আলোকচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচিত। কাজেই নাম ভাঁড়িয়ে বিল্‌ট্‌ পত্রিকায় কাজ নেওয়ার ঝুঁকি ছিল প্রচুর। বলা বাহুল্য, প্রচুর কাঠখড়ও পোড়াতে হয়েছে তাঁকে এ জন্য। নিজের অনেক কিছু যেমন হাঁটাচলা, কথা বলার ধরন, দৈনন্দিন অভ্যেস এবং অবশ্যই তাঁর রচনাশৈলী তাঁকে বেমালুম পাল্টাতে হয়েছে।

না। হ্যুল্‌রাফ্‌ "বিল্‌ট্‌" দপ্তরে একটানা অনেক দিন কাজ করা সত্ত্বেও ধরা পড়েননি। বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি বই লেখেন। প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। এই বইটি আধুনিক সাংবাদিকতার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। যে পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ সংবাদপত্র ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই পড়ে না, যে যুগে সংবাদপত্র ও তার কর্মীরা ঘটনার ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করে থাকে, সেই পৃথিবীতে, সেই যুগে হ্যুলরাফের এই বইটি সকলের পড়া উচিত।

বলা বাহুল্য, এই বইটি লেখার পর স্প্রিংগার সাম্রাজ্য হ্যুল্‌রাফের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মামলা রুজু করে। অন্যদিকে এই অস্বস্তিকর লোকটাকে রীতিমতো বিপদে ফেলারও বিভিন্ন চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের মানুষদের মুখ বন্ধ করার জন্য কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই বইটিকে ঘিরে যে সব মামলা চলছিল তার মোট খরচ দাঁড়িয়েছিল দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জার্মান মার্ক। হ্যুল্‌রাফের প্রকাশক "কীপেনহয়ার ও হ্যুচ" কোম্পানি এই খরচ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, "বিল্‌ট্‌" পত্রিকায় প্রকাশিত বিকৃত খবরের দরুন যেসব ব্যক্তি যে-কোনও দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁরা যাতে ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য নিয়ে লড়তে পারেন সেই উদ্দেশ্যও হ্যুল্‌রাফ্‌ ও তাঁর প্রকাশকের মিলিত উদ্যোগে একটি সাহায্য তহবিল তৈরি হয়েছে।

সমাজে লেখকদের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে গ্যুনটার হ্যুলরাফের কাছে পাঠ নেওয়া যায়। সাংবাদিক অধ্যুষিত আজকের এই দুনিয়ায় মানবতাবাদী সাংবাদিকতার চরিত্র ও চেহারা কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারেও হ্যুল্‌রাফের কোনও

বক্তব্য থাকলে তা প্রণিধানযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু হ্যাল্‌রাফ্‌ এই ধরনের কোনও বক্তব্য আজও রাখেননি। তাঁর সাংবাদিকতাই তাঁর দর্শনের একমাত্র মুখপাত্র।

আট

"হ্যালরাফের পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে : উনি তা আর বেশি দিন প্রয়োগ করতে পারবেন না, কারণ উনি বড্ড পরিচিত হয়ে পড়ছেন। আর এই সংকট থেকে বেরোবার একটা রাস্তাই আমার জানা : পাঁচজন, ছ'জন, এক ডজন হ্যাল্‌রাফ্‌ তৈরি করো।"

হাইন্‌রিখ ব্যোল্‌
("গ্যনটার হ্যাল্‌রাফের অবাঞ্ছিত রিপোর্ট")

ব্যোল্‌ ভুল বলেননি। আধুনিক পশ্চিম জার্মানির সব চেয়ে খ্যাতিমান দশ জন ব্যক্তির মধ্যে হ্যাল্‌রাফ্‌ একজন। দশটি বই তিনি এ যাবৎ লিখেছেন। বইগুলো সব মিলিয়ে কুড়ি লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে। গত প্রায় পনেরো বছর ধরে পৃথিবীর আর কোনও লেখককে কেন্দ্র করে বোধ হয় এত বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক, আলোচনা ও মামলা হয়নি, হ্যাল্‌রাফ্‌কে কেন্দ্র করে যা হয়েছে। পশ্চিম জার্মানির সমাজে মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ যেখানে যেখানে হচ্ছে সেখানে 'নাক গলিয়ে', জনসাধারণকে সেই সব কার্যকলাপের কথা জানিয়ে, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অন্যায় দূর করতে গিয়ে যে ধরনের এবং যে পরিমাণ নিন্দে ও কুৎসা হ্যাল্‌রাফ্‌কে কুড়োতে হয়েছে, যে পরিমাণ লাঞ্ছনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তার হিসেব কষা নিষ্প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের বা শাসকশ্রেণীর বিরোধিতা যাঁরাই করবেন, তাঁদেরই ভাগ্যে এগুলো বর্তাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাখারভের ভাগ্যে, পূর্ব জার্মানিতে রবেয়র্ট হাফেমানের ভাগ্যে যা ঘটেছে এবং ঘটছে, আমাদের নিজেদের দেশের অনেক "হস্তক্ষেপকারীর" ক্ষেত্রে যা ঘটেছে এবং ঘটতে পারে, পশ্চিম জার্মানির গ্যনটার হ্যাল্‌রাফের ক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় সমালোচকদের, হস্তক্ষেপকারীদের বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের "শোধনবাদী" বা 'পশ্চিমি দুনিয়ার দালাল' বলা হয়ে থাকে। আর পশ্চিমি দুনিয়ায় ঐ ধরনের ব্যক্তিদের "উগ্রপন্থী" বা 'কম্যুনিস্ট দালাল' আখ্যা দেওয়া হয়। কায়েমী স্বার্থের (সে যে-রঙেরই হোক) তল্পিবাহকদের মনস্তত্ত্ব সর্বত্রই এক। কাজেই হ্যালরাফ্‌কে ও তাঁর রচনাগুলোকে যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁরা যে হ্যালরাফের সঙ্গে বিভিন্ন ইউরোপীয় সন্ত্রাস গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কার করে ফেলবেন, তাঁকে প্রতিবেশী কোনও কম্যুনিস্ট দেশের দালাল আখ্যা দেবেন বা সরকারিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করে, পুলিসের সাহায্য নিয়ে টেলিফোনে তাঁর কথাবার্তা চুরি করে শুনবেন বা তাঁর ফ্ল্যাটে ছোট্ট একটি মাইক্রোফোন বসিয়ে আসবেন-এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। না। বিস্মিত হবার মতো কিছু না থাকলেও আফসোস করার মতো একটি ব্যাপার অন্তত আছে। আর

তা হলো এই যে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গ্যানটার হ্যাল্‌রাফের পরিচিতি এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে তাঁর নিজস্ব কর্মপদ্ধতি তিনি বোধ হয় আর আগের মতো করে প্রয়োগ করতে পারবেন না। অর্থাৎ স্বভাব-হস্তক্ষেপকারী লেখক হ্যাল্‌রাফ্‌কে তাঁর হস্তক্ষেপের ধরন পাল্টাতে হতে পারে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে একটি সাক্ষাৎকারে হ্যাল্‌রাফ্‌ তাঁর রাজনৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে জানান যে, তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুরা তাঁকে মৌলিক-উদারপন্থী বলে মনে করেন। তাঁর রাজনৈতিক অ-বন্ধুরা তাঁকে "আন্ডার গ্রাউন্ড-কম্যুনিস্ট" আখ্যা দিয়ে থাকেন। আর তিনি নিজে সামাজিক গণতন্ত্রীদের ভোট দেন। তবে, তিনি পরিষ্কার জানান যে, স্মিটের অধীনে সামাজিক গণতন্ত্রী দল তাঁকে হয় তো বের করে দেবে এই ভেবে তিনি পার্টিতে যোগ দেননি। তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিরা আছেন। তবে কাজ তিনি একাই করে থাকেন।

হ্যাল্‌রাফ্‌ কি তাঁর রচনাগুলোকে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলেন? উত্তরে হ্যাল্‌রাফ্‌ : "আমার লেখাপত্রকে সাহিত্যের এক্তিয়ারে ফেলা হল কিনা তা নিয়ে আমি তেমন চিন্তিত নই। ও ব্যাপারে সমালোচকরা ও সাহিত্যবেত্তারা সঠিক ভাষা দেবেন। মোদ্দা কথা, জার্মান সাহিত্যচক্রে সামিল হওয়ার কোনও উচ্চাশাই আমার নেই। আমি নিজে আমার কাজগুলোকে এক ধরনের ব্যবহারিক সাহিত্য বলে মনে করি। আর, কোনো একদিন আমার বইগুলো যদি পুরনো হয়ে যায় তবে তা আমার কাজের বর্তমান প্রয়োজনীয়তাকেই সপ্রমাণ করবে।"

হ্যাল্‌রাফ্‌ জানেন যে বহু শ্রমিক ও শিক্ষানবিশের জীবনে তাঁর লেখা বই-ই হল তাঁদের পড়া প্রথম বই। এঁদেরকে তিনি তাঁর সমালোচক বলে মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে এঁরা তাঁর বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চোখকান খোলা রেখে পড়েন।

এ সব তো খুব ভাল কথা। এখন প্রশ্ন হল : হ্যাল্‌রাফ্‌ কি তাঁর রিপোর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে কোথাও শ্রম পরিস্থিতিতে কোন উন্নতি ঘটাতে পেরেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে। এবং জানতে পারছি যে হ্যালরাফের হস্তক্ষেপের ফলে এ জায়গায় নয়, অনেকগুলো জায়গাতেই অনেক শুভ পরিবর্তন ঘটেছে। কোলোনের ফোর্ড কোম্পানিতে যেমন অ্যাসেম্বলি লাইনে কনভেয়ার বেল্টগুলোর গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের গতিবেগ হ্রাস আর একটি জায়গায় গতিবেগ বৃদ্ধির দিশারী। সে জায়গাটির নাম : মানবিক প্রগতি।।

স্বীকৃতি : এই লেখাটির জন্য হ্যাল্‌রাফের প্রকাশক কোলোনের 'কীপেনহয়ার ও হ্যিচ' সংস্থা এবং কলকাতার মাক্‌স্‌ ম্যুলার ভবনের পাঠাগার-পরিচালিকা শ্রীমতী খৃস্টেল দাস লেখককে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন উদ্ধৃতি মূল জার্মান থেকে বাংলায় তর্জমার দায় লেখকের।

# ছাত্র আন্দোলনের দশক ও রুডি ডুচ্‌কে

ষাটের দশকের অপরাহ্নে পশ্চিম বের্লিন ও জার্মানির ছাত্র আন্দোলনের এক অন্যতম নেতা রুডি ডুচ্‌কে গত দশকের সায়াহ্নে মারা যান। ষাটের দশকে ইওরোপের অন্যান্য দেশেও যে ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল ডুচ্‌কে অনেকাংশে তারও প্রেরণা ছিলেন। ইতালিতে যেমন সে সময়ে বিদ্রোহী ছাত্রদের মুখে "ডুচ্‌কিসমো" বা ডুচ্‌কেবাদ কথাটাও শোনা গেছে।

আমাদের দেশে রুডি ডুচ্‌কের ওপর উল্লেখযোগ্য কোনও লেখা আজও প্রকাশিত হয়নি। হালে, সঞ্জয় গান্ধী মারা যাবার পর অবশ্য যুবশক্তি, যুব নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে। বৃদ্ধ তন্ত্র যে দেশে কায়েম ও সাধারণ ভাবে স্বীকৃত, যৌবন যে দেশে অভিশাপের শামিল, সে দেশে "যুবশক্তি" বিষয়ে আলোচনা আরও ব্যাপক হওয়া দরকার। এবং এ আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা নেবার কথা যুব সম্প্রদায়েরই। আজ থেকে অনেক বছর আগে প্রমথ চৌধুরী তাঁর "যৌবনে দাও রাজটীকা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"এদেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটীকার পরিবর্তে তাঁর পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানব জীবনে যৌবন এক মস্ত ফাঁড়া—কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই

চান যে, এক লম্ফে বাল্য থেকে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে।"

"পৃষ্ঠে রাজদণ্ড" পড়া সত্ত্বেও বিশ্বের যুব সম্প্রদায় গোটা একটা দশক ধ'রে সেই রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। আজ, যুবশক্তি বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে যখন, তখন সেই সংগ্রামের স্মৃতির ধুলো ঝাড়াও দরকার। বস্তুতপক্ষে, সঞ্জয় গান্ধী মারা না-গেলেও যুবশক্তি বিষয়ে আলোচনা আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক হত না। কারণ, বৃদ্ধতন্ত্রের একটানা ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে এক পাল্টা শক্তি, এক বিকল্প শক্তি হিসেবে যুবশক্তির সম্ভাবনাগুলো নিয়ে ভেবে দেখার সময় অনেকদিন হলো এসে গেছে।

এক

"What is a rebel! A man who says no but whose refusal does not imply a renunciation. He is also a man who says yes as soon as he begins to think for himself." : **Albert Camus (The Rebel).**

ষাটের দশকটা ছিল ছাত্রশক্তির, যুবশক্তির দশক। ছাত্রবিদ্রোহের, যুববিদ্রোহের দশক। ওই দশকে আমাদের দেশে যেমন আমরা নকশালবাড়ি থেকে উৎসারিত আন্দোলনে—ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পর—ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, ছাত্রমহলে তীব্র উত্তেজনা দেখেছি, তথাকথিত "মুক্ত পশ্চিমে" তেমনি দেখা গেছে উত্তাল ছাত্রবিক্ষোভ। পশ্চিমি দুনিয়া, যা মনে হয়, এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। পৃথিবীর ওই অংশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ দীর্ঘকাল এমন কোনও মৌলিক বিরোধিতার মুখোমুখি হননি, যা কিনা শাসনব্যবস্থার, সমাজব্যবস্থার ভিতে হয় এসপার-কি-ওসপার গোছের নাড়া দিতে পারে। দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন মোটের ওপর সংকটশূন্য, বেকারত্বের হার তখন অপেক্ষাকৃত নিচুর দিকে। আমেরিকায় তখন অপুষ্টি নয়, মেদবৃদ্ধিই বরং সুস্বাস্থ্যের প্রধান অন্তরায়। শ্রমিকরা তখন তাঁদের বৈপ্লবিক শ্রেণীচরিত্রের কথা প্রায় ভুলতে বসেছেন। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, জনগণ তখন টেলিভিশনযন্ত্র, গাড়ি, কাপড়কাচার যন্ত্র ইত্যাদি কিনতে ব্যস্ত।

কিন্তু টেলিভিশনের ছবি যত রঙিন হয়ে উঠুক-না কেন, গাড়ি ও গাড়ির মালিকের সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, যতই উন্নতর হয়ে উঠুক না-কেন উৎপাদনব্যবস্থা, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মান, ষাটের দশকের আগেই ধনতান্ত্রিক রমরমার পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক নতুন প্রজন্মের উদয় হল যে প্রজন্ম ঐ তথাকথিত সব-পেয়েছিল দেশের উপচেপড়া সোনার ঘড়ায় আর মাথা ঠেকাতে রাজি হল না। হইহই করে অর্থনৈতিক উন্নতি ও জীবনযাত্রার মানের ঊর্ধ্বগতির কোলাহলে ঐ প্রজন্ম এমন কিছু মৌল মূল্যবোধের অভাব দেখল, যে অভাবের দীনতাকে ভোগ্যপণ্যের হরির-লুট দিয়ে ঢাকা যায় না। ব্লেকের মতো তারা

আপাতসুন্দর গোলাপে কীটের সন্ধান পেল। সমাজটাকে আর মেনে নিতে পারল না তারা। সেই প্রজন্মের কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর "হাউল" কবিতায় লিখলেন :

"Moloch whose mind is pure machinery
Moloch whose blood is running money
Moloch whose fingers are ten armies
Moloch whose breast is a cannibal dynamo
Moloch whose ear is a smoking tomb !"

সেকালে এই নবপ্রজন্ম বাইবেলে বর্ণিত ওই বিকট অপদেবতাকে কলা দেখাল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পিঠও ফেরাল তারা যন্ত্র-অর্থ-অধ্যুষিত তাদের "মলখ" সমাজের দিকে, অর্থাৎ তারা পালাল। আদি সমাজের বাইরে তাদের নবসমাজ, "নিভৃত কন্টকাবৃত বনে" পাতা "নবসংসারে" তাদের জিন্‌স বিবর্ণ হল, দীর্ঘ হল তাঁদের দাড়ি ও মাথার চুল। কিন্তু মলখের তাতে আসলে কিছুই এল গেল না।

বছর দশেক পরে সেই একই সমাজব্যবস্থার বুকে উদয় হল আর এক প্রতিবাদ-প্রজন্ম। "হাউল"-প্রজন্মের মতো তারাও তাদের সমাজব্যবস্থাটাকে অস্বীকার করল। কিন্তু পালাল না। কায়েমী সমাজ ব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম শুরু করল তারা এক উজ্জ্বলতর সমাজের স্বীকৃতিতে। ষাটের দশক সেই নবপ্রজন্মের সংগ্রামের, চেতনার দশক। পশ্চিমি দুনিয়ায় ষাটের দশক মারিয়ো সাহ্যিয়োদের, রুডি ডুচ্‌কেদের, কন্‌-বেনদিত্‌দের দশক। ছাত্র-আন্দোলনের দশক।

## দুই

ষাটের দশকে আমেরিকায় ও ইউরোপে যেসব ছাত্র-আন্দোলন হয়েছিল সেগুলোর প্রত্যেকেটির উৎসই ছিল এক-একটা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ডাকসাইটে বার্কলি। আর তার তিন বছরের মধ্যেই একে একে পশ্চিম বের্লিনের "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়" ফ্রান্সের নত্যেয়র ও সর্‌বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালির তুরিন, রোম ও ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যাণ্ডে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স (মোটের ওপর ছোটো হারে), স্পেনে বার্থেলোনা ও মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বার্কলি পরবর্তী সবকটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্র-আন্দোলনই আবার একটিমাত্র বছরের মধ্যে একযোগে তুঙ্গে উঠেছিল। ১৯৬৮ সালে। ওই বছর বেলজিয়ামের "লুহ্যাঁ" বিশ্ববিদ্যালয়েও আন্দোলন হয়। এমনকি নিষ্কণ্টক সুইৎজারল্যাণ্ডের ৎস্যুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়েও সে বছর "প্রগতিশীল ছাত্রদল" নামে একটি ছাত্রসংস্থার নামজাদা সাপ্তাহিক 'হ্যেল্ট-হুখের' ভাষায় : "১৯৬৩ সালে গঠিত এই সংস্থা, সুইস্‌ ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক আলোচনার (মার্কসের ও মারকুজের) পাঠ দিচ্ছে"। বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ছিলেন এইসব আন্দোলনের হোতা। যথাসময়ে সেই ছাত্ররাই তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিক্ষোভের, বিদ্রোহের বীজ সমাজের বিভিন্ন

স্তরে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৮ সালে প্যারিসে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়ে ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে মিশে দ্য গল-সরকারকে প্রায় গদিচ্যুত করে এনেছিল, সেই আন্দোলনের বারুদে বিদ্রোহী ছাত্ররাই অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়। ক্রমাগত নতুন বারুদ জোগানোর ভারও নিয়েছিলেন ছাত্ররাই। তাঁদের আন্দোলনে ছাত্র নন এমন কোনও ব্যক্তি বা কোনও পেশাদার রাজনীতিবিদ কোনো অগ্রণী ভূমিকা নেননি। ছাত্ররা তা চানওনি। সংসদীয় বা সংসদবহির্ভূত কোনো রাজনৈতিক দলের স্নেহচ্ছায়াতেও আমেরিকার বা ইউরোপের ছাত্র-আন্দোলন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেনি। ছাত্রদের সংগ্রামী সংস্থাগুলির সঙ্গে ষাটের বিদ্রোহে কোনও পার্টির টিকিবাঁধা-সম্পর্ক তো দূরের কথা, আত্মিক ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। যেসব ছাত্রসংস্থা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী। এককালে তাদের সঙ্গে পেশাদার রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক ছিল বটে। কিন্তু ষাটের ছাত্র-আন্দোলনের আগেই সে সম্পর্ক ভেঙে যায়।

ষাটের দশকে আমেরিকায় ও ইউরোপে ছাত্র-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানছুট, প্রতিষ্ঠিত দলছুট চরিত্র, কেবলমাত্র ছাত্র-যুব-চেতনার গতিশীল বিবর্তন থেকে উঠে আসা ছাত্র-তাত্ত্বিকদের সতীর্থসুলভ সংকেতে ও নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প লক্ষ করার মতো দুটি ব্যাপার। কারণ, আমাদের দেশে ষাটের দশক থেকে আজ পর্যন্ত যে দুটো বড়োসড়ো যুব-আন্দোলন হয়েছে, সে আন্দোলনদুটি ষাটের দশকে পশ্চিমি দুনিয়ার ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলনের থেকে ওই দুটি ব্যাপারেই ভিন্নধর্মী।

## তিন

এখন প্রশ্ন হল : সারা পশ্চিমি দুনিয়া জুড়ে ষাটের দশকে যুববিদ্রোহ যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই দানা বাঁধল তার কারণ কি? আর কি জায়গা ছিল না?

জাক্ সোহ্যুজো, বামপন্থী "ফরাসি ছাত্রদের জাতীয় ইউনিয়নের" জনৈক ছাত্রনেতা একটি সাক্ষাৎকার বলেছিলেন :

"The student revolt was inevitable and forseeable. An analysis of the university situation in France and abroad, and of the struggles that have broken out in Italy and Germany, for example, would have shown that the university plays a larger and larger part in society, and in the economy in particular. It has a monopoly in the intellectual training and the research that strictly condition any economic development today. This means that the whole economic system must take more and more account of the university, and it must have a more and more direct influence over it. The result is that in the capitalist system, universities are more and more subordinate to the criteria of a capitalist society.

Students are expected to have a certain critical intelligence, while

their studies are such that they are not allowed to exercise it. On the other hand, they realize that in a few years' time they will not be able to find a part to play in society that corresponds to their training. This dual phenomenon is, I believe, the basic cause of their revolution.

**The Student Revolt : Herve Bourges**

বস্তুতপক্ষে, "মুক্ত পশ্চিমের" সর্বত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে যে "ক্রিটিক্যাল ইনটেলিজেন্স" আশা করা হয়ে থাকে, সংখ্যালঘু একদল ছাত্রছাত্রী-ষাটের দশকে তা সর্বত্রই খাটাতে শুরু করেন। মুক্ত পশ্চিমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উদারপন্থী ও সহিষ্ণু—এমন ধারা একটা প্রচার বাক্য পশ্চিমি সরকারগুলো অনেকদিন ধরে আউড়ে গেলেও ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়-এর সজাগ ছাত্রছাত্রীরা আবিষ্কার করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজের স্বার্থরক্ষার্থে রীতিমতো অনুদার ও অসহিষ্ণু হতে পারেন। বিশেষ করে যদি সে স্বার্থ রাজনৈতিক হয়। রাজনীতি নিয়ে ছাত্ররা আলোচনা করুন, তাতে কর্তৃপক্ষের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপ? কোনোমতেই না। অর্থাৎ ছাত্রদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কার্যকলাপও যার এক্তিয়ারে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করতে রাজি নন। বার্কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন, ক্যাম্পাসের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল বলে, ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসের প্রবেশপথের সামনে দশমিটারি লম্বা ফুটপাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক বই, পত্রিকা ইত্যাদি কেনাবেচা করতেন, অর্থ সংগ্রহ করতেন, আলোচনা করতেন এবং রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য প্রচার চালাতেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে বার্কলি কর্তৃপক্ষ আচমকা ঘোষণা করলেন যে, জানা গেছে ফুটপাথের জমিটাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। অর্থাৎ সেখানেও রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বপরায়ণতার বিরুদ্ধে বার্কলির ছাত্ররা যে "বাক্‌স্বাধীনতা আন্দোলন" করেছিলেন তা হিংসাত্মক ছিল না আদৌ। কিন্তু ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সহিংস দমনমূলক পদক্ষেপ নিতে উদারপন্থী ও স্বাধীনতার নামাবলিধারী কর্তৃপক্ষ একটুও দ্বিধা বোধ করেননি।

ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খুব চড়া মাত্রায় রাজনীতি-সচেতন এক ছাত্রসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বেশ পুরনো। আলজেরিয়ার যুদ্ধের সময়ে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীই তাঁদের দফারফা করার ও মাঝেমধ্যে জীবন খোয়ানোর ঝুঁকি নিয়েছিলেন। ঐ যুদ্ধ শেষ হবার পর এই ধরনের ছাত্রছাত্রীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তাঁরা আগের চেয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামানোর সুযোগ পান। ১৯৬৩ সালে ফ্রান্সের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফুশে পরিবর্তিত সামাজিক ও শিল্পোৎপাদনী চাহিদার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে "ছাত্র-উৎপাদন" ব্যাপারটা যাতে খাপ খায় সেজন্য

একটি পরিকল্পনা করেন, যা "ল্য প্লাঁ ফুশে" বা "ফুশে পরিকল্পনা" নামে (কু) খ্যাত। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল : ফরাসি অর্থনীতির স্বার্থে শিক্ষাক্রমের আধুনিকীকরণ ও শিল্পোৎপাদনের মতোই ছাত্রোৎপাদনের ওপর জোরদার নিয়ন্ত্রণ। ঢালাও "স্পেশ্যালাইজেশন" ছিল তার ভিত্তি, যা কিনা আবার সমাজে সামাজিক ও প্রায়োগিক বিভেদের ভিত।

"ফুশে পরিকল্পনা" ছকার সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মতামত নেওয়া হয়নি। যে সিদ্ধান্তের ওপর তাঁদের ভবিষ্যৎজীবন নির্ভর করছে, সেই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও একমাত্র তাঁদেরই আছে—এই ধারণা থেকে ছাত্ররা প্রশ্ন করতে লাগলেন একের পর এক "সিদ্ধান্ত তাহলে নেয় কারা?—সরকার-এর শিক্ষামন্ত্রণালয়। ঠিক এই সিদ্ধান্তটাই বা নেওয়া হল কেন? সেকি ছাত্রদের—না, সরকার ও ব্যবসার স্বার্থে। অবশেষে এল চূড়ান্ত প্রশ্ন : আমাদের শিক্ষা, আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা "ওদের সেবায় লাগাব কেন?"—নঁতেয়্যর, সর্‌বন্‌, স্ত্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রশ্নটাই ছাত্রদের মাথায় সেদিন বারবার ঘুরপাক খেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ "বিশ্ববিদ্যালয়ের" সঙ্গে তাঁদের বৈরিতার কাহিনি এইখানেই শুরু। ১৯৬৭ সালের বসন্তে সেই বৈরিতা বিক্ষিপ্ত ছাত্রবিক্ষোভের জন্ম দিল। ফরাসি ছাত্রনেতা দ্যানিয়েল কন্‌-বেন্‌দিৎ ও গ্যাব্রিয়েল কন্‌ বেন্‌দিতের লেখায় তার সারকথা ধরা আছে:

"The university has, in fact, become a sausage-machine which turns out people without any real culture, and incapable of thinking for themselves, but trained to fit into the economic system of a highly industrialised society. The student may glory in the renown of his university status, but in fact he is fed 'culture' as a goose is fed grain-to be sacrificed on the after of bourgeois appetite." (Obsolete Communism/The Left-Wing Alternative)

ষাটের দশকের আগে থেকেই ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের অবস্থা যা ছিল তা আর বলার নয়। ফাঁকিবাজ-অধ্যাপকদের একনায়কতন্ত্রের চোটে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে পা দিতেন বছরে একটি মাত্র দিন : পরীক্ষাটা নমোনমো ক'রে দেবার জন্য। স্কলারশিপের ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না। তাই, বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীকে চাকরি করতে হত। ১৯৬৮ সালের একটি পরিসংখ্যান বলে : তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ হাজার জন ছাত্রছাত্রীর নাম লেখানো ছিল। ক্লাসে হাজির থাকতেন মাত্র সাতহাজার জন। অনেক বিভাগে আবার ক্লাসরুম গুলো এতই ছোট ছিল যে কোনও কারণে সবাই যদি ক্লাস করতে আসতেনও তাহলেও ক্লাসে তাঁদের স্থান হত না। একটা উদাহরণ : তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিভাগে ন'শো জন ছাত্রছাত্রীর নাম লেখানো ছিল। কিন্তু ক্লাসে জায়গা ছিল মাত্র দু'শো জনের। সৌভাগ্যের বিষয় একসঙ্গে ষাটজনের বেশি কখনই হাজির থাকতেন না। একদিকে এই অসম্মানজনক পরিস্থিতি আর অন্য দিকে

শিক্ষান্তে চাকরির ক্ষেত্রের সীমাহীন অনিশ্চয়তা—এই দুটি ব্যাপার ছাত্র সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। ফ্রান্সের ছাত্রছাত্রীদের মতো তাঁরাও ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থার মধ্যে গোটা সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখতে পান, খুঁজে পান এক কর্তৃত্বপরায়ণ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং তথাকথিত "শিক্ষা ব্যবস্থার" মধ্যেকার যোগসূত্রগুলো।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কারণে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা যে কতোটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যেও আবার যাঁরা বেশি সংবেদনশীল ও পরিবর্তনকামী ছিলেন তাঁদের মনে বিদ্রোহের ভাব যে কতোটা তীব্র আকার নিয়েছিল তার পরিচয় মেলে ১৯৬৪ সালের ২ ডিসেম্বর বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগের সামনে ছ'হাজার জন ছাত্রছাত্রীর জমায়েতে মারিয়ো সাহ্যিয়ো নামে এক তরুণের বক্তৃতায় :

"There is a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart that you can't take part, you can't even tacitly take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it that unless you're free, the machine will be prevented from working at all."

**Die Revolte der Studenten : Kai Hermann.**

চার

বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-আন্দোলন ১৯৬৪ সালের ২ ডিসেম্বরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাজ্যে অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়া-সেই রাজ্যে থাকতেন এমন একজন সমাজবিজ্ঞানী যাঁর নাম ও তত্ত্ব ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হেয়্যার্বের্য়েট মার্কুজে, ১৮৯৮ সালে বের্লিনে তাঁর জন্ম। ফ্রাংকফুর্টের বিখ্যাত "সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের" সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ঐ প্রতিষ্ঠানের আর এক সহ-প্রতিষ্ঠাতা মাক্স্ হর্ক হাইমার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঠেয়োডোর আডোর্নোর মতো তিনিও ছিলেন মার্কসবাদী। তবে একটু ভিন্ন ধরনের। হিটলার সাহেবের চরণ ধ্বনি শুনতে শুনতে এঁরা তিনজনই জার্মানি ছেড়ে আমেরিকায় আশ্রয় নেয়। দীর্ঘদিন জার্মানির সুরক্ষিত, তরঙ্গহীন প্রফেসর-জীবনের পর তাঁরা আমেরিকায় এসে এমন এক উত্তাল জন-জীবনের মুখোমুখি হলেন যা তাঁদের ভাবনা জগতে বেশ বড় গোছের একটা ধাক্কা মারল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর হর্ক হাইমার ও আডোর্নো জার্মানিতে ফিরে গেলেন। মারকুজে গেলেন না। আমেরিকার ব্যাপক ধনতন্ত্র, জার্মানির থেকে অন্যধরনের সামাজিক কাঠামো, বিপুল যন্ত্রশিল্পায়ন, খোলামেলা জনজীবন ইত্যাদির প্রভাবে তাঁর

মার্কসবাদী ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

আমেরিকার (ও সেইভাবে দেখতে গেলে আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত যে-কোনও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের) উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থা, শ্রেণীবিন্যাস ও বিভিন্ন শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব একনাগাড়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক'রে মার্‌কুজে দেখতে পেলেন : শিল্পায়নের প্রায় এক চূড়ান্ত পর্যায়ে যেসব ধনতান্ত্রিক সমাজ পৌঁছে গেছে, সে সব সমাজে 'দমন' ব্যাপারটা সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই জড়িয়ে আছে। শিক্ষায়ন, মানুষের ভাবনা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—সর্বত্রই সার্বিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভাবনা সীমিত।

বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থার দৌলতে মানুষের দশা এতই নিয়ন্ত্রিত যে, সে এখন কেবল মাত্র একটি দিকেই যা যেতে পারে। সে এখন "একমাত্রিক"। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে উৎপাদনের উঁচু মাত্রা জীবন যাত্রার উঁচু মান এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে কেউই আর তার জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হবে এই ভয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার পালটাতে চায় না। ফলে ব্যবসা ও শ্রমের এক ষড়যন্ত্রমূলক সহযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী ততদিনই এক বৈপ্লবিক শক্তি থাকতে পারে, যতদিন পর্যন্ত তা উপস্থিত সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, যা শ্রমিক শ্রেণী আর করছে না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, ঐ ব্যবস্থার ভিত আরও পাকা করার এই পর্যায়ে তারা এক রক্ষণশীল ভূমিকা নিয়ে ফেলেছে। এর ফলে, বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা খোয়া না গেলেও ধ্রুপদী মার্কস্‌বাদ যে অগ্রণী ভূমিকা তাদের কাছ থেকে আশা করে সেই ভূমিকাটি কিন্তু তারা হারাচ্ছে, এ-অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীকে এক শোষণহীন সমাজ গঠনে তাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে শ্রমিক শ্রেণীবহির্ভূত চালকশক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি রয়েছে তাঁদের মধ্যে, যাঁরা গণতান্ত্রিক প্রণালীর বাইরে রয়েছেন।

"অন্য জাত ও বর্ণের শোষিত ও অত্যাচারিতরা, কর্মহীন ও কর্মে অক্ষমরা...অসহ্য (সামাজিক) সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের নিকেশ এঁদের জীবনের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বাস্তবিক ভাবে দরকার। কাজেই তারা যে বিরোধিতা করবেন তা বৈপ্লবিক। যদিও তাঁদের চেতনা হয়তো তা নয়। তাঁদের বিরোধিতা সামাজিক ব্যবস্থাটাকে বাইরে থেকে আঘাত করে বলে তা ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিন্ন পথে চালিত হ'তে পারে না" **('একমাত্রিক মানুষ'-জার্মান সংস্করণ, তর্জমা-লেখক)**

উল্লেখিত বইটিতে বা আরও পরে ঐ বইয়ে এবং অনেক আগে লেখা "এরস্ অ্যাণ্ড সিহ্লিলাইজেশন"-এ ব্যক্ত কিছু ধারণার ওপরে আরও খুলে লেখা "অ্যান এসে অন লিবারেশন"-এ মার্‌কুজে কোথাওই ছাত্রদের নামোল্লেখ ক'রে তাদের দায়িত্বের কথা বলেননি, যদিও ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত শেষোক্ত বইটিতে তিনি একাধিকবার ইউরোপের সংগ্রামী ছাত্র ও তাঁদের কৃতিত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু ষাটের দশকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মার্‌কুজের তত্ত্ব থেকে (গণতান্ত্রিক প্রণালী বহির্ভূত সম্ভাবনা)-শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে তাঁদের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাঁদের

ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে সচেতন বিদ্রোহের পথে চালিত করার জন্য যে প্রেরণাটুকু দরকার তা সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিলেন, তাছাড়া নিজেদের নিজেদের দেশে রক্ষণশীল মার্কসবাদীদের স্থবির কার্যকলাপ দেখে দেখে তাঁরা বিরক্ত ছিলেন এমনিতেই, মার্‌কুজের নতুন, গোঁড়ামিহীন বিশ্লেষণে ও তত্ত্বে এবং "নিয়ন্ত্রিত দুনিয়াকে" "সম্পূর্ণ অস্বীকার" করার আহ্বানে তাঁরা এক নতুন পথের সন্ধান পেলেন।

১৯৬৪ সালে বার্কলি আন্দোলন। ১৯৬৪ সালেই "একমাত্রিক মানুষ" প্রথমে ইংরেজিতে প্রকাশ। আর ঠিক ঐ বছরই মার্‌কুজে একটি সম্মেলন উপলক্ষে হাইডেলবেয়র্গে এলেন, পশ্চিম জার্মানির তরুণ বামপন্থীরা ততদিনে মার্‌কুজেকে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন। হাইডেলবেয়র্গ সম্মেলনে মার্‌কুজের ভাষণের শেষে তরুণ শ্রোতারা ন'মিনিট ধ'রে হর্ষধ্বনি করেছিলেন। বলতে গেলে প্রায় হঠাৎই তাঁরা এমন একজনের সন্ধান পেয়ে গেলেন যিনি আধুনিক ধনতান্ত্রিক এবং তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজে কর্তৃত্বপরায়ণতার ও নিয়ন্ত্রিত দমনমূলক ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্প্রদায় তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঐ কর্তৃত্বপরায়ণতার মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে ইংরেজিতে লেখা মার্‌কুজের "সোভিয়েত মার্কসবাদ" বইটিতে তরুণ ভাবুকরা সমাজতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের যে সমালোচনা পড়েছিলেন, হাঙ্গেরির অভ্যুত্থানে, প্রতিবেশি পূর্বজার্মানির শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি শ্রমিকদরদী সমাজবাদী পার্টির দমনমূলক আচরণে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, নাকের ডগায় বের্লিনের বুকভাঙা প্রাচীরে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর আমলাতান্ত্রিক, বিপ্লববিরোধী ভূমিকায় তাঁরা সেই সমালোচনার যুক্তি খুঁজে পেলেন। মার্‌কুজের মধ্যে তাঁরা এমন একজন বিপ্লবী-দার্শনিকের সন্ধান পেলেন যিনি সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের ব্যর্থতা দেখে হতাশ হয়ে এক "ব্যর্থ দেবতার" ("দ্য গড্ দ্যাট ফেইলড") অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন না, বরং পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক শর্ত অনুসারে এক বৈপ্লবিক নব পন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে, আধুনিক শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিপ্লবীরা তৃতীয় বিশ্বের শোষিত, সংগ্রামী জনগণের মধ্যে তাঁদের সংগ্রামের সাথীদের খুঁজে পাবেন এই মর্মে মার্‌কুজে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার সারবত্তা সেদিনের ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ১৯৬৫ সালে যখন ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ শুরু হল, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিয়েতনামকে কেন্দ্র ক'রে ফাটলো ছাত্রবিক্ষোভের বোমা। ফ্রান্সে, ইতালিতে এবং পশ্চিম বের্লিনে।

## পাঁচ

"দুটো, তিনটে ভিয়েতনাম সৃষ্টি করো" **-চে গুয়েভারা।**

"ইতিহাসের কোনও নির্বস্তুক তত্ত্ব আমাদের একসঙ্গে ধ'রে রাখছে না। ধরে রাখছে যা তা হল এক সমাজের ব্যাপারে অস্তিত্ববাদী বিবমিষা, যে-সমাজ স্বাধীনতার বুলি এবং ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ ও চাহিদার কথা আওড়ায় আর সেই একইসঙ্গে সংগ্রামী মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে বন্ধ করে।" **-রুডি ডুচ্‌কে।**

পশ্চিম বার্লিনের "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে" মুক্তির আন্দোলন যে সবচেয়ে দর্শনীয়ভাবে দানা বেঁধেছিল তার মধ্যে ভাষাতত্ত্বগত মিলটা গৌণ। মুখ্য হল বাস্তবিক ঘটনাপরম্পরা ও অমোঘ ঐতিহাসিক পরিণতি। "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়" ("ডি ফ্রাইয়ে উনিহ্বেয়র্সিটেট") প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে বের্লিনের পূর্বাঞ্চলে "হুম্‌বোল্‌ট বিশ্ববিদ্যালয়ে" রাজনৈতিক মতাদর্শকের ও কর্তৃত্বপরায়ণ আমলাতন্ত্রের চাপের ঠ্যালায় বিজ্ঞানের মানহানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। দীর্ঘকাল নাৎসি কর্তৃত্বপরায়ণতা ও একগুঁয়ে মতাদর্শের কুফলগুলো ক্রমান্বয়ে দেখার পর "হুম্‌বোল্‌টের" ছাত্রছাত্রীরা যখন দেখতে পেলেন যে, ফাসিস্ত শক্তির পরাজয়ের পরেও কর্তৃত্বপরায়ণতার ও অন্য ধরনের একগুঁয়েমির একটা বিয়োগফল থেকেই যাচ্ছে, যার কল্যাণে সচেতন নাগরিকের বদলে রাশি রাশি গোলামই যা তৈরি হবে। তখন কয়েকশোজন ছাত্রছাত্রী বের্লিনের পশ্চিমাঞ্চলে চ'লে এসে (সেকালে তা সম্ভব ছিল) এক "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন। কয়েকজন অধ্যাপককে দলে টানতে সক্ষম হলেন তাঁরা। ছত্রাকার, ভগ্নস্তূপ বের্লিনের পশ্চিমাঞ্চলে একটি সাবওয়ে স্টেশনে শুরু হল "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের" মুক্ত ক্লাস। ছিল না বই, ছিল না জলপানি, ছিল না টেবিলচেয়ার, ছিল না বিদ্যুৎ। কিন্তু এক মুক্ত শিক্ষালাভের আদর্শ ছিল।

কালক্রমে এই "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়" এমন একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল যার সেনেটে দুটি বিভাগের দু'জন অধ্যাপক প্রতিনিধি এবং রেক্টর ও ভাইসরেক্টরের সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে থেকেও দু'জন প্রতিনিধির স্থান থাকল। কিন্তু ছাত্ররা ক্রমশই দেখতে পেলেন যে কার্যক্ষেত্রে এই প্রতিনিধিত্বের কোনও মূল্যই নেই। ছাত্রদের অধিকারে ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় কর্তৃপক্ষ ক্রমশই বেশি মাত্রায় হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় "ফুশে পরিকল্পনার" মতো অতটা নগ্নভাবে না-হলে'ও এমন এমন সব পরিবর্তন আনা হতে লাগল যেগুলোর সঙ্গে মুক্ত শিক্ষার চেয়ে অমুক্ত অর্থনৈতিক অভিসন্ধির সম্পর্কই বেশি। যে সমাজব্যবস্থা পশ্চিমে এইসব কাণ্ড করছে, তৃতীয় বিশ্বে সেই একই সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিনিধিরাষ্ট্র ষাটের দশকে যে নৃশংস কাণ্ডকারাখানা করছিল, সেগুলোও গণতন্ত্রী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর আর এক পরিচয় খুলে ধরল ছাত্রদের চোখের সামনে। ১৯৫৮-৬২ : অ্যালজেরিয়ায় ফ্রান্স। ১৯৬০ : কঙ্গোয় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম।

১৯৬১-৬২ : কিউবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশেষ ১৯৬৪ ও তারপর থেকে : ভিয়েতনামে আবার সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এ তো গেল ধনতন্ত্রীরা। আর সমাজতন্ত্রীরা? ১৯৬১ সালে পূর্ব বের্লিনে তাঁরা প্রাচীর তুলতে শুরু করলেন। তার বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিবাদ জানাতে গেলেন যাঁরা বা পূর্ব থেকে পশ্চিমে পালিয়ে আসার চেষ্টা করলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে সমাজব্যবস্থার আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে প্রাণ দিলেন সেই সমাজব্যবস্থা বিশ্বসাম্যের অখণ্ডতা ও মানবিক মুক্তির প্রচারক। কর্তৃত্বপরায়ণ কম্যুনিস্ট আমলাতন্ত্রের দমন মূলক চরিত্র ও পশ্চিম বের্লিনের ছাত্র ছাত্রীদের চোখ নেহাত কম খোলেনি।

১৯৬৫ সালে একদিকে যেমন ভিয়েতনামে মার্কিনি বোমা পড়তে শুরু করল, অন্যদিকে তেমনি "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়"-এর কর্তৃপক্ষ তাঁদের অগণতান্ত্রিক গা-জোরির এক নগ্ন পরিচয় দিলেন। এরিখ্‌কুবি নামে এক নির্ভীক স্পষ্টবক্তা সাংবাদিককে ছাত্ররা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। এই সাংবাদিক "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়"-এর নামের অযৌক্তিকতা বিষয়ে ১৯৫৮ সালে এমন কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন যা কর্তৃপক্ষকে চটিয়ে দেয়। ১৯৬৫ তে তাই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কুবির প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বার্কলি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিগ্রো নেতা ম্যাল্‌কম এক্‌স্‌কে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেননি। কুবি প্রসঙ্গের অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যর ওপর আলোকপাত করে ক্রিপেন্তর্ফ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অ্যাসিস্ট্যান্ট সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে উল্লেখ করেন যে, কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র কুবিকেই নয়, দার্শনিক কার্ল ইয়াস্‌পার্সকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে দেননি। ক্রিপেন্তর্ফ, সত্যি কথা লেখার অপরাধে চাকরি খোয়ালেন, "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়" খোয়ালো তার "মুক্ত" বিশেষণটা। এই ছোট্ট অথচ দারুণ অর্থবহ বিশেষণটি এসে যুক্ত হলো ক্ষুব্ধ ছাত্রদের বিক্ষোভে। যে ছাত্রসংখ্যা সেই বিক্ষোভ প্রদর্শনে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিল তার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডাকসাইটে ছাত্র রুডি ডুচ্‌কে।

ছয়

"কোমল ছিলেন তিনি, কোমল.....
সব সাচ্চা বিপ্লবীর মতো"

**- ডুচ্‌কে সম্বন্ধে হুলফ্‌ বিয়ারমান**

*"Do you hear the voices in the night Bobby*
*They're crying for you"*

**.....Joan Bacz ("to Bobby")**

"In Germany during the sixties Rudi Dutschke was not only the best known, but also the most consistent leader of the anti authoration movement"

এই বলে ইতিহাসবেত্তা ক্লাউস্ মেনেয়র্ট যুব-আন্দোলনের ওপর লেখা তাঁর ''ট্যোআইলাইট অব দ্য ইয়াং'' বইটিতে ডুচ্‌কে প্রসঙ্গ শুরু করেছেন।

রুডি ডুচ্‌কের আদিবাড়ি পূর্ব জার্মানিতে। ১৯৬১ সালে, পূর্ব জার্মানি থেকে শিগ্‌গিরিই আর বেরোবার রাস্তা থাকবে না এমনধারা কথাবার্তা শুনে তিনি পশ্চিম বের্লিনে চলে এসে ''মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়''-এ নাম লেখান। তাঁর প্রধান বিষয় ছিল সমাজ বিজ্ঞান। পূর্ব জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা ছাত্রদের সঙ্গেই ডুচ্‌কের ঘনিষ্ঠতা হয় প্রথমে। রুডি ও তাঁর বন্ধুরা নিজেদেরকে কর্তৃত্বপরায়ণতাবিরোধী সমাজবাদী বলে মনে করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ও পূর্ব জার্মানিতে যে-ধরনের সমাজতন্ত্র চলছিল তার বিরোধী ছিলেন তাঁরা। তাঁদের দাবি ছিল, যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা পার্টি-আমলাতন্ত্রের হাত থেকে শ্রমিকদের হাতে আসুক।

অনতিবিলম্বে ডুচ্‌কে ''এস ডে এস'' (''সোটসিয়লিস্‌টিশার ডয়েট্‌শার স্টুডেন্টেন্‌বুন্ট্‌'') অর্থাৎ সমাজবাদী জার্মান ছাত্র সংস্থার সংস্পর্শে আসেন। এই ছাত্রসংস্থা এককালে সামাজিক গণতন্ত্রী দলের ছাত্র শাখা ছিল, কিন্তু কালক্রমে প্রথমটি যায় আরও বাঁয়ে এবং দ্বিতীয়টি আরও দক্ষিণে, ফলে, ১৯৬১ সালে অবশেষে সম্পর্ক একেবারে চুকে যায়। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ঐ ছাত্র সংস্থা বের্লিনে বিক্ষিপ্ত কিছু ''স্টাডিগ্রুপ''-এর মধ্যে ছড়ানো ছিল, তিন বছর গভীর ও ব্যাপক পড়াশুনো ও গবেষণা করার পর ঐ ছাত্রসংস্থা যখন বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হল তখন তত্ত্বজ্ঞানে তার পাশে অন্য কোনও সংস্থা আর দাঁড়াতে পারল না। স্টাডিগ্রুপগুলো ''মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়''-এর ওপরেও কিছু কাজ করে যার চূড়ান্ত পর্যায়ে ''গণতান্ত্রিক সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়'' শিরোনামে একটি লেখা ছাপানো হয়। সেখানে ছাত্র-ভাবুকরা তাঁদের সেই ধারণার কথা বলেন, ডুচ্‌কের বিভিন্ন ভাষণে যা বার বার শোনা গেছে: ''কোনও অগণতান্ত্রিক সমাজে এক গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় অসম্ভব''—এর থেকে যে সিদ্ধান্তে না-পৌঁছে উপায় নেই তা হল এই যে গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে অগণতান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থা পালটানো দরকার। পশ্চিম বের্লিনের ছাত্রবিক্ষোভ যে ''মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়''-এর চৌহদ্দি ছেড়ে বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল তার মূলে ছাত্রদের স্বোপার্জিত এই জ্ঞান ও স্বসৃষ্ট এই তত্ত্বের ভূমিকা আমার মনে হয়, অন্যসব প্রেরণার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। একথা একশোবার সত্যি যে, ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ শুরু করার পর ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের সঙ্গে সংহতি জানাতে গিয়ে ছাত্ররা যে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেছিলেন, সেখান থেকেই ছাত্রবিদ্রোহের তীব্রতম পর্যায়টি শুরু হয়। ষাটের দশকের ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস ও সমালোচনা যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই এই ব্যাপারটির ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু ভুয়ো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজেদের দাবিদাওয়ার প্রতি কর্তৃপক্ষের দমনমূলক আচরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে ছাত্ররা

সমাজে তাঁদের নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে যে চেতনা অর্জন করে নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সমাজবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোয় বাস্তবানুগ যে ধারণাগুলো তৈরি করে নিয়েছিলেন, সেই চেতনা ও বৈজ্ঞানিক ধারণার ভূমিকার ওপর সমপরিমাণ গুরুত্ব আরোপ না-করলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

"গণতান্ত্রিক সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়" এবং ঐ ধরনের লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি, পশ্চিম বের্লিনের বিদ্রোহী ছাত্রদের তৎপরতার পেছনে আসল জোরটা কোথায় ছিল : নিজেদের অবস্থানের ভিত্তিতে স্বসৃষ্ট তত্ত্বে। শুধুমাত্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে এক আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের পুলিস, প্রচারমাধ্যম ও জাড্যে-ভোগা "একমাত্রিক মানুষদের" বিরুদ্ধে একনাগাড়ে ঐ হারে লড়া যায় না। তার জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বভিত্তিক বিশ্বাসের ও আদর্শের সহাবস্থান থাকা দরকার রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে। সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ঐ বিশ্বাস ও আদর্শ যাঁরা তৈরি করেছিলেন, বৈপ্লবিক কার্যকলাপের নীচে যাঁরা এক জীবন্ত তত্ত্বের ভিত গড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডুচ্‌কে অন্যতম। অর্থাৎ, রুডি ডুচ্‌কে ছিলেন একাধারে "অ্যাক্টিহ্যিস্ট" ও তাত্ত্বিক।

কর্তৃত্বপরায়ণতার ঘোর বিরোধী ছিলেন ডুচ্‌কে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দু ধরনের কর্তৃত্বপরায়ণতারই বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর এই মনোভাব রাতারাতি গজায়নি। বা, যৌবনের ধর্মই কর্তৃত্বপরায়ণতার বিরোধিতা করা-এই ধরনের কোনও আপ্তবাক্যসুলভ নাটকীয়তাও তার মূলে ছিল না। পূর্বজার্মানিতে সমাজবাদী আমলাতন্ত্রের গা-জোয়ারি তিনি নিজেই দেখেছিলেন। মার্কসের লেখা "সোভিয়েত মার্কসবাদ" বইটা তাঁর ও তাঁর সতীর্থদের মূল ইংরেজিতেই পড়া ছিল (জার্মান অনুবাদ বেরোয় অনেক পরে-১৯৬৪ সালে)। ফলে সোভিয়েত কর্তৃত্বপরায়ণতা সম্বন্ধে তাঁরা সমালোচনার ভিত্তিতে সজাগ হয়ে ওঠেন। এই সমালোচনা যে শুধু মারকুজের সমালোচনা ভিত্তিক তা নয়, পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত দাদাগিরি তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। হাংগেরি জার্মানির চেয়ে আর কতোই বা দূরে? পূর্বজার্মানিও তো সোভিয়েত প্রভাবান্বিত। ১৯৫৩ সালের ১৭ই জুন শ্রমিকরাজের দেশে বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী শ্রমিকদের টিপ করে সমাজবাদী দেশের সৈন্যরা যে গুলিগোলা ছুঁড়েছিল, মার্কসের চেয়ে শিক্ষকতায় সেগুলোই বা কম কি? ষাটের দশকে সোভিয়েত কর্তৃত্বপরায়ণবিরোধী বিদ্রোহীদের প্রতি সমাজবাদী পার্টি-আমলাতন্ত্রের আচরণ—সবই ইতিহাসের শিক্ষা, বাস্তব শিক্ষা, কেতাবপ্রসূত শিক্ষা নয়। ডক্টর খেতাবের জন্যে রুডি ডুচ্‌কে যে থিসিস লিখেছিলেন (যা ১৯৭৪ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়) তার কেন্দ্রীয় বিষয়ও ছিল সোভিয়েত সমাজবাদ।

অন্য দিকে, ধনতন্ত্রী "গণতান্ত্রিক" সমাজেও কর্তৃত্বপরায়ণতার, দমনমূলক মনোভাবের মেওয়া যে কোথায় কোথায় ফলে তাও ডুচ্‌কের অজানা ছিল না। কাজেই তাঁর মনে হয়েছিল যে, মানুষের মুক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত মার্কসবাদ ও

অগ্রণী ধনতন্ত্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ-ব্যাপারে রুডি ডুচ্‌কের বক্তব্য : "ভিয়েতনামে আমেরিকার ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে জরুরি অবস্থাকালীন আইন (১৯৬৬ সালে ফেডারেল সংসদে শাসকদল খ্রীষ্টীয় গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন ও বিরোধীপক্ষ সামাজিক গণতান্ত্রিক পার্টির 'মহা-কোয়ালিশনের' পর সরকারের হাতে আবার জরুরি অবস্থায় বিশেষ আইন চালু করার অধিকার তুলে দেওয়া হয়। লেখক) এবং জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে স্তালিনীয় আমলাদের উপস্থিতি যাবতীয় বিশেষ বিশেষ ও নীতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও একটা জায়গায় এক : ওগুলো হল ক্ষমতাহীন জনসাধারণের ওপর দমনমূলক শাসনের এক দুনিয়াজোড়া ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ।"

**(মূল জার্মান থেকে তর্জমা : লেখক)**

ছাত্রবিদ্রোহীদের মধ্যে, ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যেও পাছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (যা এক ধরনের কর্তৃত্বপরায়ণতার স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়) এসে পড়ে, তাই ডুচ্‌কে নিজেই এক জায়গায় বলেছিলেন : "ডুচ্‌কে হল কর্তৃত্বপরায়ণতাবিরোধী শিবিরের সাময়িক রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অনেকের মধ্যে একজন। বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করানো হল ব্যক্তিবাদী ইতিহাসপ্রেক্ষণের এক মার্কামারা ফসল।"

ষাটের দশকে "নিয়ন্ত্রিত দুনিয়ার" (মারকুজে) কর্তৃত্বপরায়ণতা ও দমনমূলক চরিত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়াও, বিশেষ ক'রে পশ্চিম জার্মানিতে, রুডি ডুচ্‌কে ও তাঁর সতীর্থদের এমন একটা রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল যা যে কোনও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। পঞ্চাশের দশকে ও ষাটের প্রথম দিকে পশ্চিম জার্মানির "অর্থনৈতিক বিস্ময়" জগদ্‌বাসীকে তাকই লাগিয়ে দিলেও, ষাটের মাঝামাঝি অর্থনীতির ক্ষেত্রে আকস্মিক মন্দা দেখা দেয়া কলকারখানার মালিক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা সে সময়ে অনেক শ্রমিক ও কর্মীকে ছাঁটাই করেন। শ্রমিকরা তার উত্তর দেন স্ট্রাইক ও 'সুলো ডাউন' এর মাধ্যমে। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের সবচেয়ে তীব্র শ্রমিক ও কর্মী অসন্তোষ গুম্‌রে ওঠে পশ্চিম জার্মানিতে। শাসনক্ষমতায় আসীন রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রীরা তখন বুঝলেন যে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কিন্তু সংসদে বিরোধীপক্ষ সামাজিক গণতন্ত্রীরা বাধা দিতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে গা-বাঁচানোর শ্রেষ্ঠ উপায় : বিরোধী দলকেও শাসক দলের শরিক করো। সামাজিক গণতন্ত্রীরা টোপটা খেলেন। ১৯৬৬ সালে পশ্চিম জার্মানির সংসদে সরকারপক্ষ ও সরকারিবিরোধীপক্ষ এক মহা-কোয়ালিশনে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলালেন। জার্মান লেখক গ্যুন্‌টার গ্রাস সে সময়ে সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যতবাণী ক'রে লিখেছিলেন : "এই হতভাগ্য বিবাহে উভয় পক্ষ রাজী হ'লে দেশের যুবসম্প্রদায় রাষ্ট্রের দিকে পিঠ ফেরাবেন এবং হয় বাঁয়ে আর নয়তো দক্ষিণে যাবেন।"—মহা-কোয়ালিশনের ফলে সংসদে আর কোনো বিরোধী পক্ষ থাকল না। যে সমাজ দাবি করে যে সে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সে সমাজের পক্ষে এহেন ব্যাপার অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তে পশ্চিম জার্মানির ছাত্রবিদ্রোহীরাই নিলেন বিরোধিতার দায়িত্ব। তবে সংসদের ভেতরে নয়, বাইরে থেকে। অর্থাৎ সে সময়ে পশ্চিম জার্মানিতে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাজনৈতিক দলগুলোর অগণতান্ত্রিক আচরণের বিপরীতে বিদ্রোহী যুবসমাজই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক আচরণের নজির রেখেছিলেন। রুডি ডুচ্‌কে, হুল্‌ফ্‌গাং লেফেহ্বর্য্য প্রমুখ ছাত্রনেতারা সে সময়ে, বাস্তবিকপক্ষে, সংসদবহির্ভূত এক প্রাণবন্ত বিরোধীপক্ষেরও নেতা ছিলেন।

১৯৬৬ মহাকোয়ালিশন পশ্চিম জার্মানির ছাত্রছাত্রীদের চোখ খুলে দিল। তাঁরা বুঝলেন যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ বা তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বরতার বিরুদ্ধেই নয়, সমগ্র রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। একমাত্র বিরোধীপক্ষের যে ভূমিকা তাঁদের ওপর এসে পড়ল, সে ভূমিকা এবার পথেঘাটে, বৃহত্তর জনসমাজেও পালন করা দরকার—পশ্চিম জার্মানির ছাত্রবিক্ষোভ ছাত্র-আন্দোলন, ছাত্রশক্তির বৈপ্লবিক রাজনীতিতে পরিণত হল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে ইরানের শাহ্‌ ও তাঁর স্ত্রীর বের্লিন সফর হল পশ্চিম জার্মান ছাত্রশক্তির প্রথম প্রকাশ্য ব্যাপক বিক্ষোভের উপলক্ষ্য। ২ জুন শাহ্‌ এলেন পশ্চিম বের্লিনের অপেরায়। অপেরার সামনে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। তাঁদের ''শা-শা-শার্লাটন'' স্লোগান এবং ডিম ও টোম্যাটো নিক্ষেপের (অতিথিদের গায়ে একটাও লাগেনি, পুলিসের ব্যারিকেডের দৌলত) উত্তরে বের্লিনের পুলিসবাহিনী ও শাহ্‌-অনুগামী বেশ কিছু মারকুটে ইরানি ছাত্র (পুলিস কর্তৃপক্ষ এঁদেরকে সরকারি বাসে চাপিয়ে অকুস্থলে নিয়ে আসেন) বেটন রড ও রিভলভার হাতে নিলেন। সেগুলো ব্যবহার করলেন। অগুণতি নিরীহ পথচারী ও দর্শক (শাহ্‌দর্শক) নির্দয়ভাবে প্রহৃত হলেন। বেন্‌নো ওনেজর্গ্‌ নামে, অহিংসা আন্দোলনে বিশ্বাসী এক প্রটেস্ট্যান্ট ছাত্রকে পাকড়াও ক'রে পুলিস কর্মচারীরা প্রথমে বেদম প্রহার করলেন এবং তারপর একজন অফিসার তাঁকে তিনহাত দূর থেকে (ছাত্রটির হাতে একটা ইটও ছিল না) গুলি ক'রে মারলেন। ওনেজর্গের মৃতদেহ নিয়ে বিশ হাজার ছাত্রছাত্রী পরের দিন শোভাযাত্রা করেছিলেন পশ্চিম বের্লিনে।

তার কয়েকদিন পরেই মার্‌কুজে এলেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বের্লিনে। রুডি ডুচ্‌কে ও অন্যান্য ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা শুরু হল। তাঁর প্রথম ভাষণে ঊনসত্তর বছর বয়স্ক সমাজবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক কিন্তু কেতাবী তত্ত্বকথার মধ্যে না গিয়ে ২ জুন অপেরার সামনে ছাত্রদের পন্থাগত ভুলের সমালোচনা করলেন : লোহার বেড়া ও পুলিসের ব্যারিকেডের ব্যূহর মধ্যে ঢুকে পড়াটা ছাত্রদের উচিত হয়নি। এহেন বাস্তবঘেঁষা সংগ্রামী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও মার্‌কুজে বিদ্রোহ পরবর্তী অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিকল্পনার কোনও স্পষ্ট প্রস্তাব ছাত্রদেরকে দিতে পারেননি। ডুচ্‌কে, লেফেহ্বর্য্য ও অন্যান্য ছাত্রনেতাদের তত্ত্ব শুনে মার্‌কুজে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর ভাবশিষ্যরা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণাগুলিকে আরও কতো এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা দেখে। ছাত্রনেতাদের বক্তব্যগুলো তিনি বারবার শোনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এবং তাঁর প্রতিটি পাল্টা বক্তব্যের শুরুতেই ছিল এক সতর্কতাপূর্ণ বাক্য : "আপনাদের কথা যদি আমি ঠিক মতো বুঝতে পেরে থাকি তো আমার মনে হয়...।" মার্কুজে ও ডুচ্‌কে পরস্পরের কথা আচরণ খুব একটা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। রুডিকে মার্কুজে স্নেহের সঙ্গে এবং একটু দূরত্ব রেখে "ডেয়্যর জ্যুস ডেমাগোগ" বা "ছোট্টো বক্তিমেকারী" আখ্যা দিয়েছিলেন। এক আলোচনা সভায় মার্কুজে যখন তোফা মেজাজে এক বোতল উৎকৃষ্ট মোজেল-মদিরার ফরমাশ দেন তখন অ-ধূমপায়ী ও মদ্যপানবিরোধী রুডি ডুচ্‌কে কুপিতও হয়েছিলেন ব'লে শোনা যায়।—মার্কুজে বিদায় মুহূর্তে উভয়পক্ষের মধ্যে অবনিবনা না থাকলেও, বৈপ্লবিক কোনও অঙ্গীকারও ছিল না। এটা রুডি ডুচ্‌কে ও অন্যান্য ছাত্রদের ব্যক্তিপূজা বিরোধী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী, স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় বহন করে।

ওনেজর্গ মারা যাবার পর এক বছরও যায়নি—১৯৬৮ সালের ১১ এপ্রিল বের্লিনের ছাত্র-আন্দোলনে দ্বিতীয় বার বন্দুকের আওয়াজ হল। এবারে আর পুলিস না। ইয়োসেফ বাখ্‌মান নামে এক উগ্র দক্ষিণপন্থী যুবক এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আর পরোক্ষভাবে দায়ী আক্‌সেল স্প্রিংগারের পত্রপত্রিকায় কুৎসিত প্রচার ও উস্কানি : "শান্তি বিঘ্নিত করছে যারা তাদের ঝাড়ে বংশে নিকেশ করো" গুলিটা যাঁর মাথায় লাগল তাঁর নাম রুডি ডুচ্‌কে। মারাত্মক ভাবে আহত হলেন তিনি। আটষট্টির ছাত্র-আন্দোলনের চরম মুহূর্তে ডুচ্‌কেকে এইভাবে স'রে যেতে হল।

অসুস্থ অবস্থাতেও ডুচ্‌কে কারাবন্দী বাখ্‌মানকে চিঠি লিখতেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তারও আগে একবার এক ছাত্র বিক্ষোভে দক্ষিণপন্থীরা হামলা করার পর উত্তেজিত সতীর্থদের উদ্দেশ্যে এই "র‍্যাডিকাল" ডুচ্‌কে মেগাফোনে মুখ লাগিয়ে বলেছিলেন : "বন্ধুরা, শান্ত হও। ওরা যা করছে তার চেয়ে অন্য কিছু করতে ওরা এখনও অক্ষম" অর্থাৎ আজ ওরা যা করছে আগামীকাল ওরা তা হয়তো আর করবে না, অন্য কিছু আরও ভাল কিছু করবে, আমাদের সংগ্রামেই সাথী হবে।

রুডি ডুচ্‌কের প্রাণনাশের চেষ্টার পর ডুচ্‌কে ও সংগ্রামী জার্মান ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ইতালি ও ফ্রান্সের ছাত্র বিদ্রোহীরাও বিভিন্ন শহরে দারুণ বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। আর ইতালির ছাত্রবিপ্লবীদের মহলে যে "মার্কসিজমো" অর্থাৎ মার্কসবাদের সঙ্গে "ডুচ্‌কিজমো" অর্থাৎ ডুচ্‌কেবাদ কথাটা শোনা যেতো তা আমি ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি।

দীর্ঘদিনের রোগভোগ (মাথার ক্ষতজনিত) এবং নির্বাসনের পর ডুচ্‌কে আবার রাজনীতির ক্ষেত্রে ফিরে আসছিলেন। গত ক'বছর ধ'রে। পশ্চিম জার্মানিতে পরিবেশদূষণ, পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদনের সুদূর প্রসারী কুফল ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর কায়েমী আমলাতান্ত্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যেসব উদার সমাজবাদী

ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে, সেগুলোর সঙ্গেই ডুচ্‌কের সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুডি ডুচ্‌কে অতীতে কৃত তাঁর বিভিন্ন ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তা খোলাখুলি স্বীকার করতেও তিনি কোনও সংকোচ বোধ করতেন না। তেমনি পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা ঐতিহাসিক এক যুগ মুহূর্তে সময়ের দাবির সঙ্গে নিজের (মুক্ত সমাজবাদী) ধারণাগুলো যুক্তিসংগতভাবে মিলিয়ে আজকের দিনে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক পন্থার সন্ধানে বেরিয়ে অতীত ভুলের কথা ভেবে সংশয়গ্রস্তও হননি তিনি। জীবনের শেষ কটা মাস তিনি পশ্চিম জার্মানির ছিন্ন ভিন্ন ছিট্‌কে-পড়া সমাজবাদী র‍্যাডিকাল গণতন্ত্রীদেরকে আবার মেলাবার চেষ্টাতেই সবচেয়ে ব্যস্ত ছিলেন। দেশের নাগরিক উদ্যোগ ও পারমাণবিক শক্তির বিরোধিতামূলক আন্দোলনের তিনি এক নতুন গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন যার মধ্যে মৌল-গণতন্ত্র, বিকল্প জীবনযাত্রা ও সংসদ বহির্ভূত বিরোধিতার বীজ রয়েছে।

ডাক্তার বারবার সাবধান ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও রুডি ডুচ্‌কে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আবার এক সম্ভাবনার বাস্তবায়নে অনুচিতরকম জড়িয়ে পড়েন। এগারো বছর আগে যে আঘাত তাঁকে এক সম্ভাবনাময় মুহূর্তে অকেজো ক'রে দিয়েছিল (মস্তিষ্কে তাঁর এমন একটা জায়গায় জখম হয়েছিল যে নিজের মাতৃভাষাটাও তাঁকে নাকি আরোগ্য শয্যায় নতুন ক'রে শিখতে হয়েছিল), ১৯৭৯ সালের সায়াহ্নে তারই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তাঁকে আর এক সম্ভাবনার শৈশবে শেষ বারের মতো অকেজো ক'রে দিয়ে গেল। ভগ্নস্বাস্থ্যকে অনুচিত রকম অবহেলা করেছেন তিনি। তবে, রুডি ডুচ্‌কের মতো মানুষের ক্ষেত্রে ঔচিত্যের সংজ্ঞাটা বোধ হয় অন্যরকম।

# ''নাইনটিন এইট্টিফোর''

তিরাশির প্রান্তে এসে যে বছরটার অপেক্ষায় আছি, ১৯৪৮ সালে তারই এক কল্পছবি লিখেছিলেন এরিক আর্থার ব্লেয়ার নামে জনৈক ইংরেজ নাগরিক। অবশ্য লেখক হিসেবে তিনি ঐ নামে পরিচিত নন। ১৯৩৩ সালে ''ডাউন অ্যান্ড আউট ইন প্যারিস অ্যান্ড লন্ডন'' নামে তাঁর প্রথম বইটি লেখার সময়ে তিনি একটা ছদ্ম নাম ধরেন। জর্জ অরওয়েল। ঐ নামেই পঞ্চাশ বছর আগে ব্লেয়ারের লেখক জীবন শুরু। বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়েস হতো আশি। জর্জ অরওয়েলের পঞ্চাশ। লেখক জীবনের এই সুবর্ণজয়ন্তীর বছরটা রহস্যময় হয়ে ওঠে যখন ভেবে দেখি যে তাঁর সবচেয়ে জীবন্ত বইয়ের নাম আর কদিন পরেই চোখের সামনে অষ্টপ্রহর হাজির থাকবে। ক্যালেন্ডারে, ডায়রির পাতায়, হিসেবের খাতায়। ১৯৮৪।

এ এক আশ্চর্য হিসেব। আমরা কি এই ভেবে পুলকিত হবো যে এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এক স্মরণীয় লেখকজীবন শুরু হয়েছিল। নাকি শংকিত হবো এই ভেবে যে অরওয়েলের এক স্মরণীয় দুর্ভাবনা কাহিনির নির্মোক খুলে ফেলে সত্যি হয়ে দাঁড়ানোর যুক্তি খুঁজে পাবে চুরাশির দুনিয়ায়?

অরওয়েলের কল্পনায় ১৯৮৪ এমন একটা সময় যখন একনায়কতন্ত্র ও সর্বগ্রাসী দমনব্যবস্থা পুরোপুরি কায়েম। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসকরা শাসিতদের গতিবিধির ওপর সারাক্ষণ নজর রাখে, রাখে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ। সকলেই অষ্টপ্রহর

মগজ ধোলাইয়ের শিকার, শিকার স্থায়ী যুদ্ধাবস্থার। এমন একটা সময় যখন ব্যক্তিমানুষ আর স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে না। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ অমান্য করলে, দলছুট হয়ে পড়লে চূড়ান্ত সাজা পেতে হয়। এমন একটা সময় যখন মানুষ যা ভাবে তা বলে না, যা বলে তা ভাবে না, যা বলে তার অর্থ আসলে অন্য বা দু'রকম, অনির্দিষ্ট, ভাষা যেখানে অর্থহীন বা ভয়াবহরকম দ্ব্যর্থক, অথবা বিপরীত অর্থবাহী। অরওয়েলের ১৯৮৪। আমাদের ১৯৮৪ তা থেকে কত দূরে?

বিভিন্ন কারণে এ ধারণা প্রায় বদ্ধমূল যে জর্জ অরওয়েল স্তালিনীয় গা-জোয়ারি দেখেই সর্বগ্রাসী সর্বকর্তৃত্বময় শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এবং সেই ভয় মেশানো উপলব্ধি থেকেই ১৯৮৪-র জন্ম, যে কথাটা অতটা প্রচলিত নয় : ব্যর্থ দেবতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেও অরওয়েল শেষ দিন পর্যন্ত সাম্যবাদে আস্থাবান ছিলেন। যাই হোক, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়াও যায় যে কমিউনিস্ট মতবাদ মানেই স্তালিনবাদ মানেই সর্বগ্রাসী দমনব্যবস্থা, তাহলেও চুরাশিতে বলার জো নেই যে ঐ বিশেষ মতবাদটি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে জীবনের সর্বস্তরে গ্রাস করে ফেলেছে।

সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা বলতে শুধু স্তালিনবাদ বা এমন কি (স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পশ্চিমি প্রবক্তারা যা বলতে চান) সাধারণ অর্থে কমিউনিজম বোঝায় কি না, অরওয়েলের ১৯৮৪-র সূত্রে সেটাও একটা বড়ো প্রশ্ন। টোটালিটেরিয়ান মনোভাবের একটা প্রধান লক্ষণ হল এটা একটা নির্দিষ্ট মতবাদকেই চরম প্রাধান্য দেয় অন্য সব ধ্যানধারণার মূল্যে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেটা এই বিশেষ মতবাদটিকে আঁকড়ে ধরে থাকে, বিন্দুমাত্র বিরোধিতাও সহ্য করে না এবং গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকে এমনভাবে সাজিয়ে নেয় যাতে সেই মতবাদ আশ্রয়ী স্বার্থগুলো চিরস্থায়ী এবং পরিবর্তনের প্রায় অসাধ্য হয়ে ওঠে। পশ্চিম দুনিয়ায় সচরাচর দেখা যায় অরওয়েলের ১৯৮৪-র সূত্রে মানুষ অবধারিতভাবেই ভাবছে টোটালিটেরিয়ানিজম তথা কমিউনিজমের কথা। প্রথমত দক্ষিণপন্থী স্বৈরতন্ত্রও যে পুরোদস্তুর টোটালিটেরিয়ান এটা তাঁরা সহজে ভাবতে চান না ইদানিং। মনের কোণে সে ভাবনা কদাচিৎ উঁকি মেরে গেলেও তাঁরা পরমুহূর্তে এই ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ই বুঝি টোটালিটেরিয়ান ফাসিবাদের জমানা শেষ হয়ে গেছে। এখন বাকি আছে শুধু টোটালিটেরিয়ান কমিউনিজম। দ্বিতীয়ত, ফাসিবাদ ও কমিউনিজম ছাড়াও যে টোটালিটেরিয়ানিজম সম্ভব, এটাও তাঁরা ভাবেন না সচরাচর। পাশ্চাত্য মুষ্টিমেয় কিছু চিন্তাশীল মানুষ ও স্বঘোষিত বামপন্থী ছাড়া প্রায় সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা কমিউনিজম ও টোটালিটেরিয়ানিজম সমার্থক। অতএব জর্জ অরওয়েলের ১৯৮৪ কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থাকে নিয়ে লেখা।

আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজ যে কালক্রমে কোন রূপ নেবে, অরওয়েলের তা ১৯৪৮-এ জানা ছিল না বোধহয়। তার ১৬ বছর পর হার্বার্ট মারকুজে শিল্পোন্নত

সমাজে টোটালিটেরিয়ান প্রবণতা সম্পর্কে লিখেছিলেন :

" By virtue of the way it has organized its technological base, contemporary industrial society tends to be totalitarian. For "totalitarian" is not only a terroristic political condition of society, but also a non-terroristic economictechnical coordination which operates through the manipulation of needs by vested interests. It thus precludes the emergence of an effective opposition against the whole. Not only a specific form of Government or party rule makes for totalitarianism, but also a specific system of production and distribution which may well be compatible with a "pluralism" of parties, newspapers," Countervailing powers", etc.

**(One-Dimensional Man. 1964)**

তথাকথিত কমিউনিস্ট দেশে দেশে যে এক ও অদ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ কায়েম সেটাকে অমানবিক ও একপেশে প্রমাণ করতে গিয়ে তথাকথিত মুক্ত পাশ্চাত্য রাজনৈতিক বহুত্বের যুক্তি দেখিয়ে থাকে। বলে থাকে যে পশ্চিমি গণতন্ত্রে পণ্যের অবাধ বাজারের মতো রাজনৈতিক ও সামাজিক ধ্যানধারণার মুক্ত গতিবিধিও স্বীকৃত। এই স্বীকৃতির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী মাইকেল পারেন্‌তি বলছেন :

"The ideational 'market' of this (American) society is more like a modern capitalist consumer market. Ideas are distributed the way products are, to mass audiences by those few who have the financial resources to create and control a mass market. The "free competetion of ideas" like its counterpart notion of free economic copetetion exists more as a legitimating myth than as a material practice. A few ideas and images that are critical and others that are even pornographic, flagrant, violent and shocking can win access to the business controlled mass media so long as they do not challenge the legitimacy of the capitalist system. Anticapitalist ideas find what exposure they can in a handful of "little magazines" which function under the constant threat of financil extinction."

**(Power And The Powerless—, 1978)**

অরওয়েল ১৯৮৪-তে যে মগজধোলাইয়ের কথা লিখেছিলেন তা শুধু সোভিয়েত রাশিয়া আর পূর্ব ইউরোপে ঘটে চলেছে ভাবলে ভুল হবে। মগজধোলাই কোথাও সরাসরি, সোজাসাপ্টা হয়, কোথাও পরোক্ষভাবে, সূক্ষ্ম পন্থায়। একটা হালফিল দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমেরিকার টেলিভিশনে অতি সম্প্রতি "দ্য ডে আফটার" নামে একটা ছবি দেখানো হল। কাহিনি : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে। রাশিয়া আর আমেরিকা পরস্পরের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে পারমাণবিক ব্রহ্মাস্ত্র। সেই প্রলয়কাণ্ডের সামান্য আগে

আর তার একদিন পর থেকে আমেরিকার একটি বিশেষ জায়গায় কী ঘটছে, মানুষ ও সমাজ কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তারই ওপর ছবিটা। ছবির পর টেলিভিশনে একটা আলোচনাসভা বসল। উদ্দেশ্য : ছবিটার যা বিষয় অর্থাৎ পরমাণু যুদ্ধের অকল্পনীয় বিভীষিকা সম্পর্কে মত বিনিময়। সেই আলোচনায় যাঁদের ডাকা হল, একজন বাদে তাঁরা প্রায় সকলেই সরকারের লোক। কেউ কেউ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার ঘোর সমর্থক হিসেবে সুপরিচিত। আমেরিকায় যে শান্তি আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন চলছে তার একজন প্রতিনিধিরও ডাক পড়েনি। একজন বামপন্থীরও স্থান হয়নি ঐ সুধীচক্রে-যদিও মার্কিনি বামপন্থীরা এখন এদেশে শান্তি আন্দোলনের অগ্রভূমিতে রয়েছেন। আরও উল্লেখযোগ্য, আলোচকরা সকলেই শ্বেতাঙ্গ ও পুরুষ। অতজন প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনীতিক, কূটনীতিক প্রভৃতির মধ্যে যিনি একমাত্র, বলা যায় নিরপেক্ষ মানুষ, সেই বিজ্ঞানী কার্ল সেগান পারমাণবিক যুদ্ধের নৃশংসতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতার নির্বুদ্ধিতা এবং এই প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নিয়ে, সাধারণভাবে জীবজগৎ ও মানবজাতির ওপর, পরিবেশ ও জল হাওয়ার ওপর কি নিদারুণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। তিনিই একমাত্র। অন্য সকলে যথারীতি রাশিয়ার পেজোমি, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের সমস্যা, পশ্চিমি গণতন্ত্র ও সভ্যতার উৎকর্ষ এমনকী এ-ধরনের ছবি সাধারণ মানুষের মনোবল কতটা ভেঙে দিতে পারে অতএব ক্ষতিকর—ইত্যাদি নিয়ে শোরগোল তোলায় নিঃসঙ্গ বিজ্ঞানী সেগানের কথা কোথায় ধামাচাপা পড়ে গেল। পরমাণু যুদ্ধের বিপদের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল রাজনীতি ও কূটনীতি এবং কোন পক্ষের কটা ক্ষেপণাস্ত্র ও আণবিক বোমা আছে তার কূটকচাল। অনুষ্ঠানের দর্শকরা আসল সমস্যাটা ভাল করে উপলব্ধি করার সুযোগ যতটা পেলেন, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি শুনলেন তাঁরা কিসিন্‌জার ও ম্যাকনামারার পরিশীলিত বাকচাতুরিতে ভরা অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক লেকচার। এবং বর্তমান মার্কিন সরকারের পেশিবাহুল্য আর মারদাঙ্গা মনোভাবের বিরোধীরা ঐ আলোচনায় বসার সুযোগই পেলেন না। অথচ এ দেশে টেলিভিশন বেসরকারী। তথাকথিত বেসরকারি প্রচারমাধ্যমেও সরকারি ও কায়েমিস্বার্থ কীভাবে সেঁধিয়ে গেছে মুক্ত গণতান্ত্রিক পশ্চিমে, সেটা এই ধরনের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। চিন্তা জাগিয়ে তোলার মতো একটা ছবি দেখানোর পর এ-ধরনের আলোচনার আয়োজন এক রকমের মগজধোলাই ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সভায় 'ডিসিডেন্টদের' স্থান নেই। পাশ্চাত্যে যাঁরা 'ডিসিডেন্ট', রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিরোধী, তাঁরা তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ পান—মাইকেল পারেন্‌তির উদ্ধৃতিতে যা বলা হয়েছে—"লিটল্ ম্যাগাজিন" বা ঐ জাতীয় পত্রিকায়, যার পাঠক সংখ্যা নগণ্য। আমেরিকার শ্রেষ্ঠীস্বার্থপুষ্ট বড়ো বড়ো পত্রিকার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাদের পক্ষে কোনও দিক দিয়েই সম্ভব নয়। এই ধরনের পত্রিকা অধিকাংশ বাঁচে পাঠক পাঠিকাদের দয়ায়। তাঁদের কাছে ছোটো ছোটো পত্রিকার প্রকাশকরা থেকে থেকেই সাহায্য চান পত্রিকা

টিকিয়ে রাখার জন্য। এই ধরনের লিটল ম্যাগাজিন, বিশেষত আমেরিকায়, নানা দিক দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকায় পরিণত হয়েছে—যে ধরনের পত্রিকা, শোনা যায়, পূর্ব ইউরোপিয় দেশগুলোতে সরকারবিরোধী লেখকদের একমাত্র হাতিয়ার। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিরোধীরা যদি মার্কিন মুলুকে তাঁদের বক্তব্য রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের প্রবক্তা ও সমর্থকদের পাশাপাশি একই মঞ্চ থেকে তাঁদেরই মতো সোচ্চারে জানিয়ে দেবার সুযোগ না পান তো এ সমাজ ১৯৮৪-র নিয়ন্ত্রিত সমাজ থেকে কত দূরে? সুযোগের এই সাংঘাতিক তারতম্য আর রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের দীক্ষা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী রালফ্ মিলিব্যান্ডের বক্তব্য হল :

" For indoctrination to occur it is not necessary that there should be monopolistic control and prohibition of opposition: it is only necessary that ideological competetion should be so unequal as to give a crushing advantage to one side against the other."

**(The State in Capitalist Society, 1969)**

অরওয়েলের ১৯৮৪-তে গোয়েন্দা পুলিশের সর্বময় উপস্থিতির কথা পড়ে পশ্চিমিরা রুশ জোটভুক্ত দেশে দেশে পুলিশি জুলুমবাজির কথা ভাবতে অভ্যস্ত। ইউরি আন্দ্রোপভ সোভিয়েত গোয়েন্দা পুলিশ কে. জি. বির প্রধান ছিলেন—এটা মার্কিনি প্রচারমাধ্যম থেকে থেকেই জানিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য সোভিয়েত রাষ্ট্র পরিচালনায় এখন গোয়েন্দা পুলিশসুলভ ক্রিয়াকলাপ আরও বেশি করে দেখা দিতে পারে, এই ইঙ্গিত দেওয়া। কিন্তু খোদ মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ নিজেও যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ-র কর্তা ছিলেন সেটা উল্লেখ করা হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপিয় দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় মতবাদের বিরোধিতার সন্দেহে লোকের পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়, রীতিমতো ১৯৮৪-র কায়দায় বিভিন্ন পন্থায় সন্দেহভাজনদের চোখে চোখে রাখা হয়, এসব খবর সুবিদিত। সলঝেনিৎসিন ও তাঁর মতো লেখকরা এগুলো সাতকাহন করে জানাতে কসুর করেননি, করেন না। এটাই দরকার। নয়তো বাইরের লোকে জানবে কোথা থেকে? কিন্তু সুদর্শন, সুবক্তা, উচ্চশিক্ষিত, চৌকস মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি ও তাঁর ধুরন্ধর ভাই, তৎকালীন আটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি যে মার্কিন লুথার কিং-এর টেলিফোনে কয়েক বছর ধরে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করে অবৈধ প্রণয় থেকে শুরু করে "কমিউনিস্ট সংশ্রব" পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযোগ থরে থরে সাজিয়ে রেখেছিলেন, এবং এফ. বি. আই যে তাঁদের জ্ঞাতসারেই মার্টিন লুথার কিং-এর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল—এগুলো অবশ্যই বড়ো গলায় বলার উপযুক্ত নয়। এবং পশ্চিমি আনুকুল্যে আশ্রিত সলঝেনিৎসিনরাও সারাক্ষণ "গুলাগ গুলাগ" বলে আর্তনাদ করতে এত ব্যস্ত যে এই সব অন্যায় সম্পর্কে টুঁ শব্দটি করার সময় বোধহয় নেই। অথবা, মার্ক্সবাদী বলে নিজের রাজনৈতিক-সামাজিক বিশ্বাসের পরিচয় দিলে যে গণতান্ত্রিক মার্কিন সরকারের চাকরি করা যায় না, শিক্ষকের কাজ পেতে

অসুবিধে হয়, এমনকী কাউকে মার্ক্সবাদী বলে সন্দেহ হলে তার চাকরি খেয়ে নেবার রীতি যে এ দেশে প্রচলিত, সেটাও আলোচনার যোগ্য নয় বোধহয়। এগুলো, তাহলে স্বতঃসিদ্ধ। মার্ক্সবাদ পর্যন্ত যাবার দরকার নেই। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিরোধিতাই যথেষ্ট। কিছু মাস আগে একটি গোষ্ঠী ওয়াশিংটন শহরের কোনও এক ছবিঘরে একটি পরমাণু বিরোধী ছবি দেখানোর তোড়জোড় করেন। প্রথমে মার্কিন সরকার অনেক চেষ্টা করেন অনুষ্ঠানটা রুখতে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ছবিটা দেখা গেল, তবে অনুষ্ঠানের আয়োজক মায় দর্শকদেরও নামধাম চলে গেল এফ. বি. আই গোয়েন্দাদের খাতায়। অরওয়েলের ১৯৮৪ থেকে এর দূরত্ব কত?

অরওয়েলের উপন্যাসে একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল ইলেকট্রনিক্স। টেলিস্ক্রিন, টেলিভিশনের ক্যামেরা, পর্দা। কোথাও সেই সর্বদ্রষ্টা যন্ত্রের হাত থেকে রেহাই নেই, সভ্য পশ্চিমি সমাজেও 'ক্লোজ-সার্কিট-টিভি'-র ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করার মতো। দোকানে বাজারে, আপিসে, পাতাল রেলের স্টেশনে, বিমানবন্দরে সর্বত্রই কোণে কোণে ক্যামেরা। এই ক্যামেরা দেখে দেখে সাধারণ মানুষ এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে এটার কথা লোকে আর সচেতনভাবে ভেবেই দেখে না। অরওয়েলের ক্যামেরা আজ পাশ্চাত্যে জনজীবনের অঙ্গে প্রতিটি জায়গায় কেউ-না-কেউ সকলের গতিবিধি লক্ষ করে চলেছে। ১৯৮৪-র বিগ ব্রাদারের মতো। বিমানবন্দরের শৌচাগারেও টিভি ক্যামেরা। বিগ ব্রাদার সবই দেখছেন।

ইলেকট্রনিক গোয়েন্দাগিরির আর এক মাধ্যমে কমপিউটার। আশির দশক কমপিউটারের দশক। অজস্র তথ্য ধরে রাখা যায় এই যন্ত্রে এবং নিমেষে তা নখাগ্রে পাওয়া যায়। নিছক দু-একটা বোতাম টিপে। পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের, বাসিন্দাদের ঠিকুজিকুষ্ঠি, কে কী কাজ করে, কে কোন সংস্থার (কি সাংস্কৃতিক কি রাজনৈতিক) সদস্য, কোথায় কার কত দেনা, কার নামে কী অভিযোগ, কে কতবার মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর জন্য বা অন্য কোনও কারণে সাজা পেয়েছে, কার কী অভ্যেস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণাই বা কী—সবই কমপিউটারস্থ। ব্যবসায়ী, ব্যাংকের কর্তা, গোয়েন্দা সকলেই এসব খবর পাঁচ মিনিটে জেনে নিতে পারেন। এমনকী ভৌতিক খবরও। অর্থাৎ যেসব তথ্য ইচ্ছে করে বা ভুলবশত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কারও কেচ্ছার তালিকায়। বিগ ব্রাদাররা এখন সর্বজ্ঞ। এবং দিনে দিনে কমপিউটার-প্রযুক্তির যা উন্নতি হচ্ছে তাতে ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে বিগ ব্রাদারদের জ্ঞানের পরিধি ক্রমশ বাড়বে বই কমবে না। নিজের বলতে, একান্ত বলতে, গোপন বলতে মানুষের আর প্রায় কিছুই নেই। যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে সেটা সরকারি বদান্যতা নয়, কমপিউটার বিজ্ঞানের তুলনামূলক অনগ্রসরতার জন্য। হয়তো এই চুরাশিতেই কমপিউটারের সেই দুর্বলতা ঘুচে গিয়ে কায়েম হবে যন্ত্র আর কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের রামরাজ্য অরওয়েলের ১৯৮৪-তে।

অরওয়েলের ১৯৮৪-র সার্বিক ভয়াবহতা দুঃস্বপ্নের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল

ভাষার খোল-নলচে-বদলানো কেরামতি। সর্বগ্রাসী শাসকস্বার্থ রক্ষার জন্য অরওয়েলের কাহিনিতে তৈরি হয়েছিল নতুন ভাষা "নিউস্পিক", নতুন ভাবধারা "ডাবল্‌থিংক"। ভাষার নতুনত্বটা ছিল অর্থের দিক দিয়ে। অনর্থ বললে হয়তো আরও মানানসই হয়। বাস্তব দুনিয়ায় ঠিক এটাই ঘটেছে। মোটামুটি দুভাবে। একদিকে রয়েছে বহুব্যবহৃত কিছু শব্দ যেগুলো উচ্চারণমাত্র বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের যুক্তি ও অপকর্মের অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। অন্য দিকে রয়েছে প্রচলিত শব্দের নতুন অর্থ, ব্যঞ্জনা এবং পরিচিত শব্দ সমষ্টির প্রয়োগে এক বা একাধিক বিশেষ মতলবসিদ্ধি। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবক্ষেত্রেই শব্দগুলো বিশেষ্য। প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলির মধ্যে হয়েছে যেমন; শ্রমিকশ্রেণী, সাম্য, শ্রেণীচক্র, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার (পশ্চিমে এখন এর কাটতি সবচেয়ে বেশি), শান্তি, আইন ও শৃঙ্খলা, শোধনবাদী, কমিউনিস্ট, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি। এক এক শাসকদল এইসব শব্দের এক একটা বা এক সঙ্গে অনেকগুলো বলে বলে নিজের কাজ হাসিল করে। রাষ্ট্রীয় বা শ্রেণী অথবা কায়েমি স্বার্থের সমালোচককে কোথাও বলা হয় শোধনবাদী, কোথাও বা কমিউনিস্ট গণতন্ত্রের দুষমন। দলছুট লোক কোথাও হয়ে পড়ে শ্রেণীশত্রু, কোথাও গণতন্ত্রের শত্রু। সাম্য, গণতন্ত্র, আইনশৃঙ্খলার নামে যে কোনও নাগরিকের পেছনে গোয়েন্দা লাগানো যায়, আটক করা যায়, তাঁর চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা যায়, তাঁর চরিত্রহনন করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন মার্টিন লুথার কিংকে "কমিউনিস্ট" বলে তাঁর চরিত্রহননের, তাঁর সম্পর্কে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে দেবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন মার্কিন কর্তৃপক্ষ। পূর্ব জার্মানির কবি, গায়ক ও সরকার-সমালোচক ভলফ্‌ বিয়ারমানকে বা চেক্‌ লেখক মিলনা কুন্ডেরাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল "পশ্চিমি দালাল" বলে। দুটো শব্দ বিপরীতধর্মী—কিন্তু একই স্বার্থে, একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত।

"মানবাধিকার" শব্দটিও চমৎকার। পশ্চিমি শাসকবর্গের মতে এটা লঙ্ঘিত হচ্ছে শুধু সমাজবাদী দেশে দেশে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, চিলি বা এল সালভাদোরে মানবাধিকার থাকল না গেল, সেটা তাঁদের কাছে বিচার্য নয়। কারণ এরা সব বন্ধু দেশ। রাশিয়ার মতাদর্শ বিরোধীদের মানবাধিকার আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের বা এল সালভাদোরের কৃষকদের অথবা চিলির ছাত্রদের মানবাধিকার নেই। সরকারবিরোধিতার ন্যায্য অধিকার আছে পোল্যান্ডবাসীর, বা নিকারাগুয়ার সোমোসা-অনুগামীদের। দক্ষিণ কোরিয়ার বা ফিলিপাইনের জনগণের তা নেই।

রেগান সরকার যেমন দুটি বিশেষ শব্দ বেছে নিয়েছেন তাঁদের পররাষ্ট্রনীতিক সুবিধার জন্য। দুটোই বিশেষণ। "টোটালিটেরিয়ান" আর "অথরিটেরিয়ান"। টোটালিটেরিয়ান হল সমাজবাদী দেশগুলো। আর অথরিটেরিয়ান হল দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারী দেশগুলো। টোটালিটেরিয়ানদের সঙ্গে রেগান সরকারের শত্রুতা। আর

অথরিটেরিয়ানদের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, মৈত্রী। চিলি বা সালভাদোর সরকার "রেগান-নিউস্পিক" অনুযায়ী টোটালিটেরিয়ান নন, অথরিটেরিয়ান—অতএব তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা-পয়সা দেওয়া যেতে পারে।

বস্তুত, "টোটালিটেরিয়ান" আর "অথরিটেরিয়ান"—এই দুই শব্দের নবভাষ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা এসে পড়েছি অরওয়েলের "ডাবল্‌থিংক্‌"-এ "১৯৮৪"-তে ছিল : "যুদ্ধই শান্তি, শান্তিই যুদ্ধ।"—তার প্রায় নকল করেই যেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি সাদরে এক মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্রের নাম রেখেছেন "পীসকীপার"-শান্তিরক্ষী। এই শান্তি আর গণতন্ত্রের নামেই মার্কিন সেনাবাহিনী গ্রেনাডায় যায় মৃগয়ায়, সোভিয়েতবাহিনী ঢুকে পড়ে আফগানিস্তানে। দ্বিতীয়টিকে পশ্চিমি প্রচারমাধ্যমে বলা হয় "আগ্রাসন" আর লেবাননে ইস্রায়েলের অভিযান হয়ে দাঁড়ায় "আক্রমণ"। "ডাবল্‌থিংক্‌" গ্রেনাডায় মার্কিনি আগ্রাসনকে প্রথমে বলা হয়েছিল "আক্রমণ"। তারপর ক্রমান্বয়ে অরওয়েলের ভাষার কারসাজিতে সেটা হয়ে দাঁড়াল "অভিযান"। এবং ইদানিং সেটা "রেস্‌কিউ অপারেশন" বা উদ্ধার-অভিযানে এসে ঠেকেছে। এরপর হয়তো এটাকেই বলা হবে "পিকনিক" বা "ফুটবল ম্যাচ"।

যে কারণে যে উদ্দেশ্যে ভাষার এই ইচ্ছাকৃত অপব্যবহার, তারই নিদারুণ পরিণামে নবজাতক চুরাশিতে আমরা হয়তো দেখব অরওয়েলের ১৯৮৪-র চূড়ান্ত বাস্তবায়ন—সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বপরায়ণতায় এবং ব্যাপক যুদ্ধে।

# গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

১৯৬৭ সালে স্প্যানিশ ভাষাভাষী দুনিয়ায় একটা ঘটনা ঘটে। ঘটে একটা বইয়ের আকারে। "সিয়েন আনিয়োস দে সলেদাদ"। একটি উপন্যাস। চিলির কবি পাবলো নেরুদা সে-সময়ে মন্তব্য করেছিলেন। "সেরভান্তেসের 'দন কিহোতে'র পর স্প্যানিশ ভাষায় এত বিপুল উদ্‌ঘাটন বোধহয় আর ঘটেনি।"—এ কথার সত্যতা যাচাই করতে ইংরেজিভাষী দুনিয়াকে তারপর আরও বছর তিনেক অপেক্ষায় কাটাতে হয়েছে। ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেরোয় গ্রেগরি রাবাস্‌সার অনবদ্য অনুবাদ : "ওয়ান হান্‌ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড।" ঔপন্যাসিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের নাম বলতে গেলে রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই উপন্যাস এখন পর্যন্ত ৩২টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বিক্রী হয়েছে মোট ১ কোটি কপি।

সাহিত্যে বিরাশির নোবেল-বিজেতা গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস যে দেশের মানুষ সেই কলোম্‌বিয়ারই কবি আল্‌ভারো মুতিস ১৯৭৪ সালে ইগ্‌নাসিয়ো সোলারেসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের অধুনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন : "However good European or North American models may be, Latin American writing needs to invent its own particular tradition to survive in this situation, which is so special and different from that of the rest of the world... Today the testimony the present writers provide is transforming the

vision of Latin American writers. A young Colombian writer, for example, starting from 'A Hundred Years of Solitude' by Gabriel Garcia Marquez already relies on a peculiarly national treatment of his national misery. He no longer has the same need to have sole recourse to Dostoevski or kafka. And that should permit him to situate himself better in his own reality." (Latin American Literature Today, Preface/ Mentor, 1977)

আজকের লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক চেতনায় গার্সিয়া মার্কেসের স্থান যে কোথায়, আল্‌ভারো মুতিসের কথা থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারায় স্প্যানিশ বিজেতাদের ("কন্‌কিস্‌তাদোরেস") বয়ে আনা "কৃষ্টিকে" মুতিস পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারেই এক জায়গায় আখ্যা দিয়েছেন "পঞ্চমী শ্রেণীর সাংস্কৃতিক লটবহর।" আধুনিক দক্ষিণ আমেরিকার লেখক ভাবুকরা স্প্যানিশ ভাষাভাষী হলেও সেই লটবহর মাথায় করে ঘুরে বেড়াননি। সাহিত্যিক আদর্শের খোঁজে তাঁরা অবশ্যই তাকিয়েছেন ইউরোপের দিকে, উত্তর আমেরিকার দিকে। আঁজলা পেতে গ্রহণ করেছেন অনেক প্রভাবধারা। সেই ঋণ স্বীকার করতে তাঁরা কখনও কুণ্ঠিতও হননি। ওয়াল্‌ট্‌ হ্বিট্‌ম্যানকে উদ্দেশ করে নেরুদা যেমন বলেছেন;

You taught me
To be American".

সেই কবে, ১৯২৫ সালে আর্জেন্টিনার বিদগ্ধ লেখক ও অক্লান্ত পাঠক হর্‌হে লুইস বর্‌হেস জয়েসের ইউলিসিসের অংশবিশেষ তর্জমা করে দেশের একটি পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। সাহিত্যের সমালোচক ও ভাষ্যকার হিসেবে বর্‌হেস যত নিবন্ধ লিখেছেন তার বেশির ভাগই ইউরোপিয় ও উত্তর আমেরিকান লেখকদের ওপর। শুধু তাই নয়। বর্‌হেসের পরিবারে ইংরেজ রক্ত তো ছিলই উপরন্তু তাঁর বাবা ইংরেজিতেই কথা বলতেন। এই বর্‌হেসই আবার লিখছেন; "I realized that Buenos Aires that city I always thought of as my past, is my future, my present. The years I spent in Europe were illusory I was and always will be in Buenos Aires."

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসও হেমিংওয়ে ও ফকনারের কাছে মনে মনে নাড়া বেঁধেছেন। কিন্তু লিখতে বসে বিষয়বস্তু, শৈলী আঙ্গিক সব কিছুই পুরোপুরি জারিয়ে নিয়েছেন তাঁর লাতিন আমেরিকান অস্তিত্বে। আজকের দক্ষিণ আমেরিকায় এক সচেতন মানুষ হিসেবে তাঁর যে জীবন, যে চিন্তা, বোধ এবং যে আদর্শ তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছে তাঁর লেখা। কলোম্‌বিয়ার কবি আল্‌ভারো মুতিস "আ পিকিউলিয়ারলি ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট অফ মিজারি" বলতে যা বুঝিয়েছেন, কলোম্‌বিয়ার কাহিনিকার গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের লেখার সেটাই উজ্জ্বল পরিচিতি।

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের জন্ম ১৯২৮ 'আরাকাটাকা' নামে ছোট্‌টো এক

শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন টেলিগ্রাফ অপারেটর। মা ছিলেন বহুপ্রসবিনী। মোট ষোলোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। পরিবার অতিকায়, বাপের মাইনে ক্ষীণকায়-দারিদ্রের আর দোষ কি। গাব্রিয়েল বড় হন দাদু-দিদিমার বাড়ি। সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধার কাছে গৃহযুদ্ধের গল্প, ভূতপেত্নী রাক্ষসখোক্কোসের গল্প আর অতীত সম্পদের কাহিনি এল্‌দোরাদোর বিষণ্ন অলীক স্মৃতিকথা শুনে শুনে তাঁর শৈশব কাটে। ছেলেবেলার এইসব গল্প, ছোট ছোট কাহিনির রঙিন টুকরোগুলো গার্সিয়া মার্কেসের সঙ্গ ছাড়েনি কোনওদিন। তাঁর নানান লেখায় এগুলোই যেন অসংখ্য নুড়ির মতো বিছিয়ে দিয়েছেন তিনি। কাহিনিকার গার্সিয়া মার্কেসের পথ বাঁধা হয়েছে এই নুড়িগুলো দিয়ে। ছোটবড়ো, এবড়ো খেবড়ো। হাঁটতে গেলে আওয়াজ হয়। পাঠকের পায়ের তলায় কলরব করতে থাকে নুড়িগুলো। অনেক কালের অনেক কথা অসংখ্য শিলাখণ্ডের ঠোকাঠুকিতে সশব্দে বেরিয়ে আসে, জানান দেয়। একটা বিরাট মহাদেশের অগণিত মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা, রঙঢঙ, ছেনালিস্বপ্ন, সংগ্রাম, প্রেম যৌনতা ব্যাধি খিদেতেষ্টা দমন দলন—তাদের গোটা ইতিহাস হাজার হাজার উপলখণ্ডে বিছানো আছে গার্সিয়া মার্কেসের কাহিনির নীচে।

তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা যে সব স্কুলে পড়তো তাঁর ছেলেবেলায়, গাব্রিয়েল পয়সার অভাবে সে রকম কোনও স্কুলে যেতে পারেননি। গরিব ছেলেমেয়েদের একটা স্কুলে ভর্তি হন তিনি—তাও বৃত্তি পেয়ে। গ্রামের স্কুল। সেখান থেকে যান বোগোতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নাম লেখান আইন বিভাগে। আইনজীবী হবার কোনও তাগিদে নয়। তিনি দেখতে পান যে একমাত্র আইন পড়লেই বিকেলে কোনও ক্লাস থাকে না। অতএব সে সময়ে কিছু রোজগার করা যায়। রাজনৈতিক গোলমালে বোগোতা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল এবং গাব্রিয়েল পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হলেন। এর পর তিনি এক জায়গায় সাংবাদিকতার কাজ পান। সেটাই তাঁর প্রথম চাকরি। এবং সেই থেকে তিনি সাংবাদিক। আজও, কাহিনিকার হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি সাংবাদিকতা করে থাকেন। আধুনিক দুনিয়ায় অনেক সাহিত্যিকই সাংবাদিক হিসেবে জীবন শুরু করেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সাহিত্যিক হিসেবে যশ ও আর্থিক সাফল্য লাভের পর অনেকেই আর সাংবাদিকতা করেননি বা করছেন না। এদিক দিয়ে গার্সিয়া মার্কেস ব্যতিক্রম। আজও তিনি নিয়মিত সাংবাদিকতা করছেন। গত দু' বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে একটি কলাম লিখছেন তিনি। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে। স্প্যানিশ ভাষার ১৬টি পত্রিকায় সেটা ছাপা হয়।

বিভিন্ন পত্রিকার হয়ে কাজ করেছেন গার্সিয়া মার্কেস। এক সময়ে তিনি বোগোতার "এল এস্‌পেক্‌তাদোর" পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে জেনিভা, রোম ও প্যারিসে ছিলেন। প্যারিসে থাকাকালে পত্রিকাটা উঠে যায়। তিনি প্যারিসেই থেকে যান কষ্টেসৃষ্টে। হিটারহীন একটা চিলেকোঠায় প্যারিসের বেয়াড়া ঠান্ডার মধ্যে সারাক্ষণ ওভারকোট, টুপি আর দস্তানা পরে ক্যারিবিয় উষ্ণতায় অভ্যস্ত গার্সিয়া

মার্কেস ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন আর লেখেন তাঁর প্রথম ছোট উপন্যাস ''নো ওয়ান রাইটস টু দ্য কর্নেল''। পয়সাকড়ি তখন তাঁর একদমই ছিল না। আধুনিক যুগের আর এক মহান ঔপন্যাসিকও ঐ শহরে ঠিক ঐ অবস্থাতেই এককালে তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন। গুন্টার গ্রাস।

সাংবাদিক জীবনে ঐ অঘটন সত্ত্বেও গার্সিয়া মার্কেস সাংবাদিকতায় বীতরাগ হন- নি। পরে তিনি কলোম্বিয়ার বিখ্যাত সরকারবিরোধী পত্রিকা ''আল্‌তের্‌নাতিভা'' চালু করেন এবং কিউবার বিপ্লবের পর যাঁরা কিউবান সংবাদ সংস্থা ''প্রেন্‌সা লাতিনা'' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, তিনি তাঁদেরই একজন। সাংবাদিকতা সাহিত্যচর্চার পরিপন্থী বলে যে ধারণা অনেকেই পোষণ করেন, গার্সিয়া মার্কেসের তাতে সায় নেই। তাঁর মত হল সাংবাদিকতা সাহিত্যিকের শত্রু হতে পারে না যদি যথাসম্ভব সাংবাদিকতা ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করা যায়। কথাটা প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ক জায়গায় হেমিংওয়ের শরণ নিয়েছেন। প্যারিস রিভিউ-এ জর্জ প্লিমপ্টনের সঙ্গে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারে আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের তথাকথিত দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস বামপন্থী রাজনীতির দিকে ঝোঁকেন। তাঁর এই প্রবণতা নিছক কেতাবপ্রসূত নয়। এর একটা রক্তমাংসের ইতিহাস আছে। গার্সিয়া মার্কেসের জন্ম আরাকাটাকায়। সেখানেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে। তাঁর জন্মস্থান লাতিন আমেরিকার এমন একটা অঞ্চলে যেটা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির তথাকথিত ''বানানা ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌মের'' শিকার হয়। স্মরণ করা দরকার যে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে মার্কিনি সংস্থা ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির ভূমিকা ব্রিটেনের ইস্ট ইন্‌ডিয়া কোম্পানির ভূমিকারই অনুরূপ। দুটো কোম্পানিই ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও অভিসন্ধির বাহক। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি বেশ কিছুকাল আগে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন বিরাট বিরাট এলাকা ইজারা নেয় (বলতে গেলে কিনে ফেলে), সেখানে নানান ফলের বিশেষ করে কলার (যা থেকে 'কদলী প্রজাতন্ত্র'' ও ''কদলী সাম্রাজ্যবাদের'' মতো ঐতিহাসিক নামের উৎপত্তি) চাষ শুরু করে দেয়, নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আঞ্চলিক চাষী ও শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মতো খাটাতে থাকে। উত্তর আমেরিকা থেকে ডলারের তোড়া হাতে দক্ষিণ আমেরিকায় নেমে এসে মার্কিনি পুঁজিপতিরা সেখানকার দীর্ঘদিনের সমাজব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ সব ওলটপালোট করে দেন, জনগণের ওপর সীমাহীন নিপীড়ন চালান এবং বিভিন্ন দেশে নিজেদের স্বার্থ চিরস্থায়ী করার উদ্যোগে (কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' কথা মনে পড়ে) এক একটা বোম্বেটে ''সরকার'' কায়েম করতে থাকেন। আঞ্চলিক ভূস্বামীবর্গ আর তাঁদের হাতের পুতুল সামরিক অফিসারদের নিয়ে গঠিত হতে থাকে এক একটা স্বৈরাচারী সরকার— প্রত্যেকটাই মার্কিন সরকারের অনুগ্রহধন্য। লাতিন আমেরিকায় আধুনিক বুদ্ধিজীবী

ও ভাবুক মহল ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে বামপন্থী রাজনীতি আজ এত জনপ্রিয় ও প্রাণবন্ত, তার স্বরূপ বুঝতে হলে, গার্সিয়া মার্কেসের মতো একজন লাতিন আমেরিকান লেখকের মানসিকতা উপলব্ধি করতে হলে লাতিন আমেরিকার ইতিহাসের এই পর্যায় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকলেই নয়। এ-শতকের গোড়ার দিকে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের জন্মস্থান আরাকাটাকার সমাজজীবনকে তছনছ করে দিয়ে যায় মার্কিনি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির মুনাফা-লোটার তাগিদ। "ওয়ান হান্‌ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড"-এ গার্সিয়া মার্কেস তার জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

"The section was surrounded by a metal fence topped with a band of electrified chicken wire which during the cool summer mornings would be black with roasted swallows. No one knew yet what the plantation owners were after or whether they were actually nothing but philanthropists. and they had already caused a colossal disturbance, much more than that of the old gypsies, but less transitory and understandable. Endowed with means that had been reserved for divine providence in former times, they changed the pattern of the rains, accelerated the cycle of harvests, and moved the river from where it had always been and put it with its white stones and icy currents on the other side of the town, behind the cemetery."

**(One Hundred Years of Solitude. Avon Books, Tr. by Gregory Rabassa)**

এই উপন্যাস "মাকোন্‌দো" নামে এক কাল্পনিক জনপদকে কেন্দ্র করে। আগন্তুক ব্যবসায়ীদের ঠ্যালায় এই জনপদ গার্সিয়া মার্কেসের উপন্যাসে যেভাবে তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আচমকা আধুনিক হয়ে উঠেছে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লাতিন আমেরিকার শামিল হবার ইতিহাস তারই মধ্যে প্রতিফলিত। মাকোন্‌দোর শাঁসটুকু শুষে নিয়ে খামার মালিকরা একদিন স্রেফ ছিবড়ের মতো জনপদটাকে, তার সমাজটাকে, তার মানুষগুলোকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। আদ্যিকালের জনপদ তারপর পড়ে রইল তার নিঃসঙ্গতার বোঝা নিয়ে। বাস্তবে যেভাবে পড়ে আছে দক্ষিণ আমেরিকার বুকে অ্যামাজনের জঙ্গলের, বাহা কালিফোর্নিয়ার খনি এলাকার, আর ব্রাজিলের বহু প্রেতনগরী। খোদ আরাকাটাকায় ১৯২৮ সালে "কদলী খামারের" শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। সৈন্যদের গুলিতে ৮০০ শ্রমিক প্রাণ হারান। আরাকাটাকার সন্তান গার্সিয়া মার্কেসের "ওয়ান হান্‌ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড"-এ এই ঘটনা সহজেই স্থান পেয়েছে।

কলোম্‌বিয়ার ইতিহাসে আর এক মর্মান্তিক অধ্যায় শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। গার্সিয়া মার্কেস তখন বোগোতায় আইন পড়ছেন। সে বছর কলোম্‌বিয়ার উদারপন্থী রাজনীতিক হর্‌হে এলিয়েসের গাইতান খুন হন। তা থেকে একটা ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ

বেধে যায়। এর দরুন ১০ বছরে ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান এবং দেশের বেশ বড়ো একটা অংশ একেবারে শেষ হয়ে যায়।—এইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে আমেরিকার কলামবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষার অধ্যাপক জিন ফ্রাংকো সম্প্রতি গার্সিয়া মার্কেসের ওপর লেখা তাঁর এক নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন। "If these events that marked Garcia Marquez's life tell us anything, it is Latin America people have good reason for associating capitalism with brutal disorganization and repression rather than with free market and democracy. That is why both in his journalism and his fiction, he has consistently confronted the atrocities inflicted on Third World countries in the name of development."

**(Colombia's Chronicler of Resistance/" In These Times", Nov. 3-9, 1982)**

লাতিন আমেরিকার ইতিহাসই গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসকে বামপন্থী রাজনীতির পাঠ নিতে সাহায্য করেছে, প্রেরণা দিয়েছে সাংবাদিকতা কাহিনির ও কাহিনির রচনার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর শোষিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষ নিতে, সাম্রাজ্যবাদের সামনে প্রতিরোধের দেওয়াল তুলতে। শুধু রিপোর্ট ও গল্প লিখেই ক্ষান্ত হননি তিনি। বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারের টাকা তিনি লাতিন আমেরিকায় সমাজবাদী বিপ্লবের সম্প্রসারের জন্য কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণার দৌলতে গার্সিয়া মার্কেস আর কলোম্বিয়া সরকারের মধ্যে সদ্ভাব কোনওদিনই ছিল না। শেষে ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে তিনি রাজনৈতিক নিপীড়নের ভয়ে বোগোতার মেক্সিকান দূতাবাসে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। সেই থেকে তিনি মেক্সিকো সিটিতেই আছেন। গার্সিয়া মার্কেস মার্কসবাদী, কিউবান বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক ও ফিদেল কাস্ত্রোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু—এইসব কারণে মার্কিন সরকার তাঁকে দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা দিতে চাননি। আজও পারতপক্ষে চান না। কেবল ১৯৭১ সালে আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গার্সিয়া মার্কেসকে সাম্মানিক ডক্টর খেতাব দিলে তাঁকে অগত্যা আসতে দেওয়া হয়। সেই উপলক্ষেই গাসির্য় মার্কেসের সঙ্গে তাঁর অনুবাদক গ্রেগরি রাবাস্সার প্রথম দেখা হয়। "সিয়েন আনিয়োস দে সলেদাদ"-এর ইংরেজি অনুবাদ "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড" তার আগেই বাজারে বেরিয়ে গেছে। গার্সিয়া মার্কেসের বিশ্বজোড়া খ্যাতির পেছনে তাঁর নিষ্ঠাবান অনুবাদক গ্রেগরি রাবাস্সার অবদান অনেক। এবং মজার কথা, গার্সিয়া মার্কেসের নাকি ধারণা যে ইংরেজি অনুবাদের পর তাঁর উপন্যাসগুলো যে রূপ পেয়েছে সেটা স্প্যানিশ ভাষায় মূল রচনার চেয়েও ভাল।

কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্র দেখাতে না পারলে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস যে দেশে ঢোকার অনুমতি পান না, সেই দেশেরই দুই কাহিনিকারকে গুরু মেনেছেন তিনি। হেমিংওয়ে ও ফকনার। হেমিংওয়েকে গার্সিয়া মার্কেস একবার প্যারিসের

রাস্তায় কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলেন। তার স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি একটি নিবন্ধে। নিবন্ধটির জার্মান অনুবাদ ১৯৮১ সালের ১৪ আগস্ট পশ্চিম জার্মানির "ডিৎসাইট" পত্রিকায় ছাপা হয়। তার কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিলে হেমিংওয়ে সম্পর্কে গার্সিয়া মার্কেসের মনোভাবের এবং লেখক হিসেবে তাঁর শৈলীর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় :

"আমি তাঁকে দেখেই চিনেছি। উনিশশো সাতান্নর বৃষ্টিধোয়া বসন্তের কোনও এক দিনে প্যারিসের বুলভার স্যাঁ মিশেল দিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী মেরী ওয়েলেশের সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আমার অপর ফুটপাথে। যাচ্ছিলেন জাদ্যাঁ দ্যু লুক্সেমবুর্গের দিকে। পরেছিলেন বেজায় পুরনো রঙচটা কাউবয় প্যান্ট, খোপকাটা শার্ট আর টুপি। কেবল একটা জিনিসই যেন তাঁকে মানাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ওটা বুঝি তাঁর নয়। নিকেলের ফ্রেমে গোল গোল ছোট্টো দুটো কাঁচ চোখের সামনে। তাঁর চশমা। ঐ চশমাটা পরে তাঁকে দেখাচ্ছিল কতকটা ঠাকুর্দার মতো। অকালেই বুড়িয়ে গেছেন। তাঁর বয়েস এখন উনষাট। দশাসই চেহারা। না দেখে উপায় নেই এমন বপু। কিন্তু কি আশ্চর্য, পাশবিক শক্তির কোন্ আভাসই পাওয়া যাচ্ছিল না—চালচলনে যেটা কিনা তিনি বিলক্ষণ ফোটাতে চাইতেন। কারণ তাঁর পাছা দুটো হাল্কা, পা দুটো কিছুটা নড়বড়ে যেন। সর্বনের ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে পুরনো বইয়ের স্টলগুলোর মাঝখানে তাঁকে এত জীবন্ত দেখাচ্ছিল যে কে বলবে তাঁর জীবনের তখন আর মাত্র চারটি বছর বাকি।

"এক সেকেণ্ডও বোধহয় নয় আমাকে নিয়ে আমার দুই পেশার চললো মহা টানাটানি—যেটা আকচারই ঘটে থাকে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত। সাংবাদিক হিসেবে ওঁর একটা সাক্ষাৎকার নেব, নাকি রাস্তাটা পেরিয়ে কাছে গিয়ে অকপটে জানাব আমি ওঁর কি দারুণ ভক্ত। দুটো ব্যাপারেই একটা অসুবিধে ছিল। এখনকার মতো তখনও আমি বেজায় ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতাম। আর ওঁর মাতাদোর-মার্কা স্প্যানিশের দৌড় যে কতটা তাতে আমার সন্দেহ ছিল। আমি দুটো ইচ্ছার একটারও ধার মাড়ালাম না—ঐ মুহূর্তটাই নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে। আমার হাত দুটো টারজানের কায়দায় মুখের দুপাশে চোঙার মতো করে নিয়ে এই ফুটপাথ থেকে অন্য ফুটপাথ লক্ষ্য করে হাঁক পাড়লাম : "মা-য়ে-স্-ত্রো-ও-ও-ও!"—আর্নেস্ট হেমিংওয়ে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন, ছাত্রছাত্রীদের ঐ দঙ্গলে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন "মায়েস্ত্রো" (ওস্তাদ) থাকার কথা নয়। একটা হাত তুলে চকিতে ঘুরে গিয়ে আমার উদ্দেশে কতকটা যেন কিশোরকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন : "আদিয়ো-ও-ও-স" (আমিগো)।

সেই একবারই দেখেছি তাকে।"

**জার্মান থেকে ভাষান্তর লেখক।**

ঐ নিবন্ধেরই একেবারে শেষের দিকে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস লিখেছেন :

"কয়েক বছর আগে ফিদেল কাস্ত্রোর গাড়িতে উঠে দেখি আসনের ওপর লাল চামড়ায় বাঁধানো চটি একটা বই। সাহিত্যের পোকা কাস্ত্রো, অসম্ভব পড়াশুনো করেন যিনি, জানালেন : 'মায়েস্ত্রা হেমিংওয়ে।'—যেখানে হেমিংওয়েকে চট করে আশা করা যায় না আজও তাঁকে ঠিক সেখানেই পাওয়া যায়—তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পর...।"

হেমিংওয়ে-ভক্ত গার্সিয়া মার্কেসকে কিন্তু যথাস্থানেই আশা করা যেতে পারে। স্বৈরতন্ত্রজর্জর লাতিন আমেরিকার প্রায় সর্বত্র। তাঁর সাহিত্যচেতনা তিনি ধীরে ধীরে টেনে নিয়েছেন নিজের সমাজের, লাতিন দুনিয়ার, সে-দুনিয়ার অসংখ্য দুর্ভাগ্য মানুষের, তাদের নিত্যজীবনের, সে-জীবনের ভক্ষকদের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে। তিনি প্রায়ই বলেছেন যে তাঁর অনেক কাহিনির বিষয়বস্তু তাঁকে বানাতে হয়নি—"আই টুক মোস্ট অফ ইট ফ্রম রিয়্যালিটি" (নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ২২ অক্টোবর, ১৯৮২)। লাতিন আমেরিকার একাধিক দেশে আজ যা ঘটে চলেছে তার সঙ্গে গার্সিয়া মার্কেসের সাহিত্যের সাযুজ্য কতটা ঐ ঘটনা থেকে তিনি তাঁর রসদ কতটা সচেতনভাবে সংগ্রহ করে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন তার ওপর ভারী সুষ্ঠুভাবে আলোকপাত করেছেন মার্কিনি সাংবাদিক জোন ডিডিয়োন তাঁর হালফিল এক লেখায়। এই সাংবাদিক সম্প্রতি এল্ সালভাদোর ঘুরে এসে "দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অফ বুক্স" পত্রিকায় তিনটি কিস্তিতে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখছেন। আঠারোই নভেম্বর উনিশশো বিরাশির সংখ্যায় তাঁর দ্বিতীয় লেখাটা বেরিয়েছে। শ্রীমতী ডিডিয়োন তাতে লিখছেন যে এল্ সালভাদোরে তিনি সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় টেলিভিশনে "সেনিয়োরিতা এল্ সালভাদোর ১৯৮২" প্রতিযোগিতা দেখছিলেন। এতে যিনি জিতবেন তিনি গণ্য হবেন এল্ সালভাদোরের সেরা সুন্দরী হিসেবে। এখান থেকে তিনি যাবেন "বিশ্বসুন্দরী" প্রতিযোগিতায়। লেখিকা স্মরণ করছেন ১৯৭৫ সালের কথা। সেবার খোদ বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতাটাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজধানী সান্ সালভাদোরে। দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে অনাহারে, অপুষ্টিতে, অশিক্ষায়, অসুখে ভুগছে, এল্ সালভাদোরের দক্ষিণপন্থী স্বৈরচারী সরকার সেখানে কিসের জন্য বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার পেছনে অত টাকা ওড়াচ্ছেন—এই প্রশ্ন তুলে সাল্‌ভাদোরের ছাত্ররা সে বছর প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেন। সরকার এই বেয়াদপির জবাব দেন তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বেশ কিছু ছাত্রকে রাস্তার ওপরেই গুলি করে মেরে ফেলা হয়, বাকি ছাত্ররা "অদৃশ্য" হয়ে যান। লাতিন আমেরিকায় এটা বিচিত্র কিছু নয়। শাসকদের চটিয়ে দিলেই যখন তখন "অদৃশ্য" হতে হয় মানুষকে। যাঁরা একবার হারিয়ে যান, আর কোনওদিনই ফেরেন না তাঁরা। যাই হোক ১৯৭৫ সালের স্মৃতি ১৯৮২ সালে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা প্রতিযোগিতার জাঁকজমককে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। লেখিকা ডিডিয়োনের মনে হলো সেরা সুন্দরীর খেতাব যাঁরা পেলেন না, একটুর জন্য হারালেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়াটা যেন চোখে পড়ার মতো তীব্র। পর মুহূর্তেই তাঁর মনে হয়েছে (কারণ এল্ সালভাদোর দেশটা তিনি

মোক্ষম চেনেন) এটা এমন এক প্রতিযোগিতা যেখানে জয়ী হওয়ার অর্থ একটা স্কলারশিপ পাওয়া বা সিনেমায় নামার সুযোগ পাওয়া বা দামি উপহার পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এল্ সালভাদোরের সেরা সুন্দরী নির্বাচিত হলে হয়তো বিজয়িনীকে ও তাঁর গোটা পরিবারকে আচমকা বিনা কারণে মরতে হবে না বা "অদৃশ্য" হতে হবে না। ঠিক এটুকু বলেই লেখিকা গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের একটি উপন্যাসের একটুখানি উদ্ধৃত করেছেন : "God damn it, he cut inaugural ribbons, he showed himself large as life in public taking on the risks of power as he had never done in more peaceful times, what the hell, he played endless games of dominoes with my lifetime friend General Rodrigo de Aguilar and my old friend the minister of health who were the only ones who...dared ask him to receive in a special audience the beauty queen of the poor, an incredible creature from that miserable wallow we call the dogfight district...I'll not only receive her in a special audience but I'll dance the first waltz with her, by God, have them write it up in the newspapers, he ordered this kind of crap makes a big hit with the poor....."

এল্ সালভাদোরের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের রচনা মিলিয়ে দেখে সাংবাদিক জোন ডিডিয়োন মন্তব্য করছেন যে তিনি গার্সিয়া মার্কেসকে এক নতুন আলোয়, "সোশাল রিয়্যালিস্ট" হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন। আলফ্রেড কাজিন, আরভিং হো বা ভিক্টর প্রিচেটের মতো সাহিত্যবেত্তারা গার্সিয়া সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নিছক আঙ্গিকমুখী সমালোচনার আবর্তেই ঘুরপাক খেয়েছেন সমানে। গার্সিয়া মার্কেসের লেখার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর, তিনি যে সমাজের মানুষ সেই সমাজের চরিত্র ও প্রাত্যহিকতার সঙ্গে তাঁর কাহিনির, তাঁর রচনাধারার সাযুজ্য কতটা তার ওপর তাঁরা আলোকপাত করেননি। এই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি-সাহিত্যসমালোচনা গার্সিয়া মার্কেসের মতো একজন লেখকের প্রতি সুবিচার করতে পারে না। তাঁর প্রতি অনেক বেশি সুবিচার করেছেন বরং আমেরিকার এই সাংবাদিক। ঝানু সাহিত্যসমালোচকরা যে কথা বলে উঠতে পারেননি, এই সাংবাদিক লাতিন আমেরিকার একটি দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসে স্রেফ রিপোর্ট লেখার ভঙ্গিতে সে-কথা অতি প্রাঞ্জলভাবে বলে দিয়েছেন। এই বিবৃতির প্রেক্ষিতে দুটি ব্যাপার বিচার্য। প্রথমত গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের উক্তি : "আমার কাহিনিগুলোর বেশিরভাগ বিষয়বস্তু আমায় বানাতে হয়নি, বাস্তবের মধ্যে থেকে তুলে নিয়েছি।" আর দ্বিতীয়ত, হেমিংওয়ের সমর্থনপুষ্ট গার্সিয়া মার্কেসের উপলব্ধি : সাংবাদিকতাকে যে সাহিত্যের শত্রু হতেই হবে তার কোনও মানে নেই।

জোন ডিডিয়োন তাঁর রিপোর্টে যে উপন্যাসের একটি ভগ্নাংশ উদ্ধৃত করেছেন, গার্সিয়া মার্কেসের সেই উপন্যাসটির নাম "দি অটাম অফ দ্য পেট্রিয়ার্ক।" কাহিনির

প্রধান চরিত্র দক্ষিণ আমেরিকার কোনও এক অজ্ঞাতনামা দেশের একমেবাদ্বিতীয়ম শাসক। ডিক্টেটর। নিজের দেশকে তিনি বিদেশি শোষকদের হাতে প্রায় বেচে দিয়েছেন। উপন্যাস যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে তিনি তাঁর দেশের জনগণের কাছে প্রায় কিংবদন্তীর পুরুষ। যাঁদের ধারণা যে তাঁরা তাঁকে দেখেছেন, আসলে দেখেছেন তাঁরা হয়তো তাঁর 'ডাব্‌ল্‌'কে। আসল পেট্রিয়ার্ক লোকচক্ষুর অন্তরালে এক সুরক্ষিত প্রাসাদ বাস করেন। সেখানে আরও কিছু বাসিন্দা আছেন বৈকি। তাঁর কিছু রক্ষিতা, কিছু কুষ্ঠরোগী ও ভিখারি। প্রাসাদে বসে তিনি যে কাগজে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও সেইসব বক্তৃতা শুনে জনতা কেমন হর্ষধ্বনি করেছিল তার বিবরণ পড়েন, সেই কাগজটার একটি মাত্র কপি ছাপা হয়। কেবল তাঁর জন্য। ঐসব ভাষণ তিনি কস্মিনকালে দেননি। জনতার হর্ষধ্বনিও কোনওদিনই শোনেননি তিনি। অর্থাৎ এই ডিক্টেটর এক মূর্তিমান মিথ্যে—যদিও জনসাধারণের ওপর তাঁর অকৃপণ অত্যাচার ও শোষণের প্রাত্যহিকতায় মিথ্যের লেশমাত্র নেই। একদিকে একনায়কতন্ত্রের জ্বলন্ত অবাস্তবতা আর অন্যদিকে দমনদলনের বাস্তব ইতিহাস—গার্সিয়া মার্কেস এই দুয়ের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন বেশ জটিল বাচনভঙ্গির সাহায্যে। "হান্‌ড্রেড ইয়ার্স" বা "ইন ইভিল আওয়ারের" মতো সহজপাঠ্য নয় "দি অটাম অফ দ্য পেট্রিয়ার্ক।" বইটার অধিকাংশ বাক্যই বেয়াড়ারকম দীর্ঘ। মাঝেমাঝে শুধু "কমা" বসিয়ে গার্সিয়া মার্কেস বিশাল বিশাল এক একটা বাক্য রচনা করেছেন—যেটা এমনিতে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এই উপন্যাস অনেক জায়গাতেই এক একটা বাক্য তিন, চার এমনকি পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। এতে পাঠককে কিছুটা বিব্রত হতে হয়। তবে পড়ায় একটা ছন্দ এসে গেলে কোথাও ঠেকতে হয় না, বা তিন পৃষ্ঠা পিছিয়ে গিয়ে কেঁচে গন্ডুষ করতে হয় না। তার কারণ, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে দুই ক্ষণিক যতিচিহ্নের মাঝখানে যে বাক্যাংশটা রয়েছে, আসলে সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা বাক্য। অর্থাৎ "কমার" বদলে লেখক অনেক জায়গাতেই স্রেফ দাঁড়ি বসিয়ে দিতে পারতেন। দেননি কেন? লেখক হয়তো পাঠককে একটা সময়হীনতার স্বাদ দিতে চান। কায়েমী সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের পেষণে সবকিছু যে মোটামুটি একই ধারায়, কোনও উত্থান-পতন ছাড়াই একটা নির্দিষ্ট গতিতে, সীমাহীন একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, সেই চলনটাকে, সেই পরিবর্তনহীনতাকে পাঠকের গোচরে আনতেই হয়তো পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহারে গার্সিয়া মার্কেসের এত কার্পণ্য। বৃদ্ধ পেট্রিয়ার্কের রাজ্যে কোথাও তেমন কোনো ওঠানামা নেই। সবকিছুই দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো। এমনকি এই স্বৈরাচারীর বয়সেরও কোনও ঠিকঠিকানা নেই। কেউ বলে ১০০, কেউ বলে ২৭৩ বছর।

এই ২৭৩ বছরের উল্লেখেই রয়েছে গার্সিয়া মার্কেসের আর একটা পেটেন্ট কায়দা। অবাস্তবতা ও অসম্ভাব্যতার পরিমিত বর্ণনায় তাঁর যেন আস্থা নেই। সেগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তিনি বিরাট বিকট করে দেখাবেন যা হতে পারে না,

যা হওয়া উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন, পাঠক যাতে সেটা কিছুতেই না ভোলেন তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেন গার্সিয়া মার্কেস এই ঐ অনৌচিত্যকে, অবাস্তবতাকে, ঐ জীবনবিমুখতাকে অতিকায় করে দেখিয়ে। "ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্সে" বিচ্ছিন্ন জনপদ মাকোন্দোর সমাজজীবন যখন চুরমার হয়ে গেল তখন ঘটল প্রলয়। চার বছরের ওপর বৃষ্টি পড়ল একটানা। তারপর দশ বছর অনাবৃষ্টি। "দি অটাম অফ দ্য পেট্রিয়ার্কে" বৃদ্ধ লোলচর্ম ডিক্টেটর সারাজীবন অসংখ্য নারীকে বলাৎকার করে, অগণিত পুরুষকে খুন করে তাদের ঘরণীদের ছিনিয়ে নিয়ে অবশেষে এক "বিউটি কুইনের" প্রেমে পড়লেন। (জোন ডিডিয়োনের সালভাদোর-রিপোর্ট স্মরণ করা যেতে পারে)। মেয়েটিকে ভজাতে তিনি প্রতিদিন মেয়েটির বাড়ি যান অসংখ্য উদ্ভট উপহার নিয়ে :

He arrived at Manuela Sanchez's house laden with so many unusual gifts that they had to take over the houses next door and knock down the intervening walls in order to have room for them. So that the original parlor had become an immense and gloomy shed where there were uncountable clocks from every period, there was every type of phonograph from primitive ones with cylinders to those with a mirror diaphragm, there were all sorts of sewing machines and cranks, pedals, motors, whole bedrooms full of galvanometers., homeopathic pharmaceuticals, music boxes, optical illusion instruments, show cases of dried butterflies, Asiatic herbariums, laboratories for physiotherapy and physical education, machines for astronomy, orthopedics and natural sciences..."

উপহারের অর্থহীন আধিক্যের অতিবর্ণনা না দিয়ে গার্সিয়া মার্কেস যে বিকট আবহ তৈরি করেছেন তাতে একদিকে যেমন অসীম জড়তার শ্বাসরুদ্ধকর দুর্ভোগ, অন্যদিকে তেমনি একটা বিস্ময়কর লাগামছেঁড়া পরিহাসের হুল্লোড়। গোটা ব্যাপারটা যতটা বিকট, প্রায় ততটাই মজার।

গার্সিয়া মার্কেসের এ এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি যে সমাজের যেসব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা দিচ্ছেন সে-সমাজ আদ্যোপান্ত নিষ্ঠুরতায়, অমানুষিকতায় ভরা, সেইসব মানুষ যুগ যুগ ধরে নিপীড়নের অসহায় শিকার। গার্সিয়া মার্কেসের লেখা সেই অমানুষিকতার সেই যন্ত্রণার অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পাঠককে পরিণত করবে দর্শকে, শ্রোতায় এমনকি সহনিপীড়িতে। এ-ব্যাপারে তিনি নির্দয় অনমনীয়। পাঠকের প্রতি সেই অর্থে তাঁর কোনও দরদ নেই। কারণ তিনি জানেন যে তাঁর যা বিষয়বস্তু তাতে কোমলতার লেশমাত্র নেই, নেই কোনও সহৃদয়তার অবকাশ। তিনি জানেন যে তাঁর বিষয়বস্তু অসুন্দর, কর্কশ, কঠোর। পাঠককে সেই কদর্যের, কর্কশতার, কঠোরতার স্বাদ দিতেই তিনি কলম ধরেছেন। মূলত যা পূতিগন্ধময়, তার ওপর দুফোঁটা আতরছেটানো আবরণ দিয়ে তিনি বাস্তবের সঙ্গে আপস করার

জন্য, প্রতিক্রিয়াশীল নান্দনিকতার সুখানুভূতি বিতরণ করার জন্য লাতিন আমেরিকার সমাজের ছবি লিখতে বসেননি। কিন্তু তাঁর লেখার ধরন দেখে এও মনে হয় যে তাঁর যেন ধারণা, যারা বা যে ব্যাপারগুলো মানুষের শত্রু, তাদের বা সেগুলোর কথা একমাত্রিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে তারা যেন বড় বেশি আস্কারা পেয়ে যাবে। জগদ্দল পাথরের মতো তারা যেন আরও চেপে বসবে মানুষের বুকের ওপর। সেই সুযোগটা তিনি তাদের দিতে চান না। ঠাসুবুনোট বর্ণনার কোনও এক গোপন জায়গায় গার্সিয়া মার্কেস তাই কখনও পেতে রাখেন পরিহাসের "বুবি ট্রাপ", মাইন। নিদারুণ বাস্তবের সাঁজোয়া গাড়ি অনেকটা পথ এগিয়ে হঠাৎ ধাক্কা খাবে সেই লুকোনো বোমায়—আকাশ ফাটানো শব্দে বিস্ফোরণ হবে ঠাট্টার বারুদে। তীব্রগতিতে ছিটকে পড়বে অসংখ্য তীক্ষ্ণ শলাকার মতো ভয়ানক অট্টহাসি।—নিষ্ঠুর পেট্রিয়ার্ক যাঁকে শত্রু ঠাওরান, তাঁকে তিনি অবলীলায় ফেলে দেন একটা গড়খাইয়ে পুষে-রাখা কুমিরের মুখে। তিনি যে পথে অভিসারে যাবেন সে-পথে অন্য সকলের জন্য অষ্টপ্রহর কারফিউ জারি করা হয়। ভুলক্রমেও কোনও সাধারণ নাগরিক সেই পথে পা দিলে তাঁকে সেইখানেই মেরে ফেলা হবে। ঢালাও হুকুম। অধস্তন এক অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন জেনে পেট্রিয়ার্ক সেই অফিসারকে স্রেফ রোস্ট করে ফেলেন এবং সেই ঝলসানো মৃতদেহ কিছু অভ্যাগতের খাবার টেবিলে পরিবেশন করা হয়। যে ডিক্‌টেটর কিনা এত ভয়ানক, তাঁর মা কিন্তু এক সাধারণ চাষীর মেয়ে। নেহাতই গ্রাম্য ও সরল। গার্সিয়া মার্কেস তাঁর পরিহাসের বোমাটা লুকিয়ে রেখেছেন এই মায়ের চরিত্রে। একদিন মহা সাজসাজ রবে, ঝকমকে গাড়ি চেপে দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে ডিক্‌টেটর কোথাও একটা টহল দিতে যাবেন। সব আয়োজন তৈরি। এমন সময় তাঁর মা একটা ঝোলার মধ্যে করে অনেকগুলো খালি বোতল এনে ছেলের হাতে দিয়ে ফরমাশ করলেন : "ওরে যাবার পথে বোতলগুলো মোড়ের দোকানে দিয়ে যাস বাবা।"

কখনও আবার গার্সিয়া মার্কেসের লেখার ধরন দেখে মনে হয়, এবারে তিনি গাম্ভীর্যের কুটোটিও স্পর্শ না করে প্রথম থেকেই পরিহাসের কশাঘাতে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে চান। তাঁর "ইন ইভল আওয়ার" উপন্যাসটির কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়। "লা মালা ওরা" নামে বইটি প্রথমে ছাপা হয় স্পেনে ১৯৬৮ সালে। ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছে তার ১১ বছর পর। সময়ের হিসেবে এই উপন্যাসটির স্থান "ওয়ান হান্‌ড্রেড ইয়ার্স" ও "প্রেট্রিয়ার্কে"র মাঝখানে। লাতিন আমেরিকার এক অখ্যাত গ্রামে হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে সে-গ্রামের কেষ্টবিষ্টুদের বাড়ির গায়ে কারা যেন তামাশা করে তাঁদের কিছু হাঁড়ির খবর লিখে দিয়ে গেছে। প্রতি গ্রামেই কারও কারও কিছু গোপন কথা থাকে যেগুলো আসলে গোপন নয়, সে গ্রামের সকলেরই জানা। সেগুলো যদি কোনও প্রভাবশালী সমাজপতির হাঁড়ির খবর হয় তো সাধারণ লোকে সেগুলো নিয়ে সরবে আলোচনা করে না, বড়জোর আড়ালে-

আবডালে ফিসফাস করে। অনেক সময়ে লোকে সেসব খবর জেনেও না-জানার ভান করে থাকে, বেমক্কা ফেঁসে যাবার ভয়ে। এটা সবল ও দুর্বলের পারস্পরিক সম্পর্কের ডায়ালেকটিকের অন্তর্গত। তা, গার্সিয়া মার্কের কাহিনিতে সবলদের হাঁড়ির খবর আর ধামাচাপা থকেছে না। রহস্যজনকভাবে বেরিয়ে পড়ছে নিপাট তামাশার আকারে। এই হল মূল ব্যাপার। এবং এটাকে ঘিরেই বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা, নানান চরিত্রের আগমন। গার্সিয়া মার্কেস প্রথম থেকেই সরেস বাচনভঙ্গি ধরেছেন। তাই বলে তিনি তরল বিদ্রূপ আর রঙ্গ করছেন না। কারণ, তাঁর আসল উদ্দেশ্য হলো লাতিন আমেরিকার পল্লীজীবনের এক মর্মান্তিক দিক উদ্‌ঘাটন করা। তিনি যা দেখাতে চান সেটা রসালো, হাল্‌কা ব্যাপার নয়। পেট্রিয়ার্ক ছিলেন বহুর মধ্যে এক ও অদ্বিতীয়। শ্বাসরুদ্ধকর, আলোবাতাসহীন এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূর্তিমান সংজ্ঞা তিনি একাই। কাজেই শুধু তাঁকে ধ্বসিয়ে দিতে পারলেই অনেকটা কাজ হয়ে যায়। "ইন ইভল আওয়ারের" পল্লীসমাজে কিন্তু কেউই এককভাবে অত শক্তিশালী নয়। বেশ কয়েকজনের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ হয়ে আছে। অনেকেই বিভিন্ন দোষে সমান দোষী। ফলে পরিহাসের মার একটা বিশেষ দিকে কেন্দ্রীভূত হলে চলবে না। বিভিন্ন ফ্রন্টে লেখককে কখনও একযোগে, কখনও বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করতে হবে। এবারে তাই বিবৃতির সরলরেখা বরাবর মাঝেমধ্যে পরিহাসের মাইন পাতা নেই। বিভিন্ন রেখা ধরে প্রচ্ছন্ন ঠাট্টার গুঁড়োগুঁড়ো বারুদ অল্প করে ছেটানো। প্রথম থেকেই তো একাধিক জায়গায় চিড়বিড় করে জ্বলছে, জ্বালা ধরাচ্ছে। কিন্তু চারিদিকে গণ্যমান্য লোকেদের বাড়ির গায়ে রহস্যময় সব খবর লেখা হচ্ছে বলে তিনি অগত্যা একটা হেস্তনেস্ত করার উদ্যোগ নিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন তাঁর অফিসে।

"He went directly to the court-house. His secretary, a skinny old man who was plucking chicken, received him over the frames of his glasses with a look of incredulity.

"To what do we owe this miracle?"

"We have to get this mess in order", the judge said.

... On the wall opposite, a framed lithograph : a smiling, fat, bald man, his chest crossed by the presidential sash, and underneath a gilt inscription : Peace and Justice. The lithograph was the only new thing in the office.

The secretary wrapped a handkerchief around his face and began to clean the desks with a duster..."

এ আপিসে না-হয় কোনও কাজ, না-হয় এমনিতে ঝাড়পোঁছ। সবকিছুই পুরনো, লঝ্‌ঝড়ে। নতুন শুধু প্রেসিডেন্টের ছবিটা অর্থাৎ সম্প্রতি দেশে নতুন একজন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। গদিটাই যা হয়েছে হাতবদল। আর সবকিছু একই রকম আছে।—এই ছবিটা কি শুধু লাতিন আমেরিকার?

আর একজায়গায়, নগরপালের সাংঘাতিক দাঁতব্যথা। বাঁদিকের কোনও একটা দাঁত। তিনি যন্ত্রণার চোটে চোখে সরষে ফুল দেখছেন তবু কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যাবেন না। প্রথমে বোঝার উপায় নেই এর কারণটা কি। নগরপাল ঐ ব্যথা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাঁদিকের গাল ছুঁলেই মারা যাবার জোগাড়। কাজেই সেদিকের দাড়ি কামানোর উপায় নেই। কিন্তু নগরপাল হঠাৎ দাড়ি রাখলে সেটা বেমানান হতে পারে তাই তিনি কেবল ডান গালের দাড়ি কামাচ্ছেন। বাঁ গালে কিন্তু এক সপ্তাহের দাড়ি। এইভাবেই তিনি ধোপদুরস্ত পোশাক পরে রাস্তায় বেরোচ্ছেন সঙের মতো। এটা যে একটা বেজায় বিসদৃশ ব্যাপার, গার্সিয়া মার্কেসের লেখায় তার কোনও আভাস নেই। অন্যান্য লোকেও অবাক হচ্ছে না বা ফিক করে হেসে ফেলছে না। যেন এটাই হবার কথা। লেখক যেন বলতে চাইছেন : জমানা যেরকম তাতে নগরপাল যদি একগালের দাড়ি কামান আর একগালের দাড়ি রাখেন তো বলার কিছুই নেই। এ-বাড়ির লোক পেট পুরে খাচ্ছে আর ও বাড়ির লোক সাতদিন অনাহারে আছে—এ-সমাজে তো এটা হামেশাই হয়, তাই না? তাহলে শ্মশ্রুমোচনে ভারসাম্যের এই অভাব দেখা দিলে আঁতকে ওঠার আছেটা কি?

অনেক পরে অবশ্য বোঝা গেল, নগরপাল কোনও দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে নারাজ। এই নগরপালের পার্টি ক্ষমতায় আসে আগের শাসকদলকে ঠেঙিয়ে উৎখাত করে। সেই অভ্যুত্থানে অনেক লোককে বেমালুম মেরে ফেলা হয়। লাতিন আমেরিকায় যা আকচার ঘটে থাকে। ঐ গোলমালের সময়ে দাঁতের ডাক্তার কিন্তু অভ্যুত্থানকারীদের বিরোধিতা করেছিলেন। বোধহয় তিনি এই অঞ্চলের একমাত্র ডাক্তার বলে তাঁকে মেরে ফেলা হয়নি। তবে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে প্রচুর। অতএব নগরপাল এখন তাঁর কাছে যাবেন কোন সাহসে। একলা, অসহায় অবস্থায় পেয়ে লোকটা যদি বকেয়া হিসেব চোকাতে শোধ নিয়ে বসে। শেষকালে অবশ্য ব্যথা আর সহ্য করতে না পেরে নগরপাল গেলেন ডাক্তারের বাড়ি। সেই যাওয়াটাও একটা কমান্ডো হামলার মতো। তিনজন ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা (নগরপালের দলের লোক) সঙ্গে গেল। প্রথমেই তারা ডাক্তারের বাড়ি চড়াও হয়ে, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দরজাটা ভেঙে ফেলল, ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলল যেন নাশকতামূলক কাজকর্মের সন্দেহে কোনও লোকের বাড়িতে তল্লাসি চলছে। ডাক্তারকে পেয়েই তিনজনেই বন্দুক তাক করল তাঁর দিকে। ডাক্তার কিন্তু জানেন আসল ব্যাপারটা কি। তিনি শান্তভাবে রুগিকে বসতে বললেন একটা চেয়ারে। নগরপালের মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে তিনি নষ্ট দাঁতটা খুঁজতে লাগলেন।

The dentist located the sick molar, using his index finger to push aside the inflamed cheek and adjusting the movable lamp with the other hand completely insensible to the patient's anxious breathing. Then he rolled his sleeve upto the elbow and got ready to pull the tooth.

The mayor grabbed him by the wrist.
"Anesthesia", he said.
Their eyes met for the first time.
"You people kill without anesthesia" the dentist said softly.

এবারে আর পরিহাস নয়। পরিহাসের পালা হঠাৎ চুকিয়ে গার্সিয়া মার্কেস এক নিষ্ঠুর সত্যকে সোজাসাপ্টা দেখিয়ে দিলেন। বিদ্রূপ নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক সত্যের বিস্ফোরণ ঘটল। এই ছোট্টো অনুচ্চ শব্দের গায়ে। এই সংক্ষিপ্ত অথচ অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ বলে দিল লেখকের ক্ষমতা কতখানি।

"ইন ইভল আওয়ারে" গার্সিয়া মার্কেস যে কাটাকাটা সংলাপ ব্যবহার করেছেন, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে সেটা মোটের ওপর দুর্লভ। সুলভ বরং টানা বর্ণনা। সংলাপগুলো তারই মধ্যে যতিচিহ্নের মতো বসানো এমনভাবে যে সংলাপও বর্ণনার একটা অংশ হয়ে পড়ে—ঠিক যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিশ্ছিদ্রের গাম্ভীর্যের পাশাপাশি সুঠাম পরিহাস ও বিদ্রূপের মিশ্র রসায়ন।

ভি. এস. প্রিচেট্ তাঁর 'দ্য মিথ্‌মেকার্স' গ্রন্থে গার্সিয়া মার্কেসের ওপর লেখা নিবন্ধের একজায়গায় লিখেছেন, "What Marquez retriekes from the his history he has surveyed is an Homeric laughter."

প্রিচেট্ যা বলতে চেয়েছেন তার একটা চমৎকার নজির রয়েছে গার্সিয়া মার্কেসের "বিগ মামাস ফিউনারাল" নামে ছোট গল্পে। প্রিচেট্ বোধহয় এই গল্পটা খেয়াল করেননি। করলে তাঁর ঐ অর্থসহ উক্তিটি আরও শক্ত মাটি পেত। ও-গল্পেও আবার মাকোন্‌দোর উল্লেখ। মানচিত্রে যে জনপদ খুঁজে পাওয়া যাবে না। "বিগ্ মামা" হলেন মাকোন্‌দোর মালিক। মেট্রিয়ার্ক। তিনি যদি রাখেন তো থাকল, নয়ত গেল। তাঁর মালিকানা, অধিকার প্রশ্নাতীত। অনেকটা "দি অটাম অফ দ্য পেট্রিয়ার্কের" ডিক্‌টেটরের মতো;

"Big Mama had been Macondo's center of gravity, as had her brothers, her parents, and the parents of her parents in the past, in dominance which covered two centuries. The town was founded on her surname, no one knew the orign or the limits or the real value of her estate, but everyone was used to believing that Big Mama was the owner of the waters, running and still, of rain and drought, and of the district's roads, telegraph poles, leap years, and heat waves and that she had furthermore a hereditary right over life and property."

উদ্ধৃত অংশে অতিকথনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও একটা উপাদান, গার্সিয়া মার্কেস যেটাকে তাঁর স্বাক্ষরের মতো ব্যবহার করেন : কিংবদন্তী। যে দেশে তাঁর জন্ম, ভারতের মতো সেই দেশেও শ্রুতির শেকড় লোকসংস্কৃতির অনেক গভীরে। লোকপরম্পরায় নানান গল্প যুগ যুগ ধরে চলে আসছে কালোম্‌বিয়ায়। অর্থকষ্টে

ভরা তাঁর ছেলেবেলায় গার্সিয়া মার্কেস তাঁর দাদুদিদিমার কাছে বসে বসে সেইসব গল্প শুনেছেন। যেসব কাহিনি প্রজন্ম-প্রজন্ম ধরে অতন্দ্র নদীর মতো বয়ে যায়, সেসব কাহিনিতে মুখের জবানের সাথে সাথে মানুষের বুকের জবানও ঢুকে পড়ে রং লাগে, চড়ে পোঁচের পর পোঁচ। কথা পায় প্রায়শই অথিকথার আদল। স্মৃতি যাতে কিছুতেই না মলিন হতে পারে, শ্রুতি তাই লাগায় রং। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস সেই রঙিন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। শ্রুতির ঐতিহ্যকে স্মরণীয় সমালোচক হ্যালটার বেনিয়ামিন বলেছেন : "এপিক ফ্যাকালটি পার একসেলস।"

যে-দেশে এত কিছু ইচ্ছে করে ভুলে যাবার তোড়জোড়, সে-দেশে আধুনিক গল্পকারকেই যাবতীয় ঘটনা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এবং বিস্মৃতির তুষারপাতে সেগুলো যাতে ঢেকে না যায় তাঁকে তাই অনেককিছু বিরাট বড় করে দেখাতে হবে, অনেক রং চড়িয়ে দেখাতে হবে। খুব জাঁকজমকের সঙ্গে "বিগ মামা"-র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চুকে যাবার পর গার্সিয়া মার্কেস তাই কথককে ডাক দেন :

"The only thing left then was for someone to lean a stool against the doorway to tell the story, lesson and example for future generations, so that not one of the world's disbelivers would be left who did not know the story of Big Mama, because tomorrow Wednesday, the garbage men will come and will sweep up the garbage from her funeral forever and ever."

তার মানে অবশ্য এই নয় যে গার্সিয়া মার্কেস কিংবদন্তীর কোনও কল্পিত স্বর্ণযুগের কথক হয়েই থাকতে চান। কিংবদন্তীর রঙে রসে আখর চুবিয়েও তিনি অতীতকে, "এতদিন" কে এক নিমেষে ভেঙে দিতে পারেন যদি তা মানুষের কণ্ঠরোধ করে। প্রায় অনাদি স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটে একদিন "দি অটাম অফ দ্য পেট্রিয়ার্কে"। বহুযুগের একটানা, সময়হীন দমন নিপীড়ন শেষ হয় পেট্রিয়ার্কের মৃত্যুতে। এতদিন যা সকলের জীবনের মূল্যে বেঁচে ছিল, এবারে তার মরার পালা। আর এতদিন যারা পীড়নের চাপে ধুঁকছিল, আজ তাদের বেঁচে ওঠার দিন। লাতিন আমেরিকায়, শুধু সেখানে কেন সারা বিশ্বে আজ যেখানে স্বৈরতন্ত্রীদের, মানবতার শত্রুদের এতবড় গলা, গার্সিয়া মার্কেসের গল্পের এই শেষপ্রান্তটা সেখানে কষ্টকল্পনার মতো ঠেকে। এও যেন আর-এক রূপকথা। তবু, সাতপাঁচ ভেবে মনে হয়, জীবনমুখী কিছু আশার আলো যদি কল্পনার চকমকিতেও জ্বালানো যায়—তাই বা কম কি। চারদিকে যে বড় অন্ধকার।

# প্রসঙ্গ : দেওয়াল

দেওয়াল এক বিচিত্র জিনিস। মানুষের মুখেরই মত বাঙ্ময়। যুগ যুগ যারা একান্ন থেকেছে, একদিন তারা পৃথগন্ন হয়ে যায় দেওয়াল তুলে। উঠোনে দেওয়াল ওঠে। ইট বালি সিমেন্টের যৌগ রসায়ন নিষেধের, বিভেদের তর্জনি হয়ে শাসায়। একদিন বার্লিনে এমনই শাসানি দেখেছিলাম। আর দেওয়াল-বরাবর কবরের সারি। বিভেদের দেওয়াল ভেঙে দিতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের কবর। সেখানে দেওয়াল শুধু বিভেদের নয়, রোধেরও প্রতীক আর কবর প্রতিরোধের। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের দেওয়াল দেখার স্পৃহা হয়নি কখনও। আউশভিৎস্ বা ডাখাও-এর দেওয়াল ইতিহাস-সচেতন মানুষের বুকে চিরদিনের মত গাঁথা হয়ে গেছে। নিজের বুকে হাত দিলে মাঝেমধ্যে সেই ঠান্ডা পাথরের হিম লেগে যায় অনেকের আঙুলে, যে পাথরে মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার আর নিপীড়িতের কান্না একাকার হয়ে এক বিকৃত ভাস্কর্যে চিরবাঙ্ময়। তবে কলকাতায় চিড়িয়াখানার দিকে যেতে গিয়ে জেলখানার দেওয়াল দেখতে হয়েছে। অলোকরঞ্জনের জবানমাখা "ভ্রাতৃভূমি" কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে মানুষ লিখে দিয়েছে, লিখে চলেছে, লিখে যাবে তার সংগ্রামের ভাষা, ইশতেহার, তারই মধ্যে সিনেমার বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন ওষুধের, বিপ্লবের। বণিকসভ্যতার বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপা। সস্তা আঠা দিয়ে দেওয়ালে সাঁটা। এ সভ্যতার বিরোধীদের বিজ্ঞপ্তি হাতে লেখা। হাতে আঁকা।

আমাদের দেওয়াল শুধু বিপ্লবের নয়, নোংরামিরও বাহন। সে-নোংরামি কতকটা প্রাতিষ্ঠানিক, কতকটা জাতীয়। কাঁচা শিল্পীর কাঁপা হাতে আঁকা দুর্বৃত্তের হাতে নারীলাঞ্ছনার ছবির পাশেই খয়ের মাখা থুথু আর পেচ্ছাবের দাগ। কলকাতার দেওয়াল সর্বংসহা।

মাঝে কোনও কোনও শিল্পী শ্লোগান আর বিজ্ঞাপন ভারাক্রান্ত কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি আঁকার, কবিতার টুকরো লিখে দেওয়ার ব্রত নিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের গায়ে তার একটি নমুনা এককালে দেখেছি। আজ আর তা নেই।

এক সমাজবাদী দেশে গিয়ে দেখেছিলাম দেওয়াল ছবি। চোস্ত সব শিল্পীর আঁকা। বিরাট বিরাট। রঙিন। বিপ্লবী সমাজের ছবি। ইশতেহার সেখানে ছবি হয়ে গেছে। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে শ্লোগান যদি কোনওদিন, কোনও কোনও জায়গায় অন্তত সত্যিকার ছবির রূপ নেয়।

নিউ ইয়র্কের সাবওয়ের দেওয়ালে ছবির, কথার, রঙের হুল্লোড়। ওটাই নিউ ইয়র্কের চরিত্র। শুনেছি নিকারাগুয়ায় বিপ্লবের পর বিপ্লবীরা দেওয়ালে দেওয়ালে শ্লোগান লিখে দিয়েছেন। শুনে কলকাতার কথা মনে পড়ল।

পশ্চিমি দেশগুলোয় দেওয়াল পরিষ্কার। বিশেষ করে বসত বাড়ির দেওয়াল। এত পরিষ্কার যে, কলকাতা থেকে হঠাৎ এলে দেওয়াল-সচেতন যে কোনও লোকের মনে হতে পারে—এ মা, এ যে বড্ড একঘেয়ে। ম্যাড়মেড়ে। প্রাণহীন। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে যেমন জনজীবন, তাঁর সুখদুঃখ, সংগ্রাম, শ্লোগান, বিজ্ঞাপন, বিশৃঙ্খলা ও নোংরামি মূর্ত, পশ্চিমের দেওয়ালে তেমনি প্রতিবিম্বিত "ল অ্যানড অর্ডার"। "স্টিক নো বিল্‌স্‌"-এর হুকুমদারি কোথাও চোখে পড়ে না। কালো কালিতে লেখা শ্লোগান যে দেখা যায় না তা নয়। চোখে পড়ে। সাবওয়ের স্টেশনের দেওয়ালে লেখা এস্ট্যাবলিশমেন্ট বিরোধী চিৎকার বা সমাজের খোলনলচে বদলে দেবার ডাক এ দুনিয়ায় একটা অদ্ভুত সাব্‌ভার্সিভ চরিত্র পায় বেশির ভাগ বসত বাড়ির শুভ্র দেওয়ালের বিপরীতে। মোটের ওপর দেখা যায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের তরফে দেওয়ালে লেখা হচ্ছে না শ্লোগান। কমিউনিস্ট পার্টির ও শ্রমিক শ্রেণীর জয়গানে লেখা কিছু শ্লোগান চোখে পড়তে পারে। আর দেখা যায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বা ব্যক্তি-মানুষের সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো উক্তি। ওয়াশিংটনের এক কৃষ্ণাঙ্গ পাড়ায় একটি দেওয়ালে যেমন লেখা আছে : ইসলাম ধর্মকে আবার বরণ করে নিয়েছেন তাঁরা। যে সমাজ তাঁদের যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করেছে অথচ স্বতন্ত্র করে রেখে দিয়েছে সেই সমাজের বিরুদ্ধে তাঁরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্যকে সম্বল করেই রুখে দাঁড়িয়েছেন। খ্রিস্টানপ্রধান আমেরিকায় ধর্মের দিক দিয়ে এই স্বাতন্ত্র্যকে মিলিয়েছেন তাঁরা ইসলামের সঙ্গে। ইসলাম তাঁদের নতুন পরিচিতি, ইসলামে তাঁদের নতুন আত্মমর্যাদা, ইসলাম তাঁদের হাতিয়ার ও মুক্তির পথ। "ইসলাম ইজ ফ্রিডাম"। দেওয়ালে লেখা এই

শ্লোগান সংখ্যাগুরুর বিপরীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব অ্যান্টিথিসিস।

আমেরিকায় হাতে-লেখা দেওয়াললিপির আর একটা নজির হল : "স্টপ দ্য কেকেকে।" "কেকেকে" হলো "কুক্লাক্সন ক্ল্যানের" সংক্ষিপ্ত রূপ। বর্ণবিদ্বেষী, জাতিবিদ্বেষী "ইসলাম ইজ ফ্রিডম"। মনে রাখা দরকার আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে অনেকেই ইসলামে দীক্ষিত। তাঁরা তাঁদের অতীত সম্পর্কে সচেতন। আফ্রিকার যেসব অঞ্চল থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের ক্রীতদাস করে ধরে আনা হয়েছিল এই সভ্য দেশে, সেসব অঞ্চলে ইসলাম ছিল প্রচলিত ধর্ম। শ্বেতাঙ্গপ্রধান সমাজে নিজেদের অধিকার ও স্বাতন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের শেকড় খুঁজেছেন অতীত পরিচিতিতে।

এই গোষ্ঠী আমেরিকায় এখনও শক্তিশালী। এবং "স্টপ দ্য কেকেকে"—লেখা দেওয়াল শ্বেতাঙ্গ পাড়ায় যত না দেখা যাবে তার চেয়ে বেশি চোখে পড়বে তা কৃষ্ণাঙ্গ পাড়ায়।

ইউরোপে ও আমেরিকায় কোথাও কোথাও দেওয়াললিপি যাও বা দেখা যায়, দেওয়ালছবি সে তুলনায় দুর্লভ। এ জন্যেই সেদিন আমেরিকার মেরিল্যান্ড রাজ্যে এক সড়ক ধরে যেতে যেতে একটা দেওয়াল দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেখান কোনও একটা নির্মাণ কাজ চলছে। তার চারপাশে টিনের উঁচু বেড়া দেওয়া। সেই পোক্ত বেড়া—আপাতত যা দেওয়ালেরই মতো—এখন ছোটখাটো একটা প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। আঞ্চলিক একাধিক স্কুলের ছেলেমেয়েরা নানান ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিয়েছে সেই দেওয়ালে।

বেশির ভাগ ছবিরই একটা স্পষ্ট বক্তব্য আছে—নিছক বর্ণনা বা প্রতিচ্ছবি নয়। এবং বক্তব্যগুলো পাছে নজর এড়িয়ে যায়, নবীন শিল্পীরা কতকটা যেন সেই উদ্বেগেই ছবির বুকে জায়গা বুঝে কথা লিখে রেখেছে। কথাগুলো ছবির মধ্যেই বেশ বড় হরফে ও উজ্জ্বল রঙে লেখা। অর্থাৎ কথাটাও ছবির অঙ্গ। ছেলেমেয়েরা তাঁদের শিল্পকর্মে মুখের মনের ভাষাকে মিলিয়ে দিয়েছে রঙ-তুলির ভাষার সঙ্গে। তাদের ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছে রঙ, আকৃতি, কথা ও অক্ষরের মিলিত রসায়নে।

অধিকাংশ ছবিতেই পৃথিবীর জন্য, মানুষের জন্য ছেলেমেয়েদের দরদ লক্ষ করার মতো। কোথাও এক প্রতীকী বিশ্বজননীকে নিয়ে নানা বর্ণের শিশু। কোথাও লেখা : "মাই হার্ট বিলংস টু দ্য ওয়ার্লড্"। একটি ছবিতে দুটি মেয়ে একে অন্যকে নিজের জিনিসপত্রের ভাগ দিচ্ছে। কেউ আবার এই দুনিয়াটাকে ঘিরে ফেলেছে স্বরলিপিতে। এই সব ছবি দেখেই বোঝা যায় যে, শিল্পীদের বয়েস নেহাতই কম। আর সেখানেই আশা। যে সমাজে এরা শিশু সে-সমাজের কেষ্টবিষ্টুরা মানুষের গায়ের রঙ সমেত একাধিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বিভেদ আজও ঘোচাতে পারেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতার বুলি আওড়াতে আওড়াতে সে সমাজ অনেক দিক দিয়েই আত্মসর্বস্বতার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। একাধিক মার্কিনি সমাজবিজ্ঞানী এই সমাজের নাম

রেখেছেন "অহং-সমাজ"। ইদানিং আবালবৃদ্ধবনিতার সংগীত পিপাসা মেটাচ্ছে যে ছোট্ট যন্ত্রটি, সেই "ওয়াকম্যান" এই অহং-সমাজের একনিষ্ঠ প্রতিনিধি। এই পকেট-স্টিরিয়ো যন্ত্রে একটিমাত্র হেডফোন লাগানো যায়। এবং ঐ হেডফোনটি না লাগালে স্টিরিয়ো-ধ্বনির পুরো মজাটাই মাঠে মারা যাবে—যন্ত্রটা এমনভাবে তৈরি। ফলে "ওয়াকম্যান" বা এই জাতীয় যন্ত্রে যে গান বাজবে সেটা শুনতে হবে একা। সে গান শোনার আনন্দ অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার উপায় নেই। দু একটি যন্ত্রে আরও একটা হেডফোন লাগানোর উপায় আছে। তার বেশি নয়। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে বড়জোর দু'জনে মিলে গানবাজনা শোনা যাবে। তৃতীয় শ্রোতার উদয় হলেই বিপদ। ঐ যন্ত্রটিকে কেন্দ্র করে গানবাজনা শোনার যে আনন্দ, সে-আনন্দে তিনি ব্রাত্য। "ওয়াকম্যানের" মতো এবার "ওয়াচম্যান" ও বেরোচ্ছে। ছোট্ট টেলিভিশন। তার দর্শকের সংখ্যা এক। তার বেশি নয়। এ রকমের এক সমাজে কোনও কোনও শিশুশিল্পী সড়কের ধারে দেওয়ালে-আঁকা ছবিতে লিখে দিচ্ছে : "শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং"—দেখলে আশা হয়। আগাছায় বিস্তৃত জঙ্গলে কোথায় যেন নিভৃতে, নীরবে শস্যের চাষ হচ্ছে।

দুটি ছবি দেখেই মালুম হয় শিল্পী নেহাত শিশু নন। একেবারে পাকা হাতে আঁকা। আলবেয়ট আইনস্টাইনের ছবি। হঠাৎ মনে পড়ল, আইনস্টাইন যে দেশের মানুষ, কই সে-দেশের কোনও দেওয়ালে তো তাঁর কোনও হাতে আঁকা ছবি চোখে পড়েনি। আর মনে পড়ে গেল, যাদবপুরের কোনও এক দেওয়ালে আঁকা স্তালিনের এক আশ্চর্য ছবি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার মতো, তারিফ করার মতো। এত সুন্দর করে আঁকা। ঠিক অমনি সুষ্ঠুভাবে আমাদের দেওয়ালে দেওয়ালে কবে সত্যেন বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা বিদ্যাসাগর অথবা কার্ল মার্কস শোভা পাবেন?

টিনের উঁচু দেওয়াল। তাতে ছবির সারি। ছেলেমেয়েদের আঁকা। আশার ছবি, ভালবাসার ছবি, স্বপ্নের ছবি। এক জায়গায় কিন্তু কোনও ছবি নেই। রঙের স্পর্শ নেই। বরফ, বৃষ্টি রোদ্দুরে বিবর্ণ সেই জায়গাটায় কে যেন লিখে দিয়েছে বড় বড় হরফে। "দ্য ফিউচার ইজ আন্‌সার্টন অ্যানড দি এন্ড ইজ অলওয়েজ নিয়ার।"

# তলিয়ে যাবার আগে

*"That humanity at large will ever be able to dispense with Artificial Paradises seems very unlikely. Most men and women lead lives at the worst so painful, at the best so monotonous, poor and limited that the urge to escape, the longing to transcend themselves if only for a few moments, is and has always been one of the principal appetites of the soul."*

***-Aldous Huxley***
***(The Doors of Perception)***

*"The alienated person is out of touch with himself as he is out of touch with any other person."*

***-Erich Fromm***
***(The Sane Society)***

১৯৫৩ সালের মে মাসে, এক উজ্জ্বল দিনে হাক্স্‌লি আধ গেলাস জলে একরত্তি মেসকালিন গুলে টক্ করে গিলে ফেলেন। তারপর বসে যান তিনি ফলাফলের আশায়। তার এক বছর পর বেরোয় হাস্‌ক্‌লির লেখা চটি একটা বই। 'দ্য ডোর্‌স অফ পার্‌সেপ্‌শন'। সামান্য একটু মেসকালিনের ক্রিয়ায় তাঁর মনোজগতে কি অসামান্য সব কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল তারই ফিরিস্তি রাখা আছে ঐ তন্বী কেতাবের পাতায় পাতায়। মেসকালিন হল এক ধরনের কড়া ড্রাগ।

ইন্‌টেলেকচুয়ালদের ব্যাপারই আলাদা। বঙ্কিমচন্দ্রের কোকিলের মতো। তুমি সু বলিলে সু মানিব। কু বলিলে কু। হাক্‌স্‌লির মতো তুখোড় লেখক, দুরন্ত পাঠক আর চোস্ত ভাবুক-তিনি ড্রাগ গিলে দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি আর দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে যখন শিথিল মগজের রসায়নে বত্তিচেল্লি, সেজান্‌ ভান্‌ গঘ্‌, ব্লেক, উপনিষদ, জেন-দর্শন, সৎ-চিৎ-আনন্দ, জাপানি হাইকু আর মোৎসার্টের 'সি-মাইনর পিয়ানোকনচোত্তো' জারিয়ে তোলেন, পাঠকের তখন তাক্‌ লেগে যায়। যে রূপ, যে ধ্বনি, যে ভাবনা মানুষ নাকি স্বাভাবিক আটপৌরে অবস্থায় ধরতে পারে না, ড্রাগের হাতযশে সেই ধ্বনিরূপ ভাবনায় অবগাহন ক'রে হাক্‌স্‌লি করেছেন মেসকালিনের হয়ে ওকালতি। মাদকদ্রব্যের মেটাফিজিক্‌স লিখেছেন তিনি। তাঁর মতো ভাবুকের ব্যাপারই আলাদা।

কিন্তু বত্তিচেল্লি-ব্রেল-উপনিষদ-হাইকু-মোৎসার্টে বঞ্চিত যারা, যাদের রসনায় ও-রস নানান সামাজিক কারণে পৌঁছতে পারেনি, অথবা যাদের বয়সে মনুসংহিতা থেকে শুরু ক'রে হাক্‌স্‌লি পর্যন্ত সবকিছুই নিরর্থক হ'তে পারে, তাদের বেলা? জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো যারা আট বছর বয়সে বা বার্ট্রান্‌ড্‌ রাসেলের মতো যারা চোদ্দো বছর বয়সে ইউরিপিডিস আর লাইবনিৎস্‌ নিয়ে লোফালুফি খেলে তাদের হিসেবে অবশ্য অন্য। সার্ত্রের মতো শব্দালু কিশোরদের কথাও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা ভাল। কিছুদিন আগে যে কিশোর—হাক্‌স্‌লির জবানে বলতে গেলে কৃত্রিম স্বর্গের খোঁজে-অল্প একটু ড্রাগ সেবন ক'রে নিউ ইয়র্কের এক নাতিদীর্ঘ বাড়ির ওপরতলা থেকে ঝপাৎ ক'রে লাফ দিল, সে-কিশোর মার্কিনি সমাজের নীচের তলার মানুষ। অভিকর্ষ আর শ্রেণীর টানে সে বেবাক নীচেই পড়ল। এখন অবশ্য সে আরও নীচে। মাটির তলায়। পুরোপুরি তলিয়ে যাবার আগে অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় অল্‌ডাস হাক্‌সলিও আরও দুই মুহূর্তের বদলে এল, এস. ডি. চেয়েছিলেন। তাঁকে দেওয়াও হয়েছিল। সেবার কোন দিব্যজ্ঞান তাঁর হয়েছিল, আমরা তা জানি না। ড্রাগের আধুনিক প্রফেট সে সুযোগ আমাদের দেয়নি। যেমন দেয়নি নিউ ইয়র্কের ঐ কিশোরটি।

ছেলেটিকে আত্মবিলোপের মন্ত্রণা দিয়েছিল এক নতুন ড্রাগ। হাক্‌স্‌লির মেসকালিনেরই মতো কতকটা। নাম : পি.সি.পি। এ-রসে মজেছেন যাঁরা তাঁরা বড় আদরে এর নাম রেখেছেন এন্‌জেল্‌ডাস্ট। ভারী মধুর নামটি। জানি না এ-নামের জনক কে। যিনিই হন তিনি রসিক বটে। এন্‌জেল্‌ডাস্ট সেবন ক'রে এক মধুকর ভেবেছিলেন তিনিই বুঝি যিশু। পৃথিবীর যতো পাপ যত বিষ নিজের দেহে ধারণ করছেন এই ভেবে তিনি বেশ প্রমাণ সাইজের এক টুকরো কাঁচ কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলেন। নাড়িভুঁড়ি সব ছিঁড়ে যায়। আর-এক সাধক পি.সি.পির প্রসাদে নিজের বাবা মাকে খুন ক'রে ফেলেন। অন্য একজন মেরে ফেলেন নিজের সদ্যোজাত শিশুকে। নিজের চোখদুটো নিজের হাতেই খুবলে নেন আর-একজন। দ্রব্যগুণ একেই বলে।

সানফ্রানসিসকোর রাস্তায় ষাটের দশকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এই ড্রাগ। তখন তার নাম ছিল "পিসপিল্‌"। শান্তিবটিকা। তবে হেরোয়িন, হাশিশ বা এল. এস.

ডির মতো জনপ্রিয় ছিল না সেটা। তারপর অবশ্য এক দশকের মধ্যেই বস্তুটি এত সমাদর পায় যে ১৯৭৮ সালে মার্কিন সেনেটে শান্তিবটিকা নিয়ে বেজায় অশান্তি শুরু হয়ে যায়। জানা যায় যে আমেরিকায় ৭০ লক্ষ মানুষ জীবনে অন্তত একবার হ'লেও এন্‌জেল্‌ডাস্ট সেবন করেছে। এবং ১০ হাজার জন এ-ড্রাগের নিত্যসেবী। সেনেটের আলোচনায় শান্তিবটিকা কমিটির সভাপতি লেস্টার উলফ্ বলেন : "প্রত্যেকদিন নিউ ইয়র্কে ২ লক্ষ ছেলেমেয়ে ইস্কুল পালায়। মোটামুটি ৮০ হাজার কিশোরকিশোরী নিয়মিত ফাঁকি দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই এন্‌জেল্‌ডাস্টের শিকার।"

নেশাভাঙের ব্যাপারে নিউইয়র্কের বেশ নাম। তবে রাজধানী ওয়াশিংটনও পেছনে প'ড়ে নেই। পি.সি.পি. এ-শহরে ভালই চলে। ডেট্রয়েট, শিকাগো, লস এন্‌জেলেস আর সানফ্রানসিসকোতেও-এ-ড্রাগের যথেষ্ট সমাদর। আদিতে পি.সি.পি বটিকার আকারে পাওয়া যেত। সেই ষাটের দশকে। তখন ছিল এল. এস. ডির রমরমা। সেও বড়ির আকারে। দেহ্যন্তরের আগে হাক্‌স্‌লি যা চেয়েছিলেন ও পেয়েছিলেন। অধুনা পি.সি.পি নিয়েছে 'জয়েন্টের' রূপ। অর্থাৎ তা এখন ফোঁকা যায়। মারিহুয়ানায় অভ্যস্ত লক্ষ লক্ষ মার্কিন নাগরিকের রুচির সঙ্গে সন্ধি করেছে এন্‌জেলডাস্ট। আর পাঁচটা জিনিসের মতো মাদকদ্রব্যও এ-দেশে ভোগ্যপণ্য। তাই তাকে চলতি হাওয়ার পন্থী হ'তে হয়। ভোক্তার চাহিদার সঙ্গে হাত মেলাতে হয়।

মেস্‌কালিন খেলে কি হয় না হয় হাক্‌স্‌লি তা চোস্ত বিজ্ঞানীর ভাষায় লিখে গেছেন। এন্‌জেল্‌ডাস্টের কপালে এখনও কোনও হাক্‌স্‌লি জোটেনি। তাই তার গুণাগুণ সম্পর্কে অমন সুন্দর ক'রে কেউই কিছু বলতে পারছে না। সোজাসাপটা ভাষায় বিশেষজ্ঞরা শুধু এটুকু বলছেন যে এন্‌জেল্‌ডাস্ট বা পি.সি.পিসেবী কিছুক্ষণের জন্য অন্তত মনোবিকলনের শিকার হ'তে পারেন। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে হাক্‌স্‌লির অভিজ্ঞতার একটা মিল আছে বোধহয়। "দ্য ডোর্‌স্ অফ পার্‌সেপ্‌শনের" এক জায়গায় লেখা রয়েছে :

So you think you know where madness lies? My answer was a convinced and heartfelt yes. "And you couldn't control it? No I couldn't control it. If one began with fear and hate as the major premises one would have to go on to the conclusion."

অর্থাৎ মেস্‌কালিন বা ঐ ধরনের কোনও মাদক দ্রব্য সেবনের আগে যদি মনের মধ্যে ভয় বা ঘৃণা বাসা বেঁধে থাকে তো নিস্তার নেই।

হাক্‌স্‌লি এই বইটির দু'জায়গায় দুটো পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। এক জায়গায় তিনি বলছেন বেশির ভাগ মানুষ যে-জীবন কাটায় তা এত যন্ত্রণাদায়ক ও একঘেয়ে, এত দীন ও সীমিত যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে হ'লেও বাস্তবের নাগপাশ থেকে পালানোর ইচ্ছে চিরকালই তার আত্মার এক অন্যতম ক্ষুধা—বেশিরভাগ

মানুষ, সাধারণ মানুষ, বলা বাহুল্য, কোনও সুখকর, প্রীতিকর অভিজ্ঞতা ছেড়ে পালাতে চায় না। ভয় পেলে তবেই সে পালায়। আঘাত পেলে, যন্ত্রণা পেলে তবেই পালাতে চায় মানুষ। এই ভীত, সন্ত্রস্ত, যন্ত্রণাপীড়িত মানুষের শুকনো ইন্দ্রিয়গুলোকে অধরা অভিজ্ঞতার তরঙ্গে সাময়িকভাবে সজীব ক'রে তুলতেই হাক্স্‌লি মেস্‌কালিনের মতো কোনও ড্রাগ নেবার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সাবধান ক'রে দিচ্ছেন যে ড্রাগসেবীর মনে যদি ভয় বা ঘৃণা আগে থেকেই জমা হয়ে থাকে তো মনোবিকারই হবে পরিণতি। হাক্স্‌লির এই দুই বক্তব্যের মধ্যে সাযুজ্যের অভাব লক্ষ করার মতো। ভয়ে, আক্রোশ, ঘৃণায় মানুষ ক্লিষ্ট ব'লেই তো সে পালাতে চাইছে। নিত্যজীবনে ঐ তিনটি ব্যাপার তার সহচর। ড্রাগসেবনের আগে সে কোন জাদুবলে এই সহচরদের মর্ত্যে বসিয়ে রেখে নিজে আচমকা অমর্ত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে সেটা হাক্স্‌লি ব'লে যাননি। প্রফেটদের একটা সুবিধে আছে। তাঁরা নির্দেশ বা জ্ঞান দিয়েই খালাস। অবচেতনেরও যে একটা প্রগাঢ় ভূমিকা আছে সেটাও বোধহয় তাৎক্ষণিক স্মরণে আসেনি হাক্স্‌লির। তথাকথিত সভ্যদুনিয়ায় প্রাত্যহিকতার, অভ্যেসের রেজিমেন্‌টেশনে ভয়, আক্রোশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মানুষের অবচেতনেই শিবির গাড়ে, দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলে। চেতনাকে সাময়িকভাবে হ'লেও চৈতন্যে পরিণত করতে গেলে আগে ঐ নিভৃত দুর্গ জয় করা দরকার। আধুনিক পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, বেচারা মানুষ কায়ক্লেশে ভাতকাপড়ের সংস্থান করতেই বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধরত। অবচেতনের শত্রুশিবিরগুলো জয় ক'রে নিতে গেলে তাকে নতুন একটা ফ্রন্ট খুলতে হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার খোলামেলা আলো-হাওয়ায় নেশার ঘোরে হাক্স্‌লির বোধহয় এসব খেয়াল ছিল না।

"দ্য ডোরস্ অফ পার্‌সেপ্‌শন" বেরোয় ১৯৫৪ সালে। তারপর মোটামুটি ২৮ বছর কেটে গেছে। এই ২৮ বছরে বেশিরভাগ মানুষের জীবনে ভয়, আক্রোশ, ঘৃণা, একঘেয়েমি ও দীনতার গ্লানি ক্রমান্বয়ে বেড়েছে বই কমেনি। ফলে ঐ গ্লানির কবল থেকে পালানোর ইচ্ছেও আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। সেই তীব্রতার প্রকাশ ঘটছে একদিকে বিনোদন ইনডাস্‌ট্রির দিগ্‌বিজয়ী রমরমায়—যেখানে সাধারণ মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে চলেছে ধনতন্ত্রের পাটোয়ারচক্র। আর অন্যদিকে তার প্রকাশ ঘটছে পানাসক্তি ও ড্রাগাসক্তির মতো বিভিন্ন আত্মঘাতী প্রবণতার বাড়াবাড়িতে। যে সমাজে ব'সে অলডাস হাক্স্‌লি পঞ্চাশের দশকে ড্রাগের অমর্ত্যলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই মার্কিন সমাজে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন মাদকদ্রব্যে প্রায় পাকাপাকি আসক্ত। এদের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে কিশোরকিশোরীরা। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে সমাজের কেষ্টবিষ্টুদের। ভয়, আক্রোশ, ঘৃণার মতো বৃত্তিগুলো পরিহার ক'রে প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি থেকে ড্রাগ-সাধনের পথ বেয়ে অতিন্দ্রীয় আলোকমার্গে উত্তরণের প্ররোচনা দিয়েছিলেন হাক্স্‌লি পঞ্চাশের দশকে। আজ, আশির দশকে সেই বৃত্তিগুলোই সমাজ ও পরিবেশের কারণে

আমেরিকার নাগরিকদের মনে কি হারে বর্তমান তার একটা মোটামুটি খতিয়ান নিলে ড্রাগসেবনের মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব দুটোর ওপরেই কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

মার্কিন সমাজে সাধারণ মানুষ আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, ভয়, আশংকার শেকড় তার অনেক নীচে সেঁধিয়ে রয়েছে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সেখানে সাতপুরুষের বটগাছের মতো। শত ঝড়েও তা টাল খায় না। বেচারা মানুষ আজ সেই মহীরুহের শরণার্থী। ভয় সর্বত্র। ঘরে এবং বাইরে। প্রাত্যহিক জীবনে চাকরি যাবার ভয়, বা চাকরিতে উন্নতি না হবার ভয় অথবা চাকরি না-পাবার ভয়। সংসারে ভয়। হাইরাইজ বিলডিং-এ, অ্যাপার্টমেন্ট কম্প্লেক্সে পাশের ফ্ল্যাটের লোকটাকে ভয় বা সন্দেহ। কারণ সেও আমাকে চেনে না, আমিও তাকে চিনি না। মৌখিক "সুপ্রভাত" বা "শুভরাত্রি" অথবা অনেক সময়ে তাও নয়, নিছক আধা-নৈর্ব্যক্তিক "হাই" বা নেহাতই মেকি, দায়সারা দেড় ইঞ্চি হাসি যা প্রায় ভেংচি কাটার সামিল-এর বাইরে আমরা কেউই কোনও কথা বলি না। বলার সময় নেই। দু'জনেই ছুটছি। না ছুটলে জীবনের গাড়ি ফেল করব যে। "পৃথিবীর গাড়িটা থামাও, আমি নেমে যাবো" বলার সাহস তারও নেই, আমারও নেই। সন্ধে সাতটা আটটার পর (নটা দশটার পরে তো কথাই নেই) বড় বড় মার্কিনি মেট্রোপলিসে অনেক পথে একলা না-চলাই মঙ্গল। হিতাকাঙ্ক্ষীরা সাবধান ক'রে দেন। রবীন্দ্রনাথ একবার স্বদেশ সম্পর্কে দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন—এ দেশে পথিক নেই তাই পথ খনন ক'রেও লাভ নেই। মার্কিনি মহানগরে (মায় রাজধানী ওয়াশিংটনেও) অনেক মহল্লায় সন্ধের পর শুধু প্রশস্ত রাজপথ থাকে, পথিক থাকে না। ছিনতাইয়ের ভয়। যাকে বলে "মাগিং"। খুন হবার ভয়। ধর্ষণের ভয়। বন্দুক এদেশে বড়ই সুলভ। "গানকন্ট্রোল" আজও হল না। রাতের বেলা একা একা বাড়ি ফেরেন যেসব মহিলা তাঁদের অনেকেরই হাতব্যাগে থাকে একধরনের বিষাক্ত গ্যাসের কৌটো। আততায়ীর মুখের সামনে ফ্যাঁস ক'রে টিপে দিলে সে চোখে সর্ষে ফুল দেখবে। ইদানীং পকেট-সাইরেনও বেরিয়েছে বাজারে। বিপাকে পড়লে তার বোতাম টিপে দিলেই বিটকেল শব্দ হবে। তাতে আততায়ীর পিলে কিঞ্চিৎ চমকে গেলেও সেই ইলেকট্রনিক শব্দকে এস-ও-এস ভেবে ক'জন আর্তত্রাণে উদ্যোগী হবেন তা অনিশ্চিত। কারণ, লোকের আছে ইনভল্‌মেন্টের ভয়। বেমক্কা ফেঁসে যাবার ভয়।

মার্কিন সমাজে "মাগিং" "হোল্ড্-আপ" বলাৎকার বা কোনও খুন-পাগলা মানুষের আক্রমণ-এগুলো হল বাইরের ভয়। সেল্‌স্‌ম্যান বা মিস্তিরি সেজে, সুযোগ বুঝে গেরস্থের দরজায় কড়া নেড়ে অথবা কোনও ভেক না ধ'রেই স্রেফ বোম্‌বেটের মতো দরজা ভেঙে যে আসে, সেও বহিরাগত। এটাও মূলত বাইরের ভয়। কিন্তু এ-সমাজের মেট্রোপলিটান জীবনে আর এক ধরনের ভয়ও অনেক মানুষের নিত্যসহচর। সে ভয় ভেতরের, পকেটের বা হাত ব্যাগের টাকা পয়সা আততায়ীর

হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবার ছুরি বা গুলির ঘায়ে অথবা কোনও বেহুঁশ ড্রাইভারের গাড়ির ঘায়ে প্রাণ হারাবার ভয় এ নয়, এ-ভয় অনেকেরই অস্তিত্বে কোনও অদৃশ্য চোরা কুঠুরিতে ঘাপটি মেরে বসে আছে। একাকিত্বের ভয়। অনেক মানুষই এ-সমাজে বড়ো একা। এত একা যে কারও সঙ্গে প্রাণের মনের দুটো কথা ব'লে বুকের বোঝা কিছুটা নামানোর সুযোগও অনেকের জোটে না। সামাজিক সম্পর্ক আছে বটে, তবে সেটা বহুলাংশেই কাজের সম্পর্ক। কাজ ফুরোলেই সেই সম্পর্কের ওপর যবনিকা পড়ে। বন্ধু, সত্যিকার বন্ধু সর্বদেশে, সর্বকালে দুর্লভ। কিন্তু নিত্য জীবনের কিছু সহযাত্রী না পেলে মানুষের চলে কি করে। চাকরি করার বয়েস হ'লেই ছেলে মেয়েরা বাপ মায়ের ডেরা ছেড়ে হয় স্বেচ্ছায় চ'লে যায় আর নয়তো চ'লে যেতে বাধ্য হয়। বাবা মায়ের সংসারে ভাঙনও হরবখত ঘটে চলেছে। যৌবন তার ধারালো শাবল আর গাঁইতি দিয়ে পথ করে নেয় দেহমনের জোরে। সে উতরোল কেটে গেলে ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে আর কংক্রিটের জঙ্গলে পথ কাটা যায় না। মানুষ লাভ করে স্থবিরত্ব ধীরে ধীরে। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে জরা ব্যাধির ঠ্যালায় আর আত্মিক ক্লান্তির ধকলে মানুষ হয়ে পড়ে গতিহীন। তাকে আর কেউ পোছে না। ফেল কড়ি-মাখো-তেলের জমানায় কড়ি ফুরোলে তেল জুটবে কোথ্থেকে? জোটে শুধু অবসাদ আর একাকিত্ব। আজীবন প্রতিযোগিতা দ্রুতি আর জঙ্গমে অভ্যস্ত কোনও বৃদ্ধ তাই কাঁপাকাঁপা হাতে বাজারের থলি নিয়ে বাস থেকে নামতে সামান্য দেরি ক'রে ফেলে অপরাধ আর কুণ্ঠা মেশানো কণ্ঠে বাসচালকের কাছে মার্জনা চান : "সারি দ্যাট আই অ্যাম সো স্লো"। নিত্যজীবনের গাড়ি কংক্রিটের মহাসড়ক বেয়ে পাগলের মতো ছুটে চলেছে। যাদের হক্ক আছে, জোর আছে তারা দৌড়োও। যাদের তা নেই, তারা সড়কের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। তোমাদের জন্য এমনিতে কারও সময় নেই। অমনিতে আছে। অনেক দিনের জ'মে থাকা অনেক কথা যদি কণ্ঠ নালির কাছে এসে আকুলিবিকুলি করে, হাইরাইজ-ডেরায় বা পথে বা পানশালায় যদি সে-কথার ঝাঁপি কারও কাছে উজাড় করতে না পারো (কার অত সময় আছে বলুন তো?) তো ভেঙে প'ড়ো না। নিজের টেলিফোন যদি না থাকে তো ১৫ সেন্ট খরচ ক'রে পাবলিক টেলিফোনে একটি বিশেষ নম্বর ডায়াল কর। ওপারে এক অদৃশ্য শ্রোতা (বোধহয় মাইনে করা অথবা কোনও স্বেচ্ছাসেবী) টেলিফোনে তোমার মনের কথা শুনে যাবেন। তাঁকে তুমি দেখতে পাবে না কোনওদিন। কিন্তু তাঁর সান্ত্বনা, তাঁর পেশাদার আশ্বাসের বাণী তো পৌঁছোবে তোমার কানে। তাই বা কম কি? পথের ধারে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে তাঁর হদিশ। একটা টেলিফোন নম্বর, হটলাইন অর্থাৎ সদাজাগ্রত। ফুরসৎ পেলে টুকে রেখো নম্বরটা। কখনও কাজে লাগতে পারে। আর হ্যাঁ, পনেরোটা পয়সা কাছে রেখো। পাবলিক টেলিফোন থেকে যদি ঐ অধরা বন্ধুর কানে কানে সুখদুঃখের কথা বলতে চাও তো ঐ সামান্য মূল্যটুকু ধ'রে দিতে হবে। আপত্তি নেই তো?—

সবপেয়েছির দেশে মানুষের বুকের খুব কাছে ব'সে রয়েছে আধুনিক মেট্রোপলিটান জীবনের নিভৃত্ব, অতন্দ্র প্রহরী-একাকিত্ব, একাকিত্বের ভয়।

ইদানিং রেগানোমিক্সের ঠ্যালায় মার্কিন অর্থনীতি সোনার পাহাড় থেকে লাউ-গড়গড় গড়াতে শুরু করেছে। তলায় খাপ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা-মন্দার অন্ধকার। চারদিকে ছাঁটাই। সরকারি, বেসরকারি সব জায়গাতেই ছাঁটাই। বেকারত্বের হার হালে শতকরা দশভাগ পেরিয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, ভয়। একদিকে চাকরি যাচ্ছে। অন্যদিকে চাকরি নেই। মাইত্রেশবায়োলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে পরিচিতা এক আমেরিকান মহিলা কাজ করছেন দুয়ারবালার। মস্ত এক বসতবাড়িতে তিনি আটদশ ঘণ্টা হাসিহাসি মুখে সে বাড়ির বাসিন্দা ও তাঁদের অতিথিদের স্বাগত ও বিদায় জানান, প্রত্যেকের চিঠিপত্র বেছে রাখেন। শিক্ষা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না দু'বছর যাবৎ। ভয়। নিউ ইয়র্কের "প্যান্থেয়ন বুক্স্" ১৯৮১ সালে রবার্ট লেকাচ্ম্যানের লেখা আর বোরিন ভ্যান লুনের ছবি-আঁকা ভারী মজার অথচ তথ্যগর্ভ একটি বই ছাপান : "ক্যাপিটালিজ্ম্ ফর বিগিনার্স"। তাতে "অপারচুনিটি" শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক বলছেন :

...Freedom to enrich oneself marches in step with freedom to go broke. The same caveat applies to capitalist freedom to choose vocations. Feel free to study art history, medieval Latin or classical Greek. Just don't be astounded or resentful that your agemates who cannily opted for business administration, econometries and computer science drive better cars live in bigger houses and mix their drinks with better brands of liquor-for the next forty years.

জীব বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় এম-এস-সি পাশ দুয়ার বালা তাঁর অধিগত বিদ্যার যুগোপযোগিতা সত্ত্বেও সময়োপযোগী হাসির জন্য পয়সা পাচ্ছেন, মনমত চাকরি পাচ্ছেন না। আক্রোশ। আরও মধুর হাসতে পারেন এমন কেউ প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ালে এই হাসির চাকরিটাও তিনি খোয়াবেন হয় তো—তাই ভয়।

এত দুশ্চিন্তা আর পারফর্মেন্সের ঘোড়দৌড়ের কল্যাণে এ-দেশে লোকের হাঁফ ধরে যত মাথা ধরে তার চেয়ে বেশি। নিয়মিত। লোকে তাই মুড়িমুড়কির মতো মাথাধরার ওষুধ খায়। ব্যথা মারার যে ওষুধ মার্কিন মুলুকে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তার নাম "টাইলেনল"। হালে এই টাইলেনলেরই ক্যাপসুল খেয়ে বিভিন্ন জায়গায় জনা সাতেক লোক বেবাক মারা পড়লেন। ময়না তদন্তে জানা গেল ক্যাপসুলের ভেতর সায়ানাইড মেশান ছিল। ঐ বিষ-মেশান ওষুধই দোকানে বিক্রি হয়েছে। ফলে এখন ওষুধে ভয়।

ভয় আর আক্রোশের শেকড় মার্কিনি সমাজের এত গভীরে ঢুকে পড়েছে যে সাধারণ মানুষ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে তার প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম আর হাজার সমস্যার জ্বালা অন্তত খানিকক্ষণের জন্য ভুলতে যে বিনোদনের শরণ নেয়, এমন

কি সেই বিনোদনেরও অনেকটা জুড়ে এখন ভয় আর আক্রোশের রাজ্য। আর্নল্ড্ হাউজার "দ্য সোসিয়োলজি অফ আর্ট" গ্রন্থে বিনোদনশিল্পের মূল চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন :

Popular art wants to soothe distract us from the painful problems of existence and instead of inspiring us to activity and exertion, criticism and self examination moves us on the contrary to passivity and self-satisfaction.

হাউজার সাহেব পপুলার আর্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা মার্কিনি বিনোদন জগতে অধুনার ধোপে আর টিকতে চাইছে না। "হরর মুভি" আর মারদাঙ্গা থ্রিলারের পৌনঃপুনিকতা, গগনবিদারী অ্যাসিড রক্ আর "পাংক্ রক্" সংগীতের ঢক্কানিনাদ দিনগত পাপক্ষয়ের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়ে কিছুক্ষণের আত্মবিস্মৃতি ও মনোহর মাদকতার পথ কতটা সুগম করতে পারে সন্দেহ। পপুলার ছবি মানে এখন শতকরা ৭৫ ভাগ ভয়ের ছবি। সিনেমা ও টিভির পর্দায় বিভীষিকা আর বিবমিষার রসায়নে দর্শকের মনে যে বীভৎস ও ভয়ংকর ভাবের উদয় হয় সেটা "প্যাসিভিটি" ও "সেল্ফস্যাটিসফ্যাক্শনের" পরিপন্থী। বরং "অ্যাক্টিভিটিতেই" উদ্বুদ্ধ করছে ঐসব ছবি। আত্মতুষ্টির উদয় হচ্ছে ভীতিকর কাজে ও অহেতুক হিংস্রতায় সামিল হবার পর। তার আগে নয়। মনে রাখা দরকার যুক্তরাষ্ট্রে তরলমতি নাবালকদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা এখন সাবালক অপরাধীদের লজ্জা দিতে পারে। কচিকাঁচাদের জন্য আমেরিকার সমাজ যে বিনোদনের আয়োজন করেছে, আক্রোশ আর ভয় তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অতি-আধুনিক রক্ শুনলেই তা মালুম হ'তে পারে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর-এই তিনটি দশক পেরিয়ে আশির দশকে রক্ যে রূপ নিয়েছে, "বিকট" ছাড়া অন্য কোনও বিশেষণ তার অধিকাংশ নজিরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা ভাবা মুশকিল। "রক্ অ্যান্ড রোল" চিরকালই শোরগোলের ব্যাপার। এবং "রক্" মানেই যে বদরুচির পরাকাষ্ঠ তাও নয়। আধুনিক সংগীতে অনেক নতুন নতুন সুরেলা দিগন্ত খুলে দিয়েছে "রক্"। কিন্তু ইদানীং রক্-সংগীত থেকে "সংগীত" ক্রমশ উধাও। বিয়োগফল হিসেবে বাকি রয়েছে শোরগোলের চাপল্য নয় আর্তনাদ, হুহংকার, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে বিকট শব্দ আর শব্দ আর শব্দ। কোনও কোনও রক-রেকর্ডের মোড়কে নির্দেশ লেখা থাকে : এ-রেকর্ড যত জোরে পার বাজাও। টেলিভিশনের এক বিজ্ঞাপনে এক রেকর্ডবিক্রেতা কতকটা যুদ্ধ-ঘোষণা ও কতকটা হেঁচকি-তোলার মতো ক'রে বলে চ'লেছেন যে তাঁর দোকানে রেকর্ড সবচেয়ে সস্তা। এই ঘোষণার তালেতালে ছবিতে দেখানো হচ্ছে এক অদৃশ্য হাত একটা হাতুড়ি দিয়ে প্রথমে একটা রেকর্ড ও তারপর একটা গ্রামোফোন ভাঙছে। পাগলের মতো। থামছে না কিছুতেই। এই ভাঙনের যুক্তি খুঁজতে খুঁজতে বহু মাথা ঘামিয়ে শেষে মনে হ'তে পারে যে এর আগে হয়ত কোনো একটা দোকান খুব কম দামে গ্রামোফোন রেকর্ড বেচে একটা বিশ্বরেকর্ড-গোছের ক'রেছিল। এবারে এই বিজ্ঞাপনদাতা তার চেয়েও কম

দামে রেকর্ড বেচে সেই "রেকর্ড" ভেঙে দিয়েছেন। ঐ ভাঙার বার্তা পৌঁছে দিতেই হয়তো হাতুড়ি দিয়ে সত্যিকার একটা রেকর্ড ভাঙার প্রয়াস। ব্যাখ্যাটা খুবই স্থূল। ঘটনাটা স্থূলতর। এই অবধি না হয় হল। কিন্তু রেকর্ড-ভাঙতে গ্রামোফোন ভাঙা কেন? এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ভার। আসলে এর কোনও উত্তরই হয়ত নেই। কোনও কারণ ছাড়াই যে একটা কাজের জিনিস ভেঙে ফেলা যায় এটাই হল ঐ বিজ্ঞাপনের বক্তব্য। মার্কিনি টেলিভিশন অন্তত এক মিনিট ধ'রে এই অকারণ আক্রোশ ও হিংস্রতার ছবি বিজ্ঞাপনের আকারে প্রচার ক'রে চ'লেছে।

আধুনিক জীবন এমনিতেই অনিশ্চয়তায় ভরা। অধুনা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিখিল বিলোপের ভয়। নানান চাপা আক্রোশ আর আতঙ্কের বোঝা যে সমাজের ওপর, সে-সমাজে আজ অনেকের মনে একটা বড়ো প্রশ্ন : কার হাত ফস্কে কখন আণবিক মারণাস্ত্র ছুটে যায় কে জানে? এ-প্রশ্ন যে আতঙ্কের জন্ম দেয় সেটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখা রক্তচোষা যন্ত্রদানব অথবা অকারণ ভাঙাভাঙির আতঙ্কের চেয়েও তীব্র। আমেরিকার খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও লেখক লুইস টমাস "ডিস্‌কাভার"পত্রিকার নভেম্বর-সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন তাঁর বয়েস যখন ১৬ কি ১৭ বছর, তখন তিনি মালারের নবম সিম্‌ফনিটি আবিষ্কার করেন। সেই অল্প বয়েসেই তাঁর মনে হয়েছিল যে এই সিমফ্‌নির শেষ মুভমেন্‌টে যেন অমোঘ মৃত্যুর স্বীকৃতি আর মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাকে মেনে নেওয়ার প্রশান্তি পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তারপর :

...."Now I hear it differently, I cannot listen to the last movement of the Mahler Ninth without the door smashing intrusion of a huge new thought : death everywhere, the dying of everything, the end of humanity. The easy sadness expressed with such gentleness and delicacy by that repeated phrase on faded strings, over and over again no longer comes to me as old, familiar news of the cycle of living and dying. All through the last notes my mind swarms with images of a world in which thermonuclear bombs have begun to explode in New York and San Francisco, in Moscow and Leningrad, in Paris...How do the young stand it? How can they keep their sanity? if I were very young 16 or 17 years old. I think I would begin perhaps very slowly and imperceptibly to go crazy."

লুইস টমাসের সংবেদী মনে যে ভয় আজ এত প্রকট সে-ভয়ের ছাপ আমেরিকার আপামর জনগণের চোখে মুখে এখনও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চেতনার অলক্ষ্যে, মনের নিভৃতে কি এ-ভয় সিঁধ কাটছে না? ছেলেমানুষ যারা তারা আজ এই আতঙ্ক সামলাচ্ছে কি ক'রে? প্রশ্ন করেছেন লুইস টমাস। নিউ ইয়র্কের একটা বাড়ির ওপরতলা থেকে যে-কিশোর "শান্তিবটিকা" খেয়ে নিশ্চিন্তে লাফ দিল, তার মৃত্যুর মধ্যে গুটিশুটি মেরে ব'সে আছে ঐ প্রশ্নের একটা উত্তর। কিছুটা উত্তর রেডিয়ো

বা রেকর্ডে বা ক্যাসেট-নিঃসৃত ইলেকট্রনিক গিটার আর ড্রামের প্লাবনে, মাথার দুপাশে দুই শিরার দপ্‌দপানিতে তালে তালে বেজে চলেছে। সেই রক্‌-নিনাদের যজ্ঞে একপাশে সাজানো মারিহুয়ানার উপাচার।

বিজ্ঞানপত্রিকা "ডিস্‌কাভার"-এর অগাস্ট-সংখ্যায় ছাপা হয়েছে মারিহুয়ানার দোষগুণের খতিয়ান। নিবন্ধের শুরুতেই রয়েছে ব্রহ্ম বাক্য : "ইট ইজ অ্যাজ কমনপ্লেস অ্যাজ আ পিচার অফ বিয়ার।" বলা হয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ আমেরিকান নিয়মিত মারিহুয়ানা সেবন ক'রে থাকেন। নিউ ইয়র্কের নগরপাল এডওয়ার্ড কচ্‌ নিজেই নাকি এক সময়ে এতে আসক্ত ছিলেন। নিবন্ধকার বারবার বলছেন হালফিল গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মারিহুয়ানায় নতুন নতুন বিপদ লুকোনো তবু ভবিষ্যতে তা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আজ তরলমতি ছেলেমেয়ে থেকে শুরু ক'রে মহাগুণধর একজেকিউটিভ পর্যন্ত সকলে যেভাবে মারিহুয়ানা ফুঁকে চলেছেন, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মারিহুয়ানা "ওষুধ" হিসাবে সেভাবে খেতে বলবেন না কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার। তখন নিশ্চয়ই মারিহুয়ানার ভেতর থেকে এক বা একাধিক কল্যাণকর উপাদান বের ক'রে নিয়ে তা থেকে ওষুধ তৈরি হবে। অর্থাৎ সোজা কথায় "মারিহুয়ানা" বলতে লোকে যা বোঝে, সেটা নিশ্চয়ই ওষুধ হিসেবে বিক্রি হবে না। তার মধ্যে থেকে ওষুধ বানানো হবে। এবং সিগারেট-পোরা মারিহুয়ানা আর মারিহুয়ানা থেকে যে বেদনাহারা ওষুধ তৈরি হবে-দুটো নিশ্চয়ই এক নয়। নিবন্ধকার কিন্তু তাঁর "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি" সত্ত্বেও এই গুরুতর পার্থক্যের ওপর তেমন জোর দেননি। পত্রিকার প্রচ্ছদে যে ছবি ছাপা হয়েছে তা দেখে সন্দেহ হয় যে মারিহুয়ানার ক্ষতিকর দিকটার ওপর গুরুত্ব দেবার ইচ্ছে বোধহয় প্রকাশকের ততটা নেই। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক সুশ্রী মেয়ের মুখ। মূল প্রচ্ছদটি রঙিন। ঘন প্রসাধনে আরক্ত মেয়েটির মুখ। প্রায়-নিমীলিত চোখে পরিপাটি ম্যাসকারার ছোঁয়া। ঠোঁটদুটি যথারীতি উজ্জ্বল লাল। আঙুলের নখেও রক্তিমা। মুখের পিছনে আকাশ-রঙের জমি। সেই গাঢ় নীলের বুক বেয়ে অলসভাবে উঠে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে হাল্‌কা নীল আর সাদার আভাসে ভাসাভাসা ধোঁয়ার রেখা। ধোঁয়াটা বেরিয়ে আসছে মেয়েটার মোহন আঙুলে সন্তর্পণে ধরা, হাতে-পাকানো একটা সিগারেট থেকে। তাতে রয়েছে অদৃশ্য মারিহুয়ানা। গোটা ছবিটায় ক্ষতির ইঙ্গিত কোথাও নেই। আছে আরামের, সুখের আভাস। পণ্যভোগী সমাজে বিজ্ঞাপনের জেল্লায় পণ্যের চটক অবধারিতভাবেই মিলে যায় নারীর রূপের বাহারের সঙ্গে। এ-সমাজে নারীও যে পণ্য। প্রচ্ছদটা যেন বলতে চাইছে : দ্যাখো দ্যাখো কি সুন্দর। "মারিহুয়ানা : ব্যাড নিউজ অ্যান্‌ড্‌ গুড।" গুড্‌ নিউজ বলার দরকার নেই। নিউজ এখানে উহ্য থাকাই ভাল। দুবার পর পর নিউজ বললে স্টাইলের দিক দিয়ে সেটা খারাপ হবে। নিউজ তাই দ্বিতীয়বারে অদৃশ্য থাক। ক্যাপশানটা যুৎসই হোক। ওপরে "ব্যাড নিউজ"। ঠিক তার তলায় মিতকথনের ভঙ্গিতে "অ্যান্‌ড্‌ গুড"। শৈলীর খাতিরে "গুড"

কথাটা একলা ব'সে গোটা ছবিটাকেই যেন জারিয়ে তুলেছে তার "গুডনেসে"। "ইট্‌স্ কোক, ইট্‌স্ গুড"। প্রচ্ছদের রং আর বিষয়বস্তুর সঙ্গে "ব্যাড নিউজের চেয়ে "গুডের" সম্পর্কই যেন বেশি ঘনিষ্ঠ। কে বলে মারিহুয়ানা খারাপ? এই তো দ্যাখোনা, ঐ সুন্দর মেয়েটি কেমন মারিহুয়ানার আবেশে বিভোর।—এ সমাজে যত ভয়, যত হতাশা, যত আক্রোশ মানুষের মগজের ভেতর দেখা-নাদেখায় মিশে লালিত হচ্ছে, সব মিলিয়ে যাবে মারিহুয়ানার সুখটানে।

মারিহুয়ানার আস্থা ছিল না হাক্‌স্‌লির। কোকেনেও না। তিনি বলেছিলেন :

"What is needed is a new drug which will relive and console our suffering species without doing more harm in long the run that it does in the short. Such a drug must be potent in minute doses and synthesizable." (The Doors of Preception)

আজ হাক্‌স্‌লি বেঁচে নেই। যদি থাকতেন তো "পিসিপি" বা "এন্‌জেল্‌ডাস্টে"র গুণপনা দেখে তাঁর ভাল লাগত নিশ্চয়ই। এই হল তাঁর ঈপ্সিত "নিউ ড্রাগ" কারণ তার কাঙ্ক্ষিত ড্রাগের প্রায় সবকটা শর্তই পিসিপি আজ পূরণ করতে পারে। আখেরে তা বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ এই যন্ত্রণাপীড়িত মানবজাতির সব বেদনা তো আখেরে হাজার হিরোসিমার আণবিক আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা। এস,এস,টোয়েন্‌টি, এম-এক্‌স্ ক্ষেপণাস্ত্রসমেত যাবতীয় মারণাস্ত্রের সম্ভারে সাজানো আজকের দুনিয়ার ওটাই তো আমাদের আখের। কিছুক্ষণের বিস্মৃতি ও মত্ততা জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা এ-ড্রাগের অবশ্যই আছে। এ-রসে মজার জন্য চড়া ডোজ দরকার নেই। একটুতেই বিশ্বরূপ দেখা যায়। আর হ্যাঁ, 'এন্‌জেলডাস্ট' স্রেফ রাসায়নিকভাবেই তৈরি করা যায়। সাতটি কেমিকেল লাগে। তার একটা হল পটাসিয়াম সায়ানাইড।

## উপসংহার

যে বছর হাক্‌স্‌লির "দ্য ডোর্‌স্ অফ পারসেপ্‌শন" প্রকাশিত হয় ঠিক তার পরের বছর বেরোয় এরিখ্ ফ্রমের লেখা "দ্য সেন সোসায়টি" (The Sane Society)। তার "মেন্‌টাল হেল্‌থ্ অ্যান্‌ড্ সোসাইটি" অধ্যায়ে ফ্রম লিখেছিলেন :

"মানুষের মানসিক চাহিদাগুলো মেটানো, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে, বেজায় সহজ। এখানে সমস্যাটা হল সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। মানুষের মানবিক চাহিদার নিবৃত্তি দারুণ জটিল। অনেক কিছুর ওপর তা নির্ভর করে। বিশেষ ক'রে তার সমাজ কীভাবে সংগঠিত এবং সেই সংগঠন ঐ সমাজের মানবিক সম্পর্কগুলোকে কীভাবে নিরূপণ করছে তার ওপর।"

# এক ঝলক রোদ্দুর একটা পোস্টার

* * *
*Since becomes why :*
*old turns to young*
*(winter goodbye)*
*april hello.*

*e.e. Cummings*

ওয়াশিংটন ডিসি-র শ্বেতভবনে যে নায়ক চূড়ামণির বাস, কামিংসের পদ্য পড়ার অভ্যেস তাঁর আছে কিনা জানি না। কবিতার মতো এমন অকাজের ব্যাপারে তাঁর মত কেজো লোকের রুচি হবে এটা ভাবতেও কেমন লাগে। তাঁর কত কাজ! এই যেমন, রকেফেলার হবার হাজার সুযোগে ভরা তাঁর সুখী স্বাধীন দেশে যাঁরা নানা কারণে সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়েছেন তাঁদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ টাকার অঙ্ক কমিয়ে দেওয়া। তারপর ধরুন, ধনকুবের আর শ্রেষ্ঠীদের মসৃণ ঘাড় থেকে আয়করের বোঝা কমানো। তিনি যে শুধু কমাতেও জানেন তাই নয়, বাড়াতেও। এই যেমন বর্ণবৈষম্য। শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে মেয়েরা যাতে একই স্কুলে পড়তে পারে, ছেলেবেলা থেকে মিলেজুলে লেখাপড়া করে, খেলাধুলো করে, বন্ধুত্ব পাতিয়ে বিভেদের গড়খাইগুলো আপনা থেকেই বুজিয়ে দিতে পারে এজন্যই ইস্কুলের ছেলে মেয়েদের বাসে করে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় নিয়ে যাবার, মানে দূরের ইস্কুলে

পৌঁছে দেবার একটা রেওয়াজ মার্কিন মুলুকে চালু ছিল। এ দেশে অনেক পাড়াই মোটামুটি বর্ণভিত্তিক। অর্থাৎ এক একটা এলাকায় শ্বেতাঙ্গরাই সংখ্যাগুরু। কোনও কোনও অঞ্চলে আবার সাদা মানুষ বিলকুল নেই। আবাসনের এই রীতিটা ইদানিং ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে ঠিকই। তবে আবাসিক "বর্ণাশ্রম প্রথা" কহতব্য কোনও মাত্রায় এখনও ঘোচেনি। ফলে শ্বেতাঙ্গদের পাড়ায় যে ইস্কুল, তার অধিকাংশ পড়ুয়া স্বাভাবিকভাবেই শ্বেতাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গদের মহল্লায় যে বিদ্যাপীঠ সবচেয়ে কাছে পড়ে, মহল্লার ছেলেমেয়েরা সেখানে গিয়েই ভর্তি হয়। এইভাবে সামাজিক কারণেই আমেরিকার অনেক ইস্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে বর্ণের দিক দিয়ে একটা অসমতা গজিয়ে উঠেছে। এটা নিকেশ করার জন্যেই এ-পল্লীর ছেলেমেয়েদের দূরের অন্য-কোনও পাড়ার ইস্কুলে বাসে করে পৌঁছে দেবার রীতিটা চালু হয়। আমেরিকায় এই ব্যবস্থাটাকে বলা হয় "বাসিং"। শ্বেতভবনের মহানায়ক এটা তুলে দিতে চান। ফলে বর্ণবৈষম্য আবার বাড়বে। তাই বলছিলাম, শুধু কমাতে নয় বাড়াতেও জানেন তিনি। আমেরিকার সামরিক সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলার স্বপ্নও তিনি অনেককাল দেখেছেন। শেষে আশির নির্বাচনে জেতার পর থেকেই উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি তাঁর স্বপ্ন সফল করে তুলতে। যে-করে-হোক মারণাস্ত্রের সংখ্যা বাড়াও : এই হচ্ছে তাঁর প্রিয় শ্লোগান। শ্বেতভবন থেকে বেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে 'ক্রেমলিন' নামে আর এক সুচারু প্রাসাদে তাঁর যে কাউন্টারপার্টের বাস, এ-শ্লোগান তাঁরও বড়ো প্রিয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কমানো-বাড়ানোর দোলায় দুলতে দুলতে বোধ হয় খেয়ালই করেননি যে টিউলিপ ফুটতে শুরু করেছে তাঁর দেশে। কারও ক্ষমাহাসি বহন না করেও দেখা দিচ্ছে আজেলিয়া। সূর্য একবার উঠলে পাটে বসার কথা তার যেন মনেই পড়তে চায় না। একটানা, ঘ্যানঘ্যানে শীতের পর বেশ জাঁক করে এসেছে বসন্ত। শীতটা ছিল এবার বেজায় বেয়াড়া। কথায় কথায় তুষার বৃষ্টি, কনকনে ঠাণ্ডা। এখন কিন্তু আর বরফের জারিজুরি চলবে না। প্রথম বিশ্বের বিশ্বকর্মারা যতই চান দুনিয়ার বুক থেকে সবুজ উঠে যাক, রঙ মুছে যাক, নতুন যুগ আসুক, প্রকৃতি এক্ষণে অন্তত সে-চাওয়ার মুখে টিউলিপ ছুঁড়ে মারতে প্রস্তুত। বরফ ফুঁড়ে এখন চারা গজানোর সময়। এক-একটা ফুল, এক-একটা চারা, গাছ, এক-এক ঝলক রোদ্দুর আজ এক-একটা পোস্টার। তারই কোনও কোনওটায় কারা যেন মানুষকে ভালবেসে লিখে রেখেছে : "সেভ দ্য হিউম্যান রেস/স্টপ্ দি আর্মস্‌রেস"।

পোস্টারের সংখ্যা বাড়ছে। এই পোস্টার হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান এমন মানুষের সংখ্যাও আজ বাড়ছে আমেরিকায়। ধন্য প্রেসিডেন্ট রেগান। এই বৃদ্ধির জন্যেও কৃতিত্বটা আসলে তাঁরই পাওনা। আর পাওনা তাঁর উপদেষ্টাদের। 'জীবন চলিয়া গেছে তাঁহাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার'। বছর কুড়ি আগে এ-দেশে এক দারুণ বসন্ত এসেছিল। ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল আমেরিকার তরুণ সমাজ। শান্তির আন্দোলনে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গা-জোয়ারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তরুণ-তরুণীরাই ছিলেন প্রথম সারিতে। আজ যাঁরা আণবিক বোমার নির্লজ্জ, কুৎসিত

প্রতিযোগিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দাবিতে পোস্টার হাতে পথে নামছেন, তাঁরা কিন্তু কলেজের র‍্যাডিকাল ছাত্র-ছাত্রী নন। তাঁদের বয়েস হয়েছে। কেউ সাধারণ চাকুরে, কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউবা গৃহিণী। জনসাধারণ বলতে যা বোঝায়, এঁরা তাইই। এঁদেরই মধ্যে অনেকে হয়তো বছর দুয়েক আগে ভোট দিয়ে এককালের এক মধ্যমানের অভিনেতাকে এনেছেন রাষ্ট্রের সবচেয়ে উঁচু আসনে। এঁদেরই মধ্যে আজ অনেকের দাবি : মেগাটনের মাপে নিখিল বিলোপের গ্যারান্টি নয় বাঁচতে দাও, খেতে দাও, কাজ দাও। বোমার রাজ্যে পৃথিবী আজ বড়ো গদ্যময়। কামিংস না-পড়লে আহামরি ক্ষতি নেই, মিস্টার রেগান, কিন্তু বেকারদের সংখ্যা যদি আজকের লাখ দশেক থেকে বেড়ে আসছে কাল লাখ বিশেকে দাঁড়ায় তো ক্ষতিটা মেগাটনে মেপেও কুল পাবেন না।

রিচার্ড নিক্সন নামে আমেরিকার এক কুশলী প্রেসিডেন্ট একদিন রাত্রে আধামত্ত অবস্থায় তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে নাকি ফোন করে বলেছিলেন : "হেনরি, উই হ্যাভ গট্ টু নিউক দেম্"। এটা নিউ ইয়র্কের এক পত্রিকার খবর। এই "দেম" টা কারা? ভিয়েৎনামীরা অবশ্যই। তাঁর উত্তরসূরী জেরাল্ড ফোর্ড ভ্লাদিভস্তকে একটা গাড়ির ভেতরে ব্রেঝনেভ সাহেবের হাত চেপে ধরেছিলেন ভাবাবেগে। একে অন্যের সামনে নাকি শপথ নিয়েছিলেন তাঁরা, আর পরমাণু বোমা নয়। ফোর্ডের পর এসেছিলেন জিমি কার্টার। ভদ্রলোক নাকি শান্তিপ্রিয়। অথচ শোনা যায়, কয়েকজন বন্ধুর সামনে তিনি বলেছিলেন, দরকার হ'লে তিনি পরমাণুযুদ্ধ শুরুর নির্দেশ দিতে পারেন। তারপর রেগানের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব। সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের টাকা কমিয়ে, ইস্কুলের ছেলেদের খাবার কমিয়ে টাকা ঢালছেন তিনি মারণাস্ত্রের খাতে। আমেরিকা ধরেছে তার সনাতন সমর-অর্থনীতির পথ।

কিন্তু এ-দেশে নবজাগ্রত পরমাণু বিরোধী আন্দোলনের জনৈক নেতা এককালে জিমি কার্টারের আর্মস-কন্ট্রোল-এক্স্পার্ট ছিলেন। নাম রোজার মোল্যান্ডার। দু'বছর আগে পেন্টাগনে এক যুদ্ধ-যুদ্ধ-খেলার সময়ে তিনি শুনতে পান এক কেতা দুরস্ত মেরিন অফিসার বলছেন : আমেরিকানরা আর ইউরোপিয়রা বিনা কারণে বড়ো মাথা গরম করে। আরে বাপু, কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত পরমাণুযুদ্ধে মরবে তো মাত্র পঞ্চাশ কোটি লোক। —শুনে মোল্যান্ডার সাহেবের পিলে চমকে গেছে নিশ্চয়ই। স্বয়ং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন যিনি অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে, এ-দেশের সামরিক হাঁড়ির খবর তো তাঁর নখদর্পণে। পরমাণুযুদ্ধের মেওয়া কোথায় কোথায় কিভাবে ফলে, তার ওপর তিনি একটা বই লেখেন। এ-ধরনের আর আর-একটি বই লিখেছেন জোনাথান শেল। নাম : "দ্য ফেট অফ দি আর্থ"। বইটা এখন আমেরিকায় কাটছে দারুণ। নানাজাতের হালফ্যাশনের পারমাণবিক বোমা পড়লে আমাদের এই গ্রহটার কী দশা হবে, কতো রকমভাবে মানুষ নিকেশ হবে, প্রাণীজগৎ নির্মূল হবে তার ওপর এ-বছর এখন পর্যন্ত খান-চল্লিশেক বই বেরিয়েছে শুধু আমেরিকাতেই। এসব বইয়ের কাটতিও খুব।

সব মিলিয়ে আমেরিকার এই শান্তি-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে গ্রীষ্মের এই শুরুতেই। তার জের যে কতটা তা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখনই। কারণ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন যে, পরমাণু অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা শুরু করে দিতে চান। ব্রেঝনেভের কাছে তিনি একটা চিঠিও নাকি লিখেছেন এই মর্মে। ভাবলে শিহরণ জাগে যে এই রেগানই কয়েক মাস আগে আগুপিছু না ভেবেই বলে ফেলেছিলেন যে ইউরোপে সীমিত পর্যায়ে পরমাণু যুদ্ধ হওয়া সম্ভব। ইউরোপে যাঁদের বোধভাষ্যি আছে, তাঁরা এ-কথার অন্তর্লীন অর্থটা ধরে ফেলেন সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ মার্কিন সরকার অন্যের পাড়ায় গিয়ে বোমাবাজি করতে চান। গেল বছর মার্কিন কর্তা এমন কি একথাও বলেছিলেন যে, পরমাণু যুদ্ধে জেতাও সম্ভব। ইদানীং অবশ্য তিনি অন্য গীত গাইছেন। সীমিত যুদ্ধ যেখানে হতে পারে বলে তাঁর ধারণা ছিল, সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে পথে মিছিল করে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁদের ধারণাটা কেমন। গত বছর অক্টোবর মাস নাগাদ পশ্চিম জার্মানি ও ইতালিতে যখন প্রবল যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন হেঁকে ওঠে, মার্কিন নেতারা তখন যুদ্ধ বিরোধীদের গালমন্দ করেছিলেন। সেই প্রতিবাদ মিছিলে হাইন্‌রিখ ব্যোল্‌ও ছিলেন। ছিলেন গায়ক হ্যারি বেলাফন্টে। যুক্তরাষ্ট্রে তখন হেমন্ত, তারপর শীত। তারপর এসেছে বসন্ত। গত হেমন্তে আমেরিকা যা ছিল, গ্রীষ্মের এই শুরুতে আমেরিকা আর তা নেই। আমেরিকার মহানায়ক সেটা বিলক্ষণ জানেন। দেশবাসীকে ভজাতে তিনি তাই ইদানিং সপ্তাহে একবার করে বেতার ভাষণ দিচ্ছেন।

বেতার ঘোষক হিসেবেই জীবন শুরু করেছিলেন এককালে রেগান। খেলার ধারাবিবরণী দিতেন। কথা তিনি ভালই বলেন। তবে 'বেসবল' খেলার তুখোড়, জনপ্রিয় ভাষ্যকার যে রাজনীতির ভাষ্যকার হিসেবেও লোকের মন ভোলাতে পারবেন এমন কথা হলফ্‌ করে বলা যায় না। সপ্তাহে পাঁচ মিনিট জন ভজনা করছেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সমানে মারমুখী যেসব ভাবভঙ্গি দেখিয়ে তিনি তাঁর দেশের অনেক মানুষকে ভড়কে দিয়েছেন, সেই ভাবভঙ্গি তিনি পুরোপুরি ছাড়তে পারছেন না। সাময়িক শক্তিমত্তায়, সেনাবাহিনীর সারবত্তায় তাঁর যে বিশ্বাস সেটা অনেক করেও পুরোপুরি লুকোতে পারছেন না তিনি। এই যেমন তিনি হালে তাঁর সাধের শ্বেতভবন থেকে জাতির উদ্দেশে বলে ফেললেন "সেনাবাহিনীর সদস্যরাই আমেরিকার স্বাধীনতার চূড়ান্ত অভিভাবক।" এই অভিভাবকদের হাতেই-রয়েছে চোখা মারণাস্ত্র। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই সব মনোহর সৃষ্টিগুলো তাক করে অভিভাবকেরা হয়তো মস্কোবাসীদের ভয় দেখাতে পারবেন। কিন্তু নতুন গ্রীষ্মে টিউলিপ ফুলের, সবুজের সমারোহে যাঁরা মাঝে মাঝেই রাজধানীর পথে পথে নিউট্রন বোমার বদলে জীবনের দাবিতে, ধ্বংস নয় সৃষ্টির, যুদ্ধ নয় শান্তির, বিশ্ব নেতৃত্বের উদ্ধত বুলি নয় বেকার আমেরিকানদের জন্য চাকরির দাবীতে মিছিল করে যাচ্ছেন তাঁদের বেলা?

# কাহিনিকার সল বেলো

কাহিনিকার সল বেলো নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৬ সালে। তারপর থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কিছুই পাইনি আমরা তাঁর কাছ থেকে পেলাম এ-বছর। তাঁর নতুন উপন্যাস "দ্য ডীন্‌স্ ডিসেম্বর।" প্রায় চল্লিশ বছর আগে সল বেলো লিখেছিলেন "দ্য ড্যাংগ্‌লিং ম্যান।" সেই ছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস। বছর চল্লিশেকে তিনি যা যা লিখেছেন তাতে মন ভরলেও বইয়ের তাক ভরে না। ঠিক আর আটটি উপন্যাস। ছোটগল্পের সংকলন একখানা। একটি নাটক। আউট অফ প্রিন্ট। ও-নাটক আজতক মঞ্চে পৌঁছোয়নি। বাধ সেধেছেন লেখক স্বয়ং। জীবনের বেশিরভাগ সকাল কেটেছে তাঁর নোটবইয়ের সামনে। সল বেলোর সব নোটবই আখেরে বই হয়ে ওঠে না। ছাপাখানার পথ চিনে নিতে পেরেছে কয়েকটামাত্র। বেশিরভাগই ঠাঁই পেয়েছে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিভৃত কক্ষে। তাঁর দরজায় কুলুপ আঁটা। সপ্তাহে দু'দিন অধ্যাপনা করেন সল বেলো। এখনও। শোনা যায়, কিছু পাণ্ডুলিপি স্রেফ ফেলে দিয়েছেন তিনি। শিকাগোর আর্বজনার সঙ্গে মিশে গেছে যাঁর লেখা, তিনি আমেরিকায় তিন-তিনবার জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার পেয়েছেন, একবার পুলিৎসার, একবার নোবেল। বেলোকে যদি শুধানো হয় : শুদ্ধ শিল্প আর নিপাট পাটোয়ারীর মধ্যে তফাত কতটা? বেলো বলবেন : প্রকাশিত বইকটা আর ফেলে-দেওয়া নোটবইগুলো দাঁড়িপাল্লার দুপাশে রেখে ওজন করে নাও।

৬৬ বছর বয়স হল সল বেলোর। "দ্য ডীনস্ ডিসেম্বর" নামটার সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর বয়সের মিল। শুধু কি বয়েসের? কাহিনির প্রধান চরিত্র অ্যালবার্ট কর্ড শিকাগোর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন। তাঁর স্ত্রী মিনা, রুমানিয়ার মেয়ে। সল বেলোর বর্তমান স্ত্রী আলেক্জান্দ্রা বেলোর ইংরেজিতে নাকি এখনও রুমানিয় টান পাওয়া যায়। হ্যাঁ, বেলোর গৃহিণীও রুমানিয়ারই মেয়ে। ডীন অ্যালবার্ট কর্ড সস্ত্রীক বুখারেস্ট গেছেন কমিউনিস্ট পার্টির অনেককালের এক সদস্যার সঙ্গে দেখা করতে। হাসপাতালে। মিনার মাকে দেখতে গেছেন তিনি সস্ত্রীক। ডীন অ্যালবার্টের শাশুড়ি মৃত্যুশয্যায়। ডিসেম্বর মাস, দারুণ শীত। এ-দেশ অ্যালবার্টের অচেনা। অচেনা পথঘাটে অচেনা মানুষ। কর্তৃত্বপরায়ণ এক সরকারের শ্যেনদৃষ্টি থেকে নিজেদের কোথাও লুকিয়ে রাখার উপায়ও যাদের নেই। ডিসেম্বরের শীতের মত এক কনকনে বিষাদ ও নৈরাজ্য এখানে যেন সর্বগ্রাসী। তারই মধ্যে, হাসপাতালের এক সেবিকা মুমূর্ষু রোগিণীর জন্যে একটা মোমবাতি জ্বেলে দিতে চাইছেন। আদিগন্ত নিরাশার অন্ধকারে এক বৃদ্ধার চিরবিদায়ের মুহূর্তে তাঁর শিয়রের কাছে একটু আলো জ্বলুক। অনাড়ম্বর অথচ তীব্র এই দৃশ্য সম্পর্কে সল বেলো পরে এক সমালোচককে বলেছেন : "আমার মনে হয়, লৌহযবনিকার ওপারে মানুষের ধর্মবিশ্বাস আরও প্রখর। প্রথমত, নিপীড়নের সামনে এটা এক ধরনের প্রতিরোধ। আর দ্বিতীয়ত, জীবনের কঠোরতা মানুষকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে গেছে।"

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সল বেলো তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বুখারেস্ট গিয়েছিলেন। আলোকজান্দ্রা বেলোর রুগ্না মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কাহিনির সঙ্গে বাস্তব ঘটনার এই মিলটাও কি নেহাতই আপতিক? বুখারেস্টে গিয়ে অ্যালবার্ট কর্ডের থেকে থেকেই মনে পড়ছে শিকাগোর কথা। সল বেলোর শহর, শিকাগো। অ্যালবার্ট কর্ডের মানসে একদিকে ক্লান্তিকর বিষণ্ণতায় ভরা বুখারেস্ট আর অন্যদিকে অবক্ষয়ী শিকাগো, খুন, ভিড়, পচন। একদিকে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাহীনতা অন্যদিকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার আধিক্যে বেসামাল সমাজ। স্বাধীনতা সেখানে খোলামকুচির মতো মূল্যহীন। অর্থহীন। বুখারেস্টে কর্ড তথাকথিত কমিউনিস্ট আমলাদের শিকার। তাঁদের নির্দেশ : মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মায়ের সঙ্গে মিনা তাঁর স্বামীকে নিয়ে দু'বার মাত্র দেখা করতে যেতে পারবেন। এই নির্দেশ অকারণ। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে। মনে হবে, এ এক নিষ্ঠুর খামখেয়াল। তাই কি? নাকি এই খামখেয়ালের নীচে রয়েছে কিছু মহামাত্যের আস্ফালন। নির্বাচিত কিছু মহামাত্য, স্বাধীনতা যাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি। রুদ্ধ বুখারেস্ট থেকে মুক্ত শিকাগো। বুখারেস্টে জীবন রুদ্ধ। শিকাগোয় মৃত্যু মুক্ত। শিকাগোয় ফিরে অ্যালবার্ট কর্ড জড়িয়ে পড়লেন একটা খুনের মামলায়। এক তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ জনৈক শ্বেতাঙ্গ তরুণকে খুন করেছেন। এক-দুনিয়ায় এক মুমূর্ষু মহিলা। অন্য-দুনিয়ায় এক নিহত তরুণ। এক-দেশে এক রুগ্ণা নারী পার্টির জন্য সারাজীবনের আত্মত্যাগের পর কিছু আমলার

খামখেয়ালের দৌলতে মৃত্যুশয্যায় নিজের মেয়েকে দু'বারের বেশি দেখতে পান না। মৃত্যুর মুখোমুখি হন তিনি একাকিত্বের অন্ধকারে। অন্য-দেশে এক তরুণ তুচ্ছ কারণে, প্রায় যেন অকারণে ছুরি খায়। তার মৃত্যুর মুহূর্তে সে একা নয়-এই যা তফাত। একজনের মৃত্যু আসে অন্ধকারে, চুপিসাড়ে। সে-মৃত্যুর কোনও অবয়ব নেই। অন্য জনের মৃত্যু আসে হয়তো প্রকাশ্য দিবালোকে, হয়তো-বা আলোঝলমল কোনও শহুরে সন্ধ্যেয়। সে-মৃত্যুর অবয়ব আছে। ঘাতককে সে দু'চোখ ভরে দেখে নিতে পারে। যেমনভাবে সে দেখে নিয়েছে শিকাগোর অবক্ষয়, কালো মানুষের যন্ত্রণা, পূতিগন্ধময় "গেটো", অবহেলিত, অশিক্ষিত অসংখ্য তরুণের শাণিত আক্রোশ। তরুণটি একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। জীবনের রসদ যেখানে বাড়ন্ত, সেখানে অনন্ত স্বাধীনতা নিয়ে সে কী করবে—এই প্রশ্নের উত্তর তাকে আর খুঁজতে হবে না। খুঁজতে হবে অ্যালবার্ট কর্ডকে। সল বেলোর আর-এক নায়ক 'হেয়র্‌ৎসোগ' রাশিরাশি চিঠি লিখেছেন। ডাকে দেননি একটাও। সল বেলোর নতুন নায়ক অ্যালবার্ট কর্ডকে লিখতে হবে। তবে চিঠি নয়। পত্রিকার জন্য আর্টিক্‌ল্‌ লিখবেন তিনি। বোধহয় পয়সার জন্য। কারণ ঘটনাচক্রে তিনি তাঁর ডীনের চাকরিটা খুইয়েছেন।

সল বেলো নাকি নিজে কোনওদিন পয়সার জন্য লেখেননি। এটা তাঁরই স্বীকারোক্তি। শিক্ষকতা করেছেন, এখনও করছেন। সেই বাবদ মাইনে পেয়েছেন, এখনও পাচ্ছেন। দুটো বাড়তি পয়সার জন্য বেশি বেশি করে ক্লাসও নিয়েছেন তিনি কলেজে। কিন্তু অর্থাগম হবে ভেবে কলম ধরেননি তিনি কখনও। টাকা পয়সার টানাটানি তাঁর একাধিকবার হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদের দরুন দেনাপাওনা নিয়ে টাগ-অব ওয়ার চলেছে প্রায় তেরো বছর ধরে। নোবেল পুরস্কার বাবদ ১ লক্ষ ৬০ হাজার ডলার হাতে এসেছিল সল বেলোর। পুরো টাকাটাই নাকি তাতে চলে গেছে। তবে, আমেরিকার মত একটা দেশে একটু বুদ্ধি করে চললে যে লিখে দেদার টাকা করা যায়, বেলো তা জানেন। প্রথমত, বেশ গুছিয়ে একটা প্ল্যান করে ফেলতে পারলে আর মারে কে? তবে এইভাবে, সুপরিকল্পিত ভাবে কাজ করতে তিনি রাজি নন। ওটা নাকি তাঁর ধাতে নেই। সল বেলোর আর একটা প্রস্তাব হলো : "লেট ইয়োর হ্যাবিটস্‌ মাস্টার ইউ"—অবশ্য তিনি নিজে কিন্তু অভ্যেসের দাসত্ব বরণ করবেন না কিছুতেই। "চলনসই বই লিখে ফেলাই যদি উদ্দেশ্য হয় তো বাকি জীবনটা এই ভাবেই কাটিয়ে দেওয়া যায়।"—এইভাবেই, অর্থাৎ রুটিনমাফিক লিখে। সল বেলো এই প্রাত্যহিকতার ধার ধারেন না। "আরও অনেক বই লিখতে পারতাম আমি। সহজেই পারতাম। না পারার আছেটা কি?" কহেন সল বেলো। হঠাৎ সন্দেহ হয়। কথাটায় কি কোনও খেদের কাঁটা লুকিয়ে আছে? অনেক লেখাই তো শেষ করেননি তিনি। ফেলে দিয়েছেন কত পাণ্ডুলিপি। তাঁরই কাহিনির নায়ক হেয়রৎসোগের মতো তিনিও তো কত চিঠি ডাকে দেননি। বেলো লিখতে শুরু করে, অনেকটা এগিয়ে প্রায় মাঝপথে থমকে গেছেন। আর এগোতে

পারেননি। ''হয় যা ভেবেছিলাম তা ভুল, অথবা চরিত্রগুলো ঠিক ছিল না আর নয়তো পটভূমিটাই ছিল গোলমেলে। কোথাও না কোথাও একটা ভুল ছিল। আর আমি এত বোকা যে প্রায় বছর খানেক লেখার পর তবে বুঝলাম কি হয়েছে।'' সল বেলোর মতো লেখকদের এমন ধারা স্বীকারোক্তি শুনতে আমরা অভ্যস্ত নই। তিনি যে জায়গায় পৌঁছে গেছেন অতদূরও যেতে হয় না, তার আগেই শুধু সাফল্যের গ-সা-গু অঙ্ক কষতে দেখা যায় মানুষকে। ব্যর্থতার খতিয়ান কতটুকু পাই আমরা। বিভিন্ন আপ্তবাক্যে ঠাসা আমাদের আধুনিক শব্দকোষের প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে লেখা 'সাফল্যের চেয়ে বেশি সফল আর কিছুই নয়।' বছর খানেক এক নাগাড়ে কাজ করার পর শুধু পশুশ্রমের তিক্ততা নিয়ে 'কোথাও না কোথাও একটা ভুল' অলা কোনও পাণ্ডুলিপি গায়েব করে ফেলার যন্ত্রণা সল বেলোর কতটা তীব্র তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। পরিহাস আর ফাজলামির বুলেটপ্রুফ জামা পরে থাকেন তিনি। অসমাপ্ত লেখার কথা উঠতে মনে পড়ে যায় তাঁর এক আমেরিকান গায়কের গপ্‌পো। ইতালিয় শ্রোতাদের গান শোনাতে গেছেন সেই গায়ক। একটা গান সবে শেষ করেছেন কি করেননি অমনি অনুরোধ এলো : ''আনকোরা উনাভল্‌তা''—আরও একবার হোক। যতবারই গায়ক ঐ গান শেষ করেন ততবারই ঘুরেফিরে সেই একই অনুরোধ। শেষে এক সুধী শ্রোতা বিহ্বল কণ্ঠ শিল্পীকে বললেন : দ্যাখো বাপু, যতক্ষণ না তুমি গানটা ঠিকমতো গাইতে পারছ ততক্ষণ তোমার নিস্তার নেই, এই গানটাই বারবার গেয়ে যেতে হবে। সল বেলোর মন্তব্য : ''সল বেলো তা জানেন। মর্জি হলে নিজেরই লেখা কোনও বই তাক থেকে নামিয়ে কয়েক পাতা পড়ে ফেলার অভ্যেসও তাঁর আছে বলে শোনা যায়। এটা কি আত্মরতির উপচার, নাকি আত্মসমালোচনার আয়োজন? বোঝা মুশকিল। বেলো বলেন নিজের লেখা পড়ে তিনি মজা পান। অবশ্য যদি কিং জেমস্ বাইবেল বা ব্লেক বা শেক্সপিয়ার পড়ার মেজাজ না থাকে তাবেই। বাইবেল বোধহয় তাঁর জীবনের প্রথম বই। তাঁর যখন বছর আষ্টেক বয়স, তিনি তখন কঠিন অসুখে পড়েন। নিউমোনিয়া থেকে শুরু করে প্রায় ক্ষয়রোগ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কুবেকে জন্ম। সেখানকারই এক টিবি হাসপাতালে ছিলেন তিনি। রোগের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুভয়ের অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাঁর সেখানে। বাবা-মা রাশিয়ান ইহুদী। ইংরেজির চেয়ে ইড্ডিশেই ছিল সহজিয়া অনুরাগ। তবে বিছানায় পায়ের দিকে লটকানো চার্টে কি লেখা আছে তা পড়ার মতো ইংরেজি তিনি জানতেন। কোত্থেকে জুটেছিল একখণ্ড নিউ টেস্টামেন্ট।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সল বেলো নিজের স্বাস্থ্য, বিশেষ করে দেহের ওজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। লাইব্রেরি থেকে যত রাজ্যের ব্যায়ামের বই এনে এনে শরীর চর্চা শুরু করে দেন। আর কখনও অসুখে পড়েননি তিনি। লাইব্রেরি থেকে স্বাস্থোদ্ধারের বই চেয়ে আনারও দরকার হয়নি আর। তবে লাইব্রেরিতে

যাওয়ার অভ্যেসটা থেকে গেছে বিয়োগফল হিসেবে। অসাধারণ পাঠক সল বেলো। ছাত্র জীবনে বাড়ি-কলেজ, কলেজ-বাড়ি যাওয়া-আসার পথে প্রতিদিন ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধ'রে তিনি ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের গুলে খেয়েছেন। নির্মম পাঠক ছিলেন তিনি সে সময়ে। প্রায়ই নাকি এমন হতো যে তিন ঘণ্টা ধরে তিনি একই প্যারাগ্রাফ বারবার পড়ছেন। গ্রন্থকীট যেসব সমালোচককে সল বেলো খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে "সার্টিফায়েড ইন্টেলেকচুয়াল" বলে থাকেন আজকাল, গ্রন্থ তিনি তাঁদের চেয়ে কিছু কম কাটেননি। স্কুল-কলেজে সাহিত্য পাঠের পর বেলোর স্থির বিশ্বাস, সাহিত্যের পাঠ দিতে গেলেই সর্বনাশ। সাহিত্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা পড়লে বা শুনলে আজও তিনি শিউরে ওঠেন। তাঁর মতে, ওগুলো সাধারণ পাঠক আর সাহিত্যের মাঝখানে দেওয়ালের মতো। এই দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে সল বেলো একবার ছাত্রজীবনে সাহিত্যের ক্লাস ছেড়ে দুত্তোর বলে নৃবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে শুরু করেন দস্তুরমতো উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিয়ে করার তাগিদে সেটাও ছেড়ে দেন। বিয়ের পর লিখতে শুরু করেন। ১৯৪১ সালে তাঁর লেখা ছাপা হতে শুরু করে। 'ড্যাংগ্‌লি ম্যান' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ।' ৪৭-এ 'দ্য ভিক্‌টিম'। লেখকমহল ততদিনে বেলোকে চিনে গেছেন। প্রথম জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার জোটে তাঁর ১৯৫৩ সালে। সে-বছর বেরিয়েছিল 'অগি মার্চ'। এই পুরস্কার তারপর আরও দু'বার পেয়েছেন সল বেলো। লাজুক প্রকৃতির লোক তিনি নন। কিন্তু আত্মপ্রচারে তিনি চিরকালই বিমুখ। নোবেল পাবার পর বলতে গেলে প্রায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিলেন বেলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়ালে যে তাঁর হাঁড়ি চড়বে না তা নয়। তবু তিনি পড়াচ্ছেন। যদিও সাহিত্য পড়ানোর আগ্রহ তাঁর কোন দিনই তেমন ছিল না। ক্লাস নেন বিকেলের দিকে। সপ্তাহে দু'বার। সকালে লেখেন। প্রথমে নোটবুকে। তারপর ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে। টাইপরাইটারটা পুরনো। স্মিথ করোনা কোম্পানি এই মডেলটা আর তৈরি করে না। পুরনো টাইপরাইটারে লেখা সেরে সল বেলো ক্লাস নিতে বেরোন, পুরনো পোশাক পরে নয়, ফিটফাট বাবু সেজে। ছাত্রছাত্রীমহলে শৌখিনতার জন্যে তাঁর সুনাম আছে, আর রক্ষণশীল মতামতের জন্য—কিছু কিছু মহলে-কিঞ্চিৎ দুর্নাম। একবার পকেটে রাখা কলম থেকে কালি বেরিয়ে শার্টে ধেবড়ে গিয়েছিল বলে সল বেলো এত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যে সেদিন আর ক্লাস নেননি তিনি।—কোনওদিন হয়তো তাঁর কোনও গল্পে কারও জামায় আমরা কালির দাগ দেখতে পাব।

# অ্যাটেনবোরোর গান্ধী

"সত্যিকথা বিভিন্নভাবে বলা ও
বিভিন্নভাবে গোপন করা যায়।"

—বেয়র্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্

অ্যাটেনবোরো সাহেবের গান্ধী এবার অনেকগুলো অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়ে গেল মার্কিন মুলুকে। ছবিটা আমেরিকায় বেরোনোর পর থেকেই চলছিল মহা ধুন্ধুমার। ছায়াছবি নিয়ে এ হেন মাতামাতি এ দেশে এই হারে ইদানিং বড়ো একটা দেখা যায় না। চারিদিকে সাজসাজ রব। গত কয়েক মাসে "গান্ধী দ্যাখো" ছিল সবচেয়ে চালু শ্লোগান, "গান্ধী দেখতে হবে" সবচেয়ে ব্যাপক সংকল্প, "গান্ধী দেখে এলুম" সবচেয়ে সোচ্চার উক্তি। প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে বিপুল বিজ্ঞাপন : "যে ব্যক্তি একা হাতে ভারত থেকে ব্রিটিশ খেদিয়ে ছিলেন, এ ছবি সেই মহান মানুষকে নিয়ে।" কাউন্টারের সামনে হাজার মানুষের সারি। অ্যাটেনবোরোর "গান্ধী" মার্কিনিদের মুখে মুখে, বুকে বুকে, চোখে চোখে, জিভের ডগায়, কলমের নিবে। কতো কি হয়ে গেলো। ছবির শেষে দাঁড়িয়ে উঠে সমবেত করতালি, মায় কিছু বিক্ষিপ্ত অশ্রুমোচন। চায়ের টেবিলে স্মরণ। সাবওয়ের আপিসযাত্রায় সপ্রশংস গুঞ্জন। ইস্কুলে ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের আলোচনা। "গান্ধী", অ্যাটেনবোরোর "গান্ধী" হোমওয়ার্কের উপজীব্য ক্লাসওয়ার্কের

নম্বর। কাগজে পত্রে সম্পাদকীয়। নিবন্ধ। পাশের ফ্ল্যাটের যে ভদ্রলোক বছর তিনেক সন্তর্পণে আমার পাশ কাটিয়ে গেছেন, এবারে তিনি বলা-নেই-কওয়া-নেই আমায় পাকড়াও করে সগর্বে জানিয়ে দিলেন যে তিনি "গান্ধী" দেখে এসেছেন।

আমিও গেলুম "গান্ধী" দেখতে। তার কয়েকদিন আগে হাতে এসেছিল পশ্চিম জার্মানির এক পত্রিকা। তাতেও "গান্ধী"। সে-নিবন্ধে পড়লুম, স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী ছবির স্ক্রিপ্ট দেখে গিয়েছেন। শিহরণ জাগলো। ছবিঘরে ঢুকলুম যখন, রোমাঞ্চের ঘোর তখনও কাটেনি।

একটি স্বীকারোক্তি : ইস্কুলে কলেজে লেখাপড়ায় ভাল ছিলুম না কস্মিনকালে। কতো কি শিখিনি যথাসময়ে। সেই ফাঁকিবাজির মাশুল আজও দিয়ে চলেছি। রাজ্যের জিনিস শিখতে হচ্ছে নিয়ত। একে তো অনেক কিছু শিখিনি, জানিনি, বুঝিনি। যেটুকু শিক্ষা পেয়েছি ব'লে ভেবেছিলুম, আজ দেখছি সেটুকুও মেকি, ভেজাল, অর্ধসত্যে ভরা। অ্যাটেনবোরো সাহেবের "গান্ধী" আমায় নতুন ক'রে লজ্জা দিল, ভাবিয়ে তুলল। দেশের আরও পাঁচজনের মতো আমারও ধারণা ছিল, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া আরও অনেকে ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য লড়াই করেছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন। আমার, কেন জানি না, ধারণা ছিল, মহাত্মা গান্ধী মোটামুটি একার ও তাঁর কয়েকজন অনুগামীর উদ্যোগে ব্রিটিশদের তাড়াননি। কি আশ্চর্য দেখুন, সেই ছেলেবেলা থেকে জেনে এসেছি, প'ড়ে এসেছি যে, শয়ে শয়ে বিপ্লবী নিজেদের রক্তের মূল্যে প্রাণের মূল্যে আমাদের জন্মভূমিকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন। দেশের জয়গান গাইতে গাইতে কতো তরুণ ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন, জেলখানায় কতো বিপ্লবীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, কতো বুক শূন্য হয়ে গেছে—তার কাহিনি, এত দিন ভেবেছিলুম, বুঝিবা সত্যি। ভেজাল-মেশানো শিক্ষার কি গেরো দেখুন, আমি ভেবেছিলুম সুভাষচন্দ্র বসু নামে একজন মানুষ ছিলেন। ধারণা ছিল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে কিছু লিখতে গেলে, বলতে গেলে, করতে গেলে (ছবি করাও তার মধ্যে পড়ে বৈকি) তাঁর নাম উল্লেখ না ক'রে উপায় নেই। এতদিন বৃথাই জেনে এসেছি যে মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনে সুভাষচন্দ্রের একটা ভূমিকা ছিল। মহাত্মার ক্যানডিডেট সীতারামাইয়া কংগ্রেসের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের কাছে হেরে যাওয়ার পর মহাত্মা যে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজনীতি ছেড়ে দেবার উপক্রম করেছিলেন, এই তথ্য, আমার ধারণা ছিল, বুঝিবা ঐতিহাসিক। বস্তুতপক্ষে, সুভাষচন্দ্র বসু বনাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর রাজনৈতিক লড়াইটাকে উহ্য রেখে মহাত্মা গান্ধীর কোনও জীবনালেখ্য রচনা করা সম্ভব, তাঁর জীবন, দর্শন ও রাজনৈতিক অবদানের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব, এটা আমার বিলকুল জানা ছিল না। অ্যাটেনবোরোর "গান্ধী" দেখে নতমস্তকে মেনে নিলুম আমার শিক্ষার, ধারণার অপূর্ণতার কথা।

তিরিশে এপ্রিল ''দেশ'' পত্রিকায় অগ্রণী লেখক রূপদর্শী ''অ্যাটেনবোরোর গান্ধী'' শীর্ষক তাঁর সুলিখিত নিবন্ধের শেষের দিকে লিখছেন : ''আজকের এই ঘোর তামসিকতার বাজারে আমাদের ক্রিয়াকর্মের বিপরীত পরিণতি যখন এমন ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে, আমরা হালে আর পানি পাচ্ছি না, তখন গান্ধীর অভিজ্ঞতা যে সব মৌল সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছে সেগুলোর পুনর্মূল্যায়নের জন্য মনে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয় অ্যাটেনবোরোর গান্ধীর কাছে আমি সেই কারণে কৃতজ্ঞ।'' অ্যাটেনবোরোর ''গান্ধী''র কাছে আমিও কৃতজ্ঞ, তবে অন্য কারণে। অবশ্য পুনর্মূল্যায়নের ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রেও আছে। এ ছবির কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কারণ হল, ''গান্ধী'' দেখে আমার দৃষ্টি আগের চেয়ে অনেক স্বচ্ছ হয়ে এসেছে বোধ হয়। এর কিছু উদাহরণ আগেই দিয়েছি। তবে দোষ কবুল করতে সেই বসলুমই যখন, তখন ভাল করেই নামাই, গুছিয়ে কবুল করি যতোটা সম্ভব। এতদিন ভেবে এসেছিলুম, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এক ঐতিহাসিক ঘটনা যার সঙ্গে আরও এক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জড়িয়ে আছে আমাদের স্মৃতিতে। জেনে এসেছিলুম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। এ কথা জজেও মানে যে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিক্রিয়ার তেমন কোনও নিবিড় সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুশকিল হল, জালিয়ানওয়ালাবাগ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এবং রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগও ইতিহাসের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। এই ঘটনাটিও স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অংশ। মহাত্মা গান্ধীর জীবন, তাঁর রাজনীতি, তাঁর চিন্তাধারা এগুলো ইতিহাস নিরপেক্ষ নয়। তাঁকে বুঝতে হ'লে তাঁর সময়কার ইতিহাসের পটভূমিতেই তাঁকে দাঁড় করাতে হবে বোধহয়। ইতিহাসের সেই পটভূমিতে আর যে সব ব্যক্তি ও ঘটনার প্রাধান্য ছিল, গান্ধীর জীবনীতে সেইসব ব্যক্তি ও ঘটনাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে স্থান দিতে হবে—ঠিক যেমন অ্যাটেনবোরো জহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদকে স্থান দিয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর অ্যাটেনবোরোর ছবিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ ঘুণাক্ষরেও নেই। আমি ছবি বিশারদ নই। তবু এটুকু বুঝি যে রবীন্দ্রনাথ রেগেমেগে নাইট উপাধিটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন—এটা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে দেখাতে গেলে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রটা ছবিতে রাখা দরকার। স্থান ও সময়ের অভাবে সেটা যদি সম্ভব না হয় তাহ'লেও ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সেটা উল্লেখ থাকাই যথেষ্ট। নাইট উপাধি ত্যাগের উল্লেখ বা অনুল্লেখ এক্ষেত্রে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব'লেই অধমের মনে হয়েছে কারণ ''গান্ধী''র মাধ্যমে অ্যাটেনবোরো তুলে ধরতে চেয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরাট একটা অংশ। ছবির বিজ্ঞাপন যেটুকু দেখেছি তাতে সেরকমই মনে হয়েছে। এই ঘটনাটি ছবিতে অনুল্লেখিত থেকে যাওয়ায় বুঝলুম সুভাষচন্দ্রের মতো এটাও আসলে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেকদিনের একটা বেয়াদব ভুল ঝনঝন ক'রে ভেঙে গেল।

মহম্মদ আলি জিন্না দেবশিশুর মতো অপাপবিদ্ধ—এমন ধারণা, ইতিহাস প'ড়ে (যেটুকু কষ্টেসৃষ্টে পড়েছি), কোনওদিনই হয়নি। তাই ব'লে এটাও কখনও ভাবিনি যে 'ব্রিটিশ হটাও' নাটকে তিনি ছিলেন আগাগোড়াই ভিলেন। অ্যাটেনবোরোর নাটকে কথায়-কথায়-চোখ-পাকানো, আগমার্কা কুচক্রী-সদৃশ এক জিন্না সাহেবকে দেখে মালুম হল, এখানেও ভুল করেছি।

এতগুলো ভুল একসঙ্গে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে যাওয়ায় বেশ কয়েকটা দিন কেমন যেন দিশেহারা অবস্থায় কেটেছে। তারই মধ্যে এদিক ওদিক কিছু কথাবার্তা হয়েছে মার্কিনিদের সঙ্গে। যতজন মার্কিনির সঙ্গে আমার পরিচয়, দু' একজন বাদে তাঁরা সকলেই "গান্ডি" দেখে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। মুশকিল হয়ে গেছে এই যে, এঁরা সব্বাই এই ছবিটার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা চমৎকার সমীকরণ ক'রে ব'সে আছেন মনে মনে। সবারই এখন ধারণা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলতে মহাত্মা গান্ধী আর জহরলাল নেহরু। দর্শকদের মধ্যে যাঁরা চৌকস, তাঁরা অবশ্য বল্লভভাই প্যাটেল আর মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামও মনে রেখেছেন। সবাই জেনে গেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা মানচিত্র যদি আঁকা যায় তো পশ্চিম ও উত্তর ভারত ছাড়া উপমহাদেশের অন্য কোনও অঞ্চল তার মধ্যে স্থান পেতে পারে না। বাঙালিত্বের ধ্বজা তুলে কয়েকজনকে বাংলাদেশের (আজকের এপার ওপার দুই বাংলার) অবদানের কথা, বীরত্বের কথা, ত্যাগের কথা বলতে গিয়ে মহা ফ্যাসাদে প'ড়ে গেলুম। মাৎমাৎ ক'রে তেড়ে উঠে "গান্ডি"...দর্শকরা ব'লে উঠলেন : "বাংলা? আরে ছ্যা ছ্যা, সেখানে তো খালি রায়েট হয়, হিন্দু মুসলমান এ ওকে ধ'রে কোতল করে।" গতিক সুবিধের নয় দেখে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামীদের কথা চেপে গেলুম। সুভাষচন্দ্রের কথাও। তাঁরা তো সব সহিংস লোক। পাপীতাপী মানুষ। ক'দিন মনে মনে পাঁয়তারা কষলুম, চিত্তরঞ্জন দাশের কথা বলব এবার। কথাটা সবে পেড়েছি কি পাড়িনি, প্রবল আপত্তি উঠল। ক্রেডিবিলিটির প্রশ্ন তুললেন কেউ কেউ। সি. আর. দাশ? তিনি কে? ফিল্মে তাঁকে দেখিয়েছে কি?

সাধারণ মানুষ, সাধারণ দর্শক ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে গিয়ে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন না। মোটা মোটা কেতাব দেখলে তাঁরা মনমরা হয়ে যান। এ দেশে সাধারণ লোকে বাঁচেন একটু আধটু খবরের কাগজ, বিপুল হারে টেলিভিশন আর মাঝে মধ্যে সিনেমা নিয়ে। এ হেন সাধারণ সব মানুষ মার্কিন মুলুকে ব'সে অ্যাটেনবোরোর গান্ধী দেখার পর যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে ভাবছেন, তখন তাঁদের ভাবনায় রসদ জোগাচ্ছে ঐ ছায়াছবিটাই। ছবিতে যা দেখানো হয়েছে সেটাই তাঁদের কাছে ইতিহাস, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। সে ইতিহাসের কুশীলব গুটি কয়েক মানুষ। সে ইতিহাস প্রাণ পেয়েছে উত্তর ভারতে। সে ইতিহাসের প্রধান পুরুষ এক ও অদ্বিতীয়। সে ইতিহাসে চট্টগ্রাম নেই। সে ইতিহাসে বাংলার সকল বিপ্লবী অপাংক্তেয়। অপাংক্তেয় বললেও যেন বাড়িয়ে বলা হয়। তাঁদের কোনও

অস্তিত্বই নেই। সে ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করা বারণ। ভগৎ সিং সে ইতিহাসের কেউ নন। লালা লাজপৎ রায় সে ইতিহাসে স্থান পাবেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজ সেই ইতিহাস থেকে হাজার আলোকবর্ষ দূরে। সে ইতিহাসে কলকাতা শুধু দাঙ্গার শহর।

ধন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নব ইতিহাস। ধন্য সে ইতিহাসের প্রচারক অ্যাটেনবোরো।।

# মিরোস্‌লাভ হোলুব

ওহায়ো রাজ্যের ওবারলিন কলেজে জীববিজ্ঞানের পড়ুয়াদের জন্য যে ঘরে নানা জীবজন্তু রাখা, সে-ঘর কতকটা প্লেটোর রিপাবলিকের মতো। তথাকথিত কবিটবিদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। ফরম্যাল ডি হাউডের গন্ধে সেখানে ভূত পালায় কবি তো কোন ছার। অথচ চেকোশ্লোভাকিয়ার কবি মিরোস্‌লাভ হোলুবের সেখানে স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, সজাগ চোখ মেলে তিনি ইঁদুরের খাঁচাগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, মনের মতো ইঁদুর খুঁজছেন। ওবারলিনের বেনোজলে বুড়ি চাঁদ ভেসে যায়নি। কাজেই আট বছর আগের একদিনের সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা। গুহায়োর এই অতিথি একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী। মনমতো একটা ইঁদুর পেলে, হোলুব তার পেট থেকে 'ওমেনটাম' নামে একটা 'টিসু' বের করে নেবেন। তারপর দরকার একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র। টাইপরাইটারটা তার কাছেই রাখা। বিজ্ঞানীরা বলেন মিরোস্‌লাভ হোলুবের মতো ইমিউনোলজিস্ট জগতে খুব বেশি নেই। সাহিত্য সমালোচকেরা তাঁকে ইউরোপের অগ্রণী কবিদের মধ্যে স্থান দেন।

ওবারলিনের ইমিউনোলজি ল্যাবরেটারিতে মিরোস্‌লাভ হোলুব অতিথি। তাঁর খাস নিবাস প্রাগ। সেখানকার ইনস্টিটিউট অব ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনে তিনি গবেষণা করে থাকেন। কিন্তু এই নিয়ে দুবার তিনি লেখক হিসেবে ওবারলিন কলেজের আমন্ত্রণ পেলেন। ১৯৭৯ সালে একবার এসেছিলেন। ফের

এলেন এবছর (১৯৮২)। গেলবারেও গোটা একটা সেমেস্টার কাটিয়ে গেছেন হোলুব। ওবারলিনের ল্যাবরেটরিতে বড় একটা দেখা যায় না তাঁকে। হোলুবের এখানে থাকায় জীব বিজ্ঞানের ছাত্রদের তেমন ফায়দা নেই। লাভ বেশি ইংরেজির থুড়ি সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের। ওয়ার্কশপ, সেমিনার, রচনাপাঠ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তিনি হবু লেখক লেখিকাদের কাছে বিজ্ঞান ও কার্যের চরিত্র ব্যাখ্যা করেন। দুয়ের সম্পর্কটা বোঝাতে চেষ্টা করেন।

হোলুবের কবিতা পাঠের আসর একটা দেখার মতো ব্যাপার। ছাত্রছাত্রীরা আর অধ্যাপকরা তো আছেনই। রবাহুত সাধারণ নাগরিকরাও দলে নেহাত কম নন। চেকোশ্লোভাকিয়ায় নাকি অভিনেতারাই সচরাচর জনসমাবেশে কবিতা পড়ে শোনান। আমেরিকায় আবার কবিরাই তাঁদের নিজেদের লেখা পাঠ করেন। মিরোস্‌লাভ হোলুবের বোধহয় এটাই বেশি পছন্দ। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণে একটা টান আছে। কিন্তু সেটাকে তিনি তেমন আমল দেন না। কবিতা পাঠের পর হোলুব ছাত্রছাত্রীদের সম্পত্তি। এতক্ষণ যা পড়ে শোনালেন এবারে তা নিয়ে আলোচনার পালা। আলোচনায় বসলেই মিরোস্‌লাভ হোলুব বিজ্ঞানের সাধক। দক্ষ হাতে ল্যাবরেটরির ইঁদুর কেটে অভ্যস্ত তিনি। সুক্ষমুখটিসু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ফেলে রোগ-প্রতিরোধের রহস্য-উদ্‌ঘাটন তাঁর নিত্যকার কাজ। সেই একই মন নিয়ে তিনি যেন কবিতা চেরেন। বিজ্ঞানের মতো কবিতা সম্পর্কেও তাঁর বেশির ভাগ প্রশ্ন একান্তই মৌলিক। আমেরিকার যে-কোনও কবি একটি চিত্রকল্প বা দুটি পঙ্‌ক্তি দেখে লাফিয়ে উঠবেন হয়তো। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই কবি সেখানে প্রথমেই শুধোবেন : "কবিতাটা আদৌ লিখলে কেন? কী পরীক্ষা করতে চাইছ এই কবিতায়?—হোলুব বড় প্রশ্নমনস্ক কবি।

বিজ্ঞান আর কবিতা দিয়ে মিরোস্‌লাভ হোলুব অনেককাল ধরে পৃথিবীর, বস্তুজগতের তল্লাস নিচ্ছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ে তাঁর একশোটারও বেশি মৌলিক কাজ এ-যাবৎ ইংরেজিতে বেরিয়েছে। চেক ভাষায় লেখা তাঁর কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা তেরো। তর্জমার দায়িত্ব তিনি নেন না। মোট পনেরোটা ভাষায় তাঁর কবিতা অনুদিত। গদ্যের বই লিখেছেন চারটি। তার মধ্যে একটা পুরোপুরি সাহিত্য বিষয়ে। এডগার অ্যালান পোর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। ১৯৭৯ সালে আমেরিকা ঘুরে গিয়ে একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন।

১৯২৩ সালে পিলসেনে জন্ম তাঁর। কাব্যের জন্য তাঁর জন্মস্থান যত না প্রসিদ্ধ, তার চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ বিয়ারের জন্য। তবে প্রথমটিতেই তিনি বেশি আসক্ত। অক্ষর-পরিচয় হবার আগের থেকে তিনি পদ্যরচনা শুরু করেন। মায়ের আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে করতে পদ্য আওড়াতেন তিনি। মা সেগুলো লিখে রাখতেন। ১৯৪৭ সালে প্রাগে ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে সমান আসক্তি থাকায় একসময়ে ধরেই নিয়েছিলেন যে মনোবিজ্ঞানী হবেন। হতে পারলেন না একটুর জন্য।

কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্যাথোলজিস্ট হবার নির্দেশ দিয়ে প্রাগের বুলভ্কা হাসপাতালে বসিয়ে দিলেন। এই আমলাতান্ত্রিক গা-জোয়ারি হোলুবের বেলায় শাপে বর হল। প্রাগে থাকার দরুন এবং ওর-তার সঙ্গে আলাপ হতে হতে একসময়ে তিনি 'ইমিউনোলজি'র হদিশ পেলেন। প্রশিক্ষিত প্যাথোলজিস্ট হিসেবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই নাম করে ফেললেন। এ তো গেলে একদিক। প্রাগের লেখকদের আড্ডাতেও তাঁর যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। স্রেফ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সন্তুষ্ট তিনি কোনওদিনই ছিলেন না। ইউনিভার্স নামে এক বিজ্ঞান-পত্রিকার সম্পাদক হলেন তিনি। অন্যদিকে চলল কবিতা-লেখা। বিভিন্ন বিষয়ে এত নিবিড়ভাবে জড়িত থাকার দরুনই বোধহয় চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে খানিকটা তফাতে থাকতে পেরেছেন হোলুব। প্রাত্যহিক জীবনের বহু টানাপোড়েন আর রাজনৈতিক ঝড়তুফান সত্ত্বেও মনের ভারসাম্যটুকু বজায় রেখে কাজ করে গেছেন তিনি একনাগাড়ে।

বিদেশ যাত্রা নামে ব্যাপারটা চেকোশ্লোভাকিয়ার অনেক মানুষের কাছেই দুর্লভ। অর্থাভাবই এর অন্যতম কারণ। মিরোস্লাভ হোলুব একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। বিদেশে কবিতার বই বেচে যে টাকা তিনি পান, তাতে তাঁর মাঝে মধ্যে বিদেশ যাওয়া চলে। তবে কাজকর্ম ছাড়া বিদেশ ভ্রমণে তাঁর তেমন স্পৃহা নেই। কারণ লেখার রয়্যালটি বাবদ যে টাকা তাঁর নামে থাকে, পরিমাণে সেটা আহামরি নয়। একবার পকেটে ঠিক পাঁচ ডলার আর মোটা টাকার রয়্যালটির প্রতিশ্রুতি নিয়ে হোলুব স্টকহোলমে হাজির হন এক আন্তর্জাতিক ইমিউনোলজি-সম্মেলনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে। বিমানবন্দর থেকে টেলিফোন করে জানলেন যে তাঁর প্রকাশক হঠাৎ আমেরিকা পাড়ি দিয়েছেন। অনেক চেষ্টা-চরিত্তির করে শেষে তিনি আর-এক প্রকাশকের কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা ধার করলেন। তাতে কায়ক্লেশে ক'দিনের হোটেল-খরচটা চলে গেল। খাবার জুটল যৎসামান্য।

আমেরিকার জীবনধারা হোলুবের চেনা। কোন কোন দিক দিয়ে মার্কিন মুলুক যে আকর্ষণীয়, এটাও জানেন তিনি বিলক্ষণ। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া ছেড়ে আমেরিকায় পাকাপাকি ঠাঁই নেবার কোনও বাসনা তাঁর নেই। চিরপ্রবাসী লেখকদের বিড়ম্বনা তিনি ভালই বোঝেন। ও-জীবন তাঁকে টানে না, তিনি বরং সুযোগ হলে মাঝে মধ্যে আমেরিকা ঘুরে যাবার পক্ষপাতী। তার বেশি নয়।

চেকবিজ্ঞানী ও কবি মিরোস্লাভ হোলুব "চিরপ্রবাসী লেখকদের বিড়ম্বনা" বলতে কী বোঝাতে চান তা আমেরিকার স্থায়ী অতিথি আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিনকে দেখলে মোটামুটি মালুম হয়। এক সময়ে এই নির্বাসিত সোভিয়েত লেখককে নিয়ে বিশ্বময় কম মাতামাতি হয়নি। স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁকে কোনও কোনও পশ্চিমি মহল, বিশেষ করে আমেরিকা ব্যবহারও করেছে দেদার। কিছুকাল আগে সলঝেনিৎসিন পশ্চিমি জীবনে কায়েম জড়বাদের সমালোচনা করায় তাঁর আশ্রয়দাতা

আমেরিকারই নামজাদা লেখক-ভাবুকরা মহা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আর্চিবলড ম্যাকলীশও ছিলেন তাঁদের দলে। তারপর থেকে সলঝেনিৎসিন মোটের ওপর রেগে গেছেন। চুপচাপ আছেন। গায়ে পড়ে আর কিছু বলতে চাইছেন না তিনি। তাঁকে লোকে ভুলে যায়নি বটে, কিন্তু তাঁকে ঘিরে গণ মাতামাতির দিনও বোধহয় গত। সলঝেনিৎসিন এখন কী ভাবছেন, কী লিখছেন এসব নিয়ে তেমন কোনও আলোচনাও শোনা যায় না, কাগজপত্রে তেমন কোনও লেখাও চোখে পড়ে না। তবে, সলঝেনিৎসিন সম্পর্কে একটা খবর সম্প্রতি পাওয়া গেল। রাষ্ট্রপতি রেগান সলঝেনিৎসিনকে শ্বেতভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আরও কয়েকজন সোভিয়েত-বিরোধী নির্বাসিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সলঝেনিৎসিনও শ্বেতভবনে এসে দুপুরের আহারটা রেগান-সাহেবের সঙ্গে সারবেন, এই ছিল পরিকল্পনা। আসল খবর কিন্তু এটা নয়। আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিন ঐ সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণে নারাজ, এটাই হল আসল খবর। ৬৩ বছর বয়সী রুশ লেখক ও ভাবুক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে এই নেমন্তন্নটা, তাঁর মতে প্রতীকী। এবং এই ধরনের প্রতীকী ভাবসাবে তাঁর আস্থা নেই। রেগানকে একটি চিঠি লিখেছেন তিনি। লিখেছেন : "আমার জীবনের আর যতোটা বাকী আছে, তাতে প্রতীকী ভাবভঙ্গিমার জন্য সময় রাখার সাধ্য আমার আর নেই। গভীর মত বিনিময় সম্ভব—এমন কোনও পরিবেশে আপনার সঙ্গে বসে কাজের কথা বলতে আমি অবশ্যই প্রস্তুত। নিছক পোশাকি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমি প্রস্তুত নই।"

রনালড্ রেগান যেহেতু আশ্রয়দাতা দেশের রাষ্ট্রপতি আর সলঝেনিৎসিন যেহেতু এ দেশে আশ্রিত, সেহেতু রেগান নেমন্তন্ন করলেই সলঝেনিৎসিন বিগলিত হয়ে, চুলদাঁড়ি আঁচড়ে বাবু সেজে বাধা পুষ্যির মত পাত পেড়ে খেতে যাবেন—এটা যে কোনও মতেই চলে না, রুশ লেখক প্রবর সেটা আস্তিন না-গুটিয়েও সোজা সাপটা বুঝিয়ে দিতে পারলেন। কিন্তু রেগানের মতো সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ (অভিনয় থেকে শুরু করে দেশশাসন ও বিদেশ নীতি পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে) শুধু ভোটে সফল, তাও আবার কেবল নেগেটিভ ভোটে জয়ী এক ব্যক্তির সঙ্গে সলঝেনিৎসিনের মতো একজন সার্থক লেখকের "কাজের কথা" যে কী এমন থাকতে পারে, দুজনের মধ্যে 'গভীর মত বিনিময়' যে কী করে সম্ভব তা ঠিক বোঝা গেল না। আমরা যারা সলঝেনিৎসিনের ফাস্ট সার্কল ক্যানসার ওয়ার্ড বা গুলাগের শরণার্থী এবং রেগানের আধা বোম্বেটে আধা অর্বাচীন রাজনীতিতে সন্ত্রস্ত—সেই আমাদের কাছে এই "কাজের কথা" আর "গভীর মত বিনিময়" এক গভীর রহস্য। সলঝেনিৎসিনের মতো একজন লেখকের কাছেও এটা রহস্যময় ঠেকার কথা। অথচ আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেবার ফাঁক রেখেও একটা খোঁড়া অজুহাতের গোস্পদে কত সহজেই ডুবে গেলেন। এই আপাত অকারণ আত্ম নিমজ্জনেও তিনি যদি থামতেন তাও না হয় একটা কথা ছিল। সলঝেনিৎসিন আরও খানিকটা তলিয়ে গিয়ে তাঁর চিঠির শেষের দিকে

লিখে বসলেন : আপনার কাজকর্মের অনেকগুলো দিকই আমি তারিফ করি। এবং যুক্তরাষ্ট্র যে শেষমেশ আপনার মতো একজন রাষ্ট্রপতিকে পেয়েছে তাতে আমি আনন্দিত আর আপনি যে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাননি এ জন্য আমি বিধাতার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ।'' লেখাটুকু পড়লে হঠাৎ মনে হতে পারে যে এটা স্রেফ রসিকতা। এ ধরনের কথা কেউ আক্ষরিক অর্থে লিখতে পারে, বিশেষ করে আমেরিকায় থেকে সবকিছু দেখে শুনেও লিখতে পারে তা ভাবতেও কষ্ট হয়। কিন্তু মুশকিল হলো, যাঁরা কলম থেকে এই মধুর উক্তিটি বেরিয়েছে তিনি স্বয়ং আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিন। সিরিয়াস গোছের লোক। রসিকতা টসিকতা তিনি সচরাচর করেন না।

আশির নির্বাচনে জেতার পর থেকে রেগান সাহেব কতগুলো অমানবিক কাজে একধার থেকে মদত দিয়ে গেছেন, লাতিন আমেরিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকার গণনিপীড়ক আর গণ ঘাতকদের কীভাবে মার্কিনি স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন, কীভাবে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে মারাত্মক ঠান্ডা লড়াইটা আবার চাগিয়ে তুলেছেন এবং পশ্চিম ইউরোপের কাঁধে বন্দুক রেখে 'সীমিত পরমাণু যুদ্ধের' তাল ঠুকেছেন, কীভাবে তিনি নিজের দেশে সমাজকল্যাণ মূলক বরাদ্দ টাকা কেটে দরিদ্রদের পথে বসিয়ে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া কমিয়ে, বেকারদের সংখ্যা বাড়িয়ে আরও অ্যাটম বোমা আরও বোমারু বিমান তৈরির পিছনে কোটি কোটি ডলার ঢালছেন (তালিকাটা আরও বাড়ানো যায়) সেটা দেখতে ও বুঝতে হলে নোমচমস্কির মতো বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ হবার দরকার নেই। এ হেন রেগানের কাজ কর্মের অনেকগুলো দিকই সলঝেনিৎসিন ''তারিফ করেছেন'' এবং যে আমেরিকার অসংখ্য মানুষ জিমি কার্টারের ওপর আস্থা হারিয়ে রেগানকে ক্ষমতায় এনে হাত কামড়াচ্ছেন, এই আমেরিকা এখন রেগানের অধীন বলে সলঝেনিৎসিন আনন্দিত এসব কথা জানার পর সলঝেনিৎসিনকে সন্দেহ না করে কোনও উপায় থাকে না। তাঁর বয়েস এখন তেষট্টি। কাজেই তাঁকে বাহাত্তুরেও বলা চলে না। তাহলে ব্যাপারটা কি? মানবাত্মার মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে যে লেখক স্তালিনি জুলুমবাজি আর বিপ্লবের নামে বিভিন্ন অনাচার অত্যাচারের মুণ্ডুপাত করতে করতে এত বছর কাটিয়ে দিলেন, তিনি এবার গুণকীর্তন করার আর লোক পেলেন না জগৎ সংসারে? এটা ভাবতেও কেমন অস্বস্তি হয়। অস্বস্তিটা এমনই বেয়াড়া ধরনের যে শেষকালে মনে হতে থাকে : শ্বেতভবনের পোলাও কালিয়াটা খেয়ে এলেই পারতেন সলঝেনিৎসিন। কে বলতে পারে, রেগানের মতো একজন গুণীর সঙ্গেই হয়তো তাঁর ''গভীর মতবিনিময়'' সম্ভব। এবং ঐ পরিবেশেই।

চেক বিজ্ঞানী ও কবি মিরোস্লাভ হোলুব স্বদেশে তাঁর হাজার অসুবিধে সত্ত্বেও কেন আমেরিকায় পাকাপাকি ঠাঁই নিতে নারাজ, ''চিরপ্রবাসী লেখকের বিড়ম্বনা'' বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা সলঝেনিৎসিনের অবস্থা ও মানসিকতা বিবেচনা করলে দিব্যি বোঝা যায়। অবশ্য রেগানকে লেখা সলঝেনিৎসিনের চিঠি

থেকে এই ধীমান রুশ লেখকের ব্যক্তিগত রাজনীতি ও জীবনদর্শন সম্পর্কেও মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায়। এটা আমাদের উপরি লাভ।

একদিকে আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিন, যিনি আমেরিকায় আশ্রিত। আর অন্যদিকে অপর কজন লেখক ও শিল্পী যাঁদের জন্ম আমেরিকায় যারা আমেরিকান। মাঝখানে রাষ্ট্রপতি রেগান ও তাঁকে ঘিরে কিছু প্রশ্ন। রেগান যখন জুন মাসে ইউরোপ যান, পশ্চিম জার্মানির "ভীৎসাইট্" পত্রিকা তখন এইসব মার্কিনি লেখকের কাছে কিছু রাজনৈতিক প্রশ্ন রাখেন। প্রশ্নগুলো ছিল : (১) আজ যদি যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়, আপনি কি তা হলে রেগানকে ভোট দেবেন? (২) রেগন-সরকারের স্বরাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আপনার সবচেয়ে বড়ো নালিশ কী? (৩) রেগান-সরকারের বিদেশনীতি সম্পর্কে আপনার কোথায় সবেচেয়ে বেশি আপত্তি?

ঔপন্যাসিক উইলিয়াম স্টায়রন বলেন : (১) না, কখনই না। (২) আমার দেশের মানুষের সামনে যে সামাজিক চাহিদা, যে সামাজিক অবিচার, যে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমি রেগানের স্বরাষ্ট্রনীতিকে বিশ্রীরকম বেমানান মনে করি। কোনওরকম বাছবিচার ছাড়াই আমি এই নীতির বিরোধী। (৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপরীতে রেগান-সরকারের বিদেশনীতি বড্ড অনমনীয়। এটা ঠিক যে সপ্তাহ দুয়েক আগে রাষ্ট্রপতি রেগান জানিয়েছেন যে পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি। (জুন মাসের গোড়ার দিকে স্টায়রন এ-কথা বলেছেন—লেখক।) কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপরীতে রেগানের নীতি এতই অনমনীয় যে কোনও ধরনের নিরসরতরীকরণই আদতে কোনও সুযোগ পাবে বলে আমার মনে হয় না।

ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার জেমস বল্ডউইনের উত্তর (১) না (২) সংখ্যালঘুদের প্রতি এক ভয়ানক নির্মমতা, দরিদ্রের প্রতি এক মারাত্মক কঠোরতা, আঁসিয়াঁ রেজিমের কায়দায় বড়লোক আর ক্ষমতাবানদের নিয়ে নাচানাচি। (৩) রাষ্ট্রপতি রেগান মনে করেন পৃথিবীটা তাঁর নিজের সম্পত্তি।

নাট্যকার আর্থার মিলারের উত্তর : (২) না। (২) ফালতু অর্থনৈতিক কর্মসূচী, যার একমাত্র আশা হলো যে বড়ো বড়ো কোম্পানির লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে সে আরও চাকরির সংস্থান করতে পারবে, মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারবে। (৩) রেগানের বিদেশনীতি সোভিয়েত বিরোধিতার নাগপাশে বন্দী। যার পরিণামে সোভিয়েত সরকারের যাবতীয় উদ্যোগকে সে পায়ে ঠেলে এবং নিজের দিক থেকে খালি বিরূপ সাড়া দেয়। তবে এই নীতিই বলুন আর অন্য যে নীতিই বলুন নিজের দেশে যেখানে প্রতি ১০০ জনে ১০ জন বেকার সেখানে কোনও নীতিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা শুধু একটা উদাহরণ দিলাম।

সংগীত রচয়িতা জন কেজ বলেন : (১) আমি কোনও লোককেই ভোট দেব না। আমাদের পৃথিবীটাকে বিভিন্ন জাতীয় সরকারে ভাগ করার বিরোধী আমি। (২)

বড়লোক আর গরিবের মধ্যে ফারাক আরও বাড়ছে। আর নিঃসম্বল মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা কেউ কানেই তুলছে না। (৩) দেশে দেশে বিভেদ বাড়ছে। আর আমাদের এই দুনিয়ার আসল সমস্যা যেগুলো সেগুলোর সমাধানের কোনও চেষ্টাই হচ্ছে না।

লেখিকা মেরি ম্যাকার্থির উত্তর : (১) না। (২) বেবাক অনুভূতিহীন, ম্যাড়ম্যাড়ে, অবাস্তব। (৩) একই আপত্তি। অর্থপূর্ণ কোনও রাজনীতির চিহ্নমাত্র নেই। স্বরাষ্ট্রনীতিতেও নেই পররাষ্ট্রনীতিতেও নেই। কেবল লোক দেখানো আড়ম্বর।

# জর্জ ষ্টাইনার

জর্জ ষ্টাইনার মূলত সমালোচক ও প্রবন্ধকার। কাহিনিকার বলে লোকে তাঁকে চেনে না। মার্কিন নাগরিক তিনি। থাকেন কিন্তু ইংল্যাণ্ডে আর জেনিভায়। কেমব্রিজে আর জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। আমাদের দেশে বোধহয় "ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড সাইলেনস্" নামে তাঁর বইটার জন্যেই ষ্টাইনার সবচেয়ে খ্যাত। যতদূর মনে পড়ছে এই কয়েক বছর আগেও ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা তাঁর সাহিত্যসমালোচনার একটা বই কলকাতার একটি চায়ের দোকানে দেখেছি। এ হেন জর্জ ষ্টাইনার বলা নেই কওয়া নেই একটা উপন্যাস লিখেছেন। নাম : "দ্য পোর্টেজ টু সান ক্রিস্তোবাল অফ্ এ, এইচ"। একে তো শিল্পসাহিত্য সমালোচক ষ্টাইনার হঠাৎ উপন্যাসে হাতে দিয়েছেন—এটা সিরিয়াস পাঠকদের কাছে জোর খবর। তার উপর "এ, এইচ"-এই অক্ষর দুটোর রহস্য। তেমন কোনো পাঠককে যদি শুধু এই নামটুকু বলা হয় তো ভেতরে ভেতরে তিনি মহা ফাঁপরে পড়বেন। সান ক্রিস্তোবাল নিশ্চয়ই কোনও জায়গার নাম। এই যেমন সানফ্রানসিসকো বা সান হোজে। কিন্তু 'এ.এইচ' ব্যাপারটা কী? শুনলেই মন বলে কারও নাম। অ্যালফ্রেড হিচকক? নাকি অবিনাশ হালদার? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নাৎসিদের নিয়ে বিস্তর গল্প লেখা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ছবি হয়েছে। আজও হচ্ছে। রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নৈতিক গবেষণাও নেহাত কম হয়নি। জর্জ ষ্টাইনার নিজেই জাতীয় সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ নিয়ে

অনেক চর্চা করেছেন। লিখেছেন। "ভাষা ও নীরবতা" নামে তাঁর ডাকসাইটে প্রবন্ধ সংকলনের এখানে ওখানে তার নজির ছড়ানো। অন্যান্য গ্রন্থেও থেকে থেকেই ফিরে গেছেন তিনি এই বিষয়টার দিকে। ষ্টাইনারের ভাবনায় কয়েকটা স্থির বিষয় আছে। নাৎসিবাদ ও তার মনস্তত্ব। সেগুলোর অন্যতম এ.এইচ। আডলফ্ হিটলার।

"দ্য পোর্টেজ টু সান ক্রিস্তোবাল অফ্ এ. এইচ্"-এর নায়ক ৯০ বছরের বৃদ্ধ হিটলার। নাৎসিশিকারীরা ব্রাজিলের এক জঙ্গলে আত্মগোপনকারী বৃদ্ধ হিটলারকে ধ'রে ফেলেছেন। সত্তরের দশকে। এবারে তাঁকে বিচারের জন্য "সভ্যজগতে" ফিরিয়ে আনা হবে। এই কল্পকাহিনির এটাই হচ্ছে মূল বিষয়।

বইয়ের প্রথম পাতাতেই হিটলার ধরা পড়ে গেছেন। কাজেই সাসপেন্সের তেমন বালাই নেই। কাহিনিতে টানাপোড়েন বলতে যেটুকু তা বিশ্বের বিভিন্ন সরকার এই বৃদ্ধ বন্দীকে কীভাবে যে-যার মতো বাগাতে চেষ্টা করছেন তাই নিয়ে। ব্রাজিলের জঙ্গলটা কনরাডের "হার্ট অফ্ ডার্কনেস"-এর কথা মনে আনে। দুর্গম যে আদিম পরিবেশে হিটলার এত দিন লুকিয়েছিলেন, সেটা তাঁর কৃতকর্মের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঘন রহস্যে ঘেরা এই জঙ্গল থেকে তাঁকে টেনে বের করে আনার অর্থ যেন ইতিহাসভোলা এক মানবসমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো : আধুনিক পৃথিবীর পয়লা নম্বর গণঘাতকের বিচার আজও হয়নি। বাস্তবের হিসেবে, হিটলারের ক্ষেত্রে অন্তত, সে-বিচার হতেও পারে না। যেহেতু বাস্তবের হিটলার বহুকাল আগেই আত্মঘাতী। তবে, জর্জ ষ্টাইনার লিখেছেন কল্পকাহিনি। গল্পের গরু গাছে চড়ে। গল্পের হিটলার চড়েন কাঠগড়ায়। আর লোলচর্ম বৃদ্ধ হিটলারের মুখে কিছু কথা জোগানোর দায়ে মার্কিন মুলুকের সাহিত্যমশানে লেখক ষ্টাইনারকে চড়ানো হয় শূলে।

জর্জ ষ্টাইনারের উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে আমেরিকার সাহিত্যসমালোচক আর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে হালে যে শোরগোল পড়ে গেছে তা থেকে এ-দেশের হালফিল বুদ্ধিবৃত্তির একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। একদল সমালোচক তাঁদের আলোচনার শুরুতে ধরেই নিয়েছেন যে এটা ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁদের বোধহয় খেয়ালই হয়নি যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে গল্প ফাঁদলেই যে সেটা ঐতিহাসিক হবে তার কোনও মানে নেই। বস্তুত শুধু ব্যক্তিমানুষকে নিয়ে ইতিহাস লেখা হয় না। ঘটনার পরম্পরা তার পরতে পরতে সামাজিক-অর্থনৈতিক সূত্র এবং তারই প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা—শিথিলভাবে বলতে গেলে এই হল ইতিহাসের বিষয়। কোনও লেখক যদি ইতিহাসে-নামজাদা কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসেন তো সেই ব্যক্তি কোন যুগের মানুষ, সেই যুগে কী কী ঘটেছিল এবং কোন কোন কারণে, সে যুগের বৈশিষ্ট্য কী, লোকগুলোই বা কেমনধারা ছিল, তারা কী খেত পরত করত এতগুলো ব্যাপার তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে। তা না হলে উপন্যাসটিকে "ঐতিহাসিক" বলা যাবে না। "গেটস অফ ইডেন : আমেরিকান কালচার ইন দ্য সিকসটিজ"-গ্রন্থের মননশীল লেখক মরিস ডিকস্টাইন

নিউ ইয়র্ক টাইমসের ক্রোড়পত্রে ষ্টাইনারের উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করতে বসে ধরেই নিয়েছেন যে "দ্য পোর্টেজ টু সান ক্রিস্তোবাল অফ এ. এইচ" ঐতিহাসিক উপন্যাস। বলছেন গেয়র্গ লুকাচ ঐতিহাসিক উপন্যাসের যেসব মৌলিক সূত্র বেঁধে দিয়ে গেছেন ষ্টাইনার সেগুলোকে উপেক্ষা করেছেন। কারণ লুকাচ বলেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস যদি লিখতে হয় তো মাঝারি ধরনের কোনও চরিত্রের দিকে তাকাও। দার্শনিক হেগেল যাকে বলেছেন "বিশ্ব-ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি সেরকম কোনও মানুষকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যমণি করে তোলায় লুকাচের আপত্তি। জর্জ ষ্টাইনার তাঁর উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন হিটলারকে। মাঝারি ধরনের ঐতিহাসিক চরিত্র একে কোনওমতেই বলা যায় না। অতএব ষ্টাইনারের উপন্যাসে বিসমিল্লায় গলদ দেখতে পাচ্ছেন সমালোচক ডিকস্টাইন ও তার অনুসারীরা।

ষ্টাইনারের উপন্যাসে "এ.এইচ" অর্থাৎ আডলফ্ হিটলার মূল চরিত্র হলেও হিটলারের যুগে, সে যুগের ঘটনাধারা, জার্মানি ও ইউরোপের তৎকালীন ইতিহাস, নাৎসিবাদের জন্ম ও তার সামাজিক-অর্থনৈতিক সূত্র ইত্যাদির কোনও উল্লেখই সেখানে নেই। জর্জ ষ্টাইনার যিনি ইতিহাসবেত্তা ও নাৎসিদের "দর্শন" ও কার্যকলাপে বিশেষজ্ঞ হিটলারকে নিয়ে কোনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে চাইলে তাঁর গল্পটা এভাবে সাজাতেন না। তাঁর কাহিনির গোড়ার কথাটাই স্রেফ আষাঢ়ে। হিটলার যে বেঁচে আছেন এবং ব্রাজিলের এক দুর্গম জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়েছেন-এই চিন্তাটাই আজগুবি। আষাঢ়ে গপ্পো ঐতিহাসিক উপন্যাসের বুনিয়াদ হতে পারে কী?

আসলে "দ্য পোর্টেজ টু সান ক্রিস্তোবাল অফ এ. এইচ"-উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিতে চেষ্টা করা এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে তার গলদ কোথায় সেটা দেখাতে চেষ্টা করা বৃথা। ষ্টাইনার যে উপন্যাস লিখতে চেয়েছেন তা ঐতিহাসিক নয়। নৈতিক। আর এই সহজ কথাটাই আমেরিকার সাহিত্য সমালোচকরা বলে উঠতে পারছেন না।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জর্জ ষ্টাইনার বলেছেন তাঁর বিশ্বাস শিল্পকর্ম ভাষায় রূপকের মতো সবচেয়ে গুরুতর ও জটিল প্রশ্নগুলো রাখতে পারে। এমনভাবে যে দর্শক-পাঠক-শ্রোতা ঐসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেবার প্রেরণা পান। ষ্টাইনার বলতে চাইছেন প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে পাঠককে যতোটা জড়ানো যাবে, আলোচনায় যতোটা সরাসরি শামিল করা যাবে, গল্প-উপন্যাস লিখে সেটাই করা সম্ভব আরও সার্থকভাবে। ষ্টাইনারের এই উক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। এ-কথা আদৌ ধোপে টেকে কিনা সেটাও প্রশ্ন। তবে আপাতত যদি এই তর্কের মধ্যে না গিয়ে আলোচ্য উপন্যাসের প্রেক্ষিতে ষ্টাইনার এ-কথা কেন বলতে গেলেন তা খানিক ভেবে দেখা যায় তো মৌলিক একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে হয়তো বা। যা বোঝা যাচ্ছে সমালোচক ও প্রবন্ধকার হিসেবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জর্জ ষ্টাইনার এবার উপন্যাস লিখে তাঁর পাঠককে আরও বেশি আলোচনায় টেনে

আনতে চাইছেন। পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন জাগাতে চাইছেন। গুরুতর ও জটিল কিছু প্রশ্ন। এ-কথা নিজেই বলছেন তিনি।—তাই যদি হয় তো আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : আলোচনাটা কী নিয়ে? প্রশ্নগুলোই বা কী? তার উত্তরই বা কেমনধারা হবে?—আসুন কাহিনির বিষয়বস্তুটা আর একবার খতিয়ে দেখা যাক।

ব্রাজিলের এক জঙ্গলে আত্মগোপনকারী হিটলারকে একদল ইহুদী নাৎসিশিকারী সত্তরের দশকে পাকড়াও করেছেন। রহস্যময় ঐ জঙ্গল থেকে হিটলারকে এবার আমাদের পরিচিত দুনিয়ায় টেনে আনা হবে। বিচারের জন্য।—এই হল নাতিদীর্ঘ কাহিনিটির মোদ্দা কথা। কাহিনির শেষের দিকে জর্জ ষ্টাইনার হিটলারের মুখে বেশ লম্বা চওড়া একটা জবানবন্দী জুড়ে দিয়েছেন। বাস্তবের হিটলার যে ভাষণপটু ছিলেন এটা আমাদের জানা। শুধু লেকচার দিয়ে আর সেই সঙ্গে হাত পা নেড়ে মুখব্যাদান করে লোক ক্ষ্যাপানোয় তাঁর জুড়ি ছিল না। সত্যি বলতে হিটলার আছে অথচ লেকচার নেই-এটা ভাবাই যায় না। "দ্য পোর্টেজ টু সান ক্রিস্তেবাল অফ্ এ.এইচ"-এ হিটলার মানে গল্পের হিটলার ধরা পড়লেনই যখন এবং তাঁকে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টাও যখন হল তখন, আসামী বিশেষ করে সে-আসামী যেহেতু হিটলার স্বয়ং-স্রেফ মুখ বুজে থাকবেন, নিজের পক্ষ নিয়ে কোনও কথাই বলবেন না—এটা ভাবা দুষ্কর।

বাস্তবের হিটলার তাঁর বিভিন্ন ভাষণে যে সব কথা বলেছেন তার সঙ্গে ষ্টাইনারের হিটলারের জবানবন্দীর মিল তেমন নেই। অমিলই বরং বেশি। এর প্রধান কারণ, হিটলারের জবানবন্দী জর্জ ষ্টাইনারের চিন্তা প্রসূত। মিল শুধু একটা মোক্ষম জায়গায়। আডলফ্ হিটলার বাস্তবিকই বলেছিলেন যে ইহুদীরা বিবেকের আবিষ্কর্তা। গল্পের হিটলারও একথা বলেছেন। তবে তিনি এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। জবানবন্দী দিতে গিয়ে হিটলার বোধহয় একটু বিদ্রূপ করেই বলেছেন : একটা জাতিকে কীভাবে আলাদা করে রাখতে হয়, কীভাবে তার শুদ্ধতা রক্ষা করতে হয়, সেই জাতির সামনে এক প্রতিশ্রুত স্বভূমির স্বপ্ন কেমন করে জিইয়ে রাখতে হয় এসব তিনি ইহুদীদের কাছ থেকেই শিখেছেন।

হিটলারকে দিয়ে এই কথাগুলো বলানোর জন্যেই আমেরিকার সাহিত্য সমালোচকরা জর্জ ষ্টাইনারের ওপর চটেছেন সবচেয়ে বেশি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ষ্টাইনার জন্ম সূত্রে নিজেও ইহুদী। তিরিশ দশকে তাঁর পরিবার নাৎসিদের তাড়া খেয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। ষ্টাইনার পরিবারের আদি বাড়ি অস্ট্রিয়ায়। জর্জ ষ্টাইনার নিজে যদি ইহুদী না হতেন তাহলে বোধহয় সমালোচকরা তাঁকে এককথায় ইহুদী বিদ্বেষী বলে দিতেন। বিশেষ করে যখন নিউ ইয়র্ক টাইমসের মত নামজাদা সব পত্রিকা ইহুদী শ্রেষ্ঠীদের হাতের মুঠোয় এবং বেশিরভাগ সমালোচনা কোনও না কোনও ইহুদী মালিকানাধীন পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে।

হিটলারের জবানবন্দীর সূত্রে যাঁরা ষ্টাইনারের ওপর বেশ একহাত নিচ্ছেন, তাঁদের

যুক্তি হল : হিটলারের মুখে এইসব বুলি যুগিয়ে লেখক নাৎসিদের জঘন্য অপরাধের যাঁরা শিকার, তাঁদের ওপরেই দোষের বোঝাটা পরোক্ষ ভাবে চাপাতে চেষ্টা করেছেন যেন। এই "চেষ্টাকে" বলেছেন তাঁরা বিকারগ্রস্ত। আর বলেছেন, এ কাহিনির হিটলার থুত্থুড়ে বুড়ো। নেহাতই অসহায়। অথচ তাঁর চিন্তা, তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা কী প্রখর। সব মিলিয়ে পাঠককে যেন হিটলারের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার প্ররোচনা দিচ্ছেন কাহিনিকার। পাঠককে মনে হয় ভজাতে চাইছেন ষ্টাইনার। এটা ঠিক যে, মোক্ষম কিছু হিটলারী ধ্যানধারণা (জাতীয় শুদ্ধতা, বিশেষ একটি জাতির প্রায় দৈবনির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব, সে-জাতির একাধিপত্ব ইত্যাদি) ইহুদীদের কাছ থেকেই শেখা—একথা হিটলারের মুখে শুনলে সন্দেহ হতে পারে যে, কথাটা যাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে সেই জর্জ ষ্টাইনারের অন্য কোনও গুঢ় অভিসন্ধি নেই তো? ভদ্রলোক প্রকারান্তরে ইহুদীদের প্রতি নিষ্ঠুর কটাক্ষ করছেন না তো?

গত বেশ কয়েক বছর ধরে ষ্টাইনার নাৎসিবাদ ও ফাসিবাদ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কথায় কথায় নাৎসিদের অপকীর্তি নিয়ে গপ্পো লেখা ও ছবি করাটা ফ্যাশন হয়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই তিনি তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা শুরু করেছেন। সমাজের কোথায় কোথায় মানব মনের, মগজের কোন কোন গলিঘুঁজিতে ফাসিবাদের সাপ ডিম পাড়ে, মানুষের চিন্তাধারার তাপমাত্রা কত হলে, সমাজে আগাছার পরিমাণ কত হলে সেইসব ডিম ফুটে অগুণতি সাপ বেরিয়ে পড়ে এ-নিয়ে আমাদের সমকালে যাঁরা নাগাড়ে ভাবনাচিন্তা করে চলেছেন, জর্জ ষ্টাইনার তাঁদের প্রথম সারিতে। জার্মান নাৎসিদের বাপান্ত করে সময় নষ্ট করেননি তিনি। যে-সমাজ নাৎসিবাদের জন্ম দিতে পারে সেই সমাজটা সম্পর্কে অর্থাৎ ঐ অপদর্শনের মূলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যেসব দ্বন্দ্ব আগেও ছিল এবং এখনও আছে সেগুলো সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন তিনি তাঁর পাঠককে চিরকাল। HOLOCAUST- এর হিড়িক পড়ার অনেক আগেই এই ধীমান সমালোচক তাঁর পাঠকদের বলেছিলেন : "যে সব লোক দিনের বেলায় অত্যাচার করেছে, শিশুদের ফাঁসিতে লটকেছে, তারাই আবার সন্ধেবেলা রিল্‌কের কবিতা পড়েছে, শুনেছে শুবার্টের সংগীত।"—তাই যদি হয় তবে কিসের সংস্কৃতি! ষ্টাইনারই বোধহয় প্রথম "সভ্যতা ও সংস্কৃতি" সম্পর্কে এই প্রেক্ষিতে ভয়ানক এক প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন : 'আমাদের ভুললে চলবে না যে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেনি।'—বেরিয়েছে তথাকথিত 'সভ্য" দুনিয়া থেকে।—না, নাৎসিদের বা হিটলারের সাফাই গাওয়ার মতো মানুষ ষ্টাইনার নন। "ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড সাইলেন্স" ও "ইন ব্লু বিয়ার্ডস কাসল" এর লেখক আশির দশকে ছোট একটা উপন্যাস লিখে এ যাবৎ তিনি যা যা বলেছেন তা নিজেই নস্যাৎ করতে চাইবেন, নিজে হাতে তাঁর যত্নে লালিত ধারণাগুলোর শ্রাদ্ধ করবেন-এতখানি অপচয় বিধি চট করে ঘটাবে কি?

জর্জ ষ্টাইনার তাঁর "ভাষা ও নীরবতা" বইটির জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় জার্মান পাঠকদের জন্য লিখেছিলেন :

"কোনও ইহুদী ও কোনও মানবতাবাদীর পক্ষে জার্মানিকে ক্ষমা করা অবান্তর। 'ক্ষমা' শব্দটা ব্যবহার করার অধিকার কারুর নেই। বিশেষ করে যিনি নিজে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা লাভ করেননি, তাঁর তো নেই-ই। বাস্তবে এমন সব ব্যাপার আছে, যেগুলো ঘৃণা বা ক্ষমার পক্ষে বড্ড বেশি বড়। কেবল একটা ব্যাপার কখনই ঘটতে দেওয়া উচিত নাঃ বিস্মৃতি। যাঁরা অত্যাচারিত, যাঁরা দগ্ধ, প্রতিটি বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ফের দ্বিতীয় বারের মতো মরেন।"

আমেরিকার সমালোচকরা আজ জর্জ ষ্টাইনারকে তাঁর উপন্যাসে হিটলারের জবানবন্দীর জন্য সাজা দিতে বসে ষ্টাইনারের আগেকার লেখাগুলোর সারকথা সন্তর্পণে অনুল্লেখিত রেখে দিয়েছেন। প্রবন্ধ বা আলোচনার চেয়ে এখন কাহিনি লিখে পাঠককে আরও সরাসরি সংলাপে, বিতর্কে সামিল করা যায়, আরও বেশি ভাবিয়ে তোলা যায় বলে আচমকা উপন্যাস লেখার যে যুক্তি ষ্টাইনার হালে এক সাক্ষাৎকারে দিয়েছেন, কি আশ্চর্য!-সেটাও কি-করে জানি আমেরিকার সমালোচকদের নজর এড়িয়ে গেছে। হিটলারকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার কাহিনির প্রায় পনেরো-আনায় বেজায় বাক্যবাগীশ প্রাক্তন ফ্যুরারকে বলতে-গেলে বোবা রেখে শেষের এক আনায় এক বৃদ্ধ শ্বাপদের দন্তহীন মুখে সোজাসাপটা বাহুল্যবর্জিত, আবেগশূন্য কিছু কথার পরম্পরা আনার কোনও প্রয়োজন ছিল কী ষ্টাইনারের? আজকের এই দুনিয়ায়? মার্কিন নাগরিক, ইহুদী লেখক জর্জ ষ্টাইনারের সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর স্বদেশের লেখক-ভাবুকরা এ-প্রশ্নের ধার দিয়ে যাননি। কারণ, গেলে দু-একটা ঝক্কি এসে পড়ে। নিগমবদ্ধ ধনতন্ত্রের দুর্গ মার্কিন মুলুকে এক বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর হাতে যখন লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের চাবিকাঠি, কংগ্রেস ও সেনেটের "পাত্রমিত্র-আক্কেল মক্কেলদের" প্রয়োজনে মুখ বন্ধ-করার, অন্যথায় মুখ-খোলনোর কলকাঠি, তখন ঝক্কিগুলো মারাত্মক বটে। যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত ইহুদীরা যখন সারা গায়ে হিটলারি জুলুমবাজির তিলক কেটে বছর বছর আর-এক জাতিকে এ-বেলা ও-বেলা কোতল করেন এবং মার্কিন সরকার যখন তাতে মদত দেন তখনও ভাবুকরা বোধহয় ঝক্কির কথা ভেবে মানবতার বিশেষ বিশেষ কিছু পল্লীতে প্রবেশ করতে চান না।

ইহুদী বিদ্বেষী না-হয়েও আজ ইহুদী স্বার্থের পীঠস্থান ইস্রায়েলের একটানা গুণ্ডামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায়। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কতো লক্ষ ইহুদীর প্রাণ গিয়েছে তা দুবেলা মনে রেখেও ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরের ওপর ইস্রায়েলি বোমাবাজির উপযুক্ত জবাব দেওয়া যায়। মার্কিনি সাহিত্য সমালোচকরা যখন জর্জ ষ্টাইনারের বিরুদ্ধে হিটলারের প্রতি বিকারগ্রস্ত সহানুভূতিশীলতার অভিযোগ আনছেন ঠিক সেই মুহূর্তে ইস্রায়েলি সৈন্যরা গিয়ে লেবাননের নিরপরাধ মানুষগুলোকে কচুকাটা করে আসছে।

''দ্য পোর্টেজ টু সান ক্রিস্তোবাল অফ্ এ. এইচ'' উপন্যাসে আমেরিকান লেখক জর্জ ষ্টাইনার, যাঁর পরিবার হিটলারি তাড়া খেয়ে তিরিশের দশকে নির্বাসনে যান, হিটলারের পুনর্মূল্যায়ন করতে যাননি, গণহন্তারকের হয়ে ওকালতি করতে চাননি, চাননি কোনও বিকৃত ইতিহাস লিখতে। ''তোমরা আমায় অনেক শিখিয়েছো'' : ইহুদীদের প্রতি কাল্পনিক এক হিটলারের এই উক্তির আলোয় চেয়েছেন তিনি আজকের দুনিয়ায় ইস্রায়েলের অস্তিত্বের অধিকারের নামে যা এ মুহূর্তে ঘটে চলেছে, সে-সম্পর্কে তাঁর পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগাতে। চেয়েছেন তাঁর পাঠকদের এক জরুরি আলোচনায় শামিল করতে। অনেক মার্কিনি লেখক যা চাইছেন না।

# আমেরিকার বই বাজার

সরস্বতী আর লক্ষ্মীর রুশ-মার্কিন সম্পর্কটা বহুকথনে সিদ্ধ। লোকে ধরেই নেয়, লক্ষ্মী প্যাঁচা যাঁদের কুটুম তাঁরা হয় কেনেন না অথবা কিনলেও সাজিয়ে রাখেন। আর সে প্যাঁচার কৃপা যাঁদের জোটেনি সেই হতভাগ্যের দল বই পড়েন। আমাদের গরীব দেশে অধিকাংশ মানুষের ওপর ঐ দুই দেবীর একজনেরও কৃপা দৃষ্টি পড়েনি। তাঁরা মোটামুটি নিরন্ন ও নিরক্ষর। তাই বলে অশিক্ষিত নন। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে শিক্ষার সমীকরণ যে ভয়ানক প্রশ্নসাপেক্ষ সেটা দুনিয়ার হালচাল দেখলেই মালুম হয়। বিশেষ করে যেসব দেশে নিরক্ষর মানুষ দেখতে গেলে নাকি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের শরণ নিতে হয়, সেইসব দেশের হালচাল।

ব্রেষ্ট্ সাহেব ভুখা মানুষকে বই হাতে নেওয়ার সুমন্ত্রণা দিলেও খিদে যাঁদের নিত্যসঙ্গী তাঁদের দেহমন দুটো ভাতডালের জন্যেই আনচান করে সারাক্ষণ, কেতাবের জন্যে ততটা নয়। বুভুক্ষা যেসব দেশ থেকে নাকি নির্বাসিত সে রকমেরই এক পশ্চিমি দেশে একবার দেখেছিলুম প্রকাশকরা দোকানে দোকানে পোস্টার লট্‌কে দিয়েছেন; "সাহস ক'রে বই পড়ুন"।—এ যেন ব্রেষ্ট্‌জবানের উল্টো-রামায়ণ। ইউরোপের সেই টাকাঅলা দেশে বেকারব্রিগেড তখনও লালফৌজের রূপ নেয়নি। প্রতিদিন খাবার ফেলা যাচ্ছে। এক-ফ্যাশনের জামা লোকে মাস দুয়েকের বেশি পরছে না। পয়সার ছয়লাপ। এক প্যাকেট সিগারেটের যা দাম তার সঙ্গে সামান্য কিছু

মুদ্রা জুড়ে দিলেই ভাল-হোক মন্দ-হোক একটা নতুন পেপারব্যাক জোটে। পুরনো বই তো আরও সস্তা। তার চেয়েও যা বড় কথা, পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার। বিনিপয়সায় দিব্যি পড়া যায় যতো খুশি, যা ইচ্ছে। অথচ লোকে পড়ছে না তাই সাহসে বুক বেঁধে বই পড়ার আহ্বান।

পূর্ব ইউরোপের এক দেশে গিয়ে দেখেছিলাম উর্দিপরা পুলিশও বই পড়ে। দেখেছিলাম ট্যাক্সিচালকের হাতের কাছেই এক পদার্থবিজ্ঞানীর লেখা দর্শনঘেঁষা বই। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের একটা লেখায় পড়েছিলাম, লোকে যাঁকে মহাজঙ্গি রাষ্ট্রনায়ক, ধুরন্ধর রাজনীতিক বলে জানে, সেই ফিদেল কাস্ত্রো সাহিত্যের অক্লান্ত পাঠক। শুনেছি নিকিতা ক্রুশ্চেভ যখন আমেরিকায় এসেছিলেন, কে যেন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কখনও এ-দেশে বোমা ফেলবেন কিনা। ক্রুশ্চেভ নাকি বলেছিলেন, 'বলেন কি মশাই, আমার নাতিনাতনি নেই? তাদের মার্ক টোয়েন পড়তে হবে না? আমি কি করে মার্ক টোয়েনের দেশে বোমা ফেলি।'—শোনা কথা। এককালে এই ক্রুশ্চেভই আবার গোগোল-চেকভ-গোর্কির দেশে লেখকদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে ছাড়েননি।

দুনিয়ার নেতারা কে কি ধরনের বই পড়েন বা পড়েন না তার একটা তালিকা পাওয়া গেলে বেশ হত। যেমন ইন্দিরা গান্ধী, বা দেং জিয়াও পিং কিংবা মার্গারেট থ্যাচার অথবা ইউরি আন্দ্রোপভ। গার্সিয়া মার্কেসের লেখায় দেখি কাস্ত্রো পড়ছেন হেমিংওয়ে। ভাবি শারণ বা বেগিন কি ফেয়ারওয়েল টু আর্মস পড়েছেন? ইয়াসের আরাফত কি বই পড়ার সময় পান? তুরস্কের প্রাক্তন নেতা বুলেন্দ এচেভিত শুনেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করেছেন। অধুনায় ভদ্রলোক গদিচ্যুত। ফ্রাঁসোয়া মিতেঁর বেশ কয়েকটা বই লিখেছেন জানি। তাঁর প্রিয় লেখক কে? মার্কিনি সাহিত্যিক গোর ভিদাল সম্প্রতি রনি রেগানের ওপর একটা দীর্ঘ নিবন্ধ লিখতে গিয়ে বলে দিয়েছেন যে মার্কিন নেতাকে কেউ বই পড়তে দেখেনি কোনওদিন। রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকাটাই নাকি তাঁর জ্ঞানের একমাত্র ভাণ্ডার। ভাবি, রেগানের হাতে যদি কেউ ফাদার এর্নেস্ত্রো কার্দেনালের লেখা কবিতার একখানা বই ধরিয়ে দিতো। মার্কিনকর্তা কি জানেন, নিকারাগুয়া নামে যে একরত্তি দেশটার সঙ্গে তিনি গোপনে যুদ্ধ করছেন তার নেতারা কেউ কবি, কেউ খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক? জন কেনেডি বা লিনডন জনসন কি কখনও হো চি মিনের কবিতা পড়েছিলেন?

বিশ্বময় বইপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। যে-দেশে বইয়ের ব্যবসা সরকারের হাতে, সে-দেশে দাম তবু কম। কিন্তু সবরকমের বই সেখানে পাওয়ার জো নেই। এ আর এক গেরো। অন্যদিকে বইয়ের ব্যবসা যেখানে ধনতন্ত্রের নিয়মে চলে সেখানে বইপত্রের যা দাম সে-আর কহতব্য নয়। উভয় সঙ্কট। প্রমথ চৌধুরী সেই কবে সখেদে বলে গেছেন, খ্যাতনামা লেখকদের বইও আজকাল কাটে বেশি পোকায়। পোকা মারার ওষুধপত্র যেখানে সুলভ সেখানে পোকার উপদ্রব থেকে না হয় বই

বাঁচানো গেল।—তারপর? পোকায় কাটলে তবু যা-হোক সদ্‌গতি হয়। আহা, কৃষ্ণের জীব। দুটো খেয়ে বাঁচে। কিন্তু যে বই পোকায় কাটে না, বাজারেও কাটে না সে-গ্রন্থের লেখক কি খেয়ে বাঁচবে?

মার্কিন মুলুকে বইয়ের বাজার বিশেষ ভাল যাচ্ছে না কিছু বছর যাবৎ। গোটা বাজারের দশাই সুবিধের নয়। একাশি-বিরাশির মন্দা (যার সূত্রপাত আসলে সত্তর দশকে) কার্টারোত্তর আমলের সরকারি বরাভয় সত্ত্বেও বণিক-বাকচাতুরিকে লবডঙ্কা দেখিয়ে সর্দপে এগিয়ে চলেছে চুরাশির দিকে। জিমি গেলেন, রনি এলেন। ভুখমিছিলে আরও কয়েক লাখ লোক যোগ দিলেন। শ্রেষ্ঠী স্বার্থ সমুন্নত হল। নতুন রাজার প্রসাদে বেচারামের কপাল প্রথমে খুললেও কেনারামের কপাল পুড়লো—ফলে আখেরে বেচারামেরও। শোধনবাদ কোথাওই তেমন রত্নজনয়িতা নয়। না সাম্যতন্ত্রে, না পুঁজিমহফিলে।

বইয়ের বাজার যেহেতু বৃহত্তর পুঁজিবাদের ভাড়াটে, সেহেতু বাড়িওলার কল অহোরাত্র নিরম্বু ঘড়ঘড় করায় ভাড়াটে প্রকাশকের কলে না-বাজে ভেঁরোঁ, না-বাজে পূরবী। জল পড়ে না। কিছুই পড়ে না। বরং ওঠে কিছু নাভিশ্বাস।

জীবজগতের মতো শিল্পসাহিত্যের জগতেও বোধহয় এক-ধরনের 'কণ্ডিশনিং' কাজ করে। সল বেলো বা নরম্যান মেলার একখানা নতুন উপন্যাস লিখেছেন শুনলে কিছু লোক আপনি ছোটে দোকানে। প্রকাশক ও বুক-অফ-দ্য-মান্থ-ক্লাবের সমবায়ে আইজ্যাক সিংগারের নতুন বইখানা আপনি ওঠে মার-মার কাট-কাট তালিকায়। প্রমথ চৌধুরী শুনলে খুশি হতেন যে বই শুধু পোকায় নয় নামেও কাটে। তবে আমেরিকায় নামের কাটতিও প্রধানত উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ। প্রকাশকদের ধারণা, ছোটগল্পের বাজার খারাপ। কবিতা আর নাটকেও রিসেশন। ফলে পাঠ্যঅপাঠ্য বই বলতে যা বেরোয় নিয়মিত তার বেশির ভাগটাই উপন্যাস।

পথেঘাটে বাসে ট্রেনে খেয়াল করলে দেখা যায়, দৈনন্দিন সফরে মানুষ ঠুকরে খাচ্ছে বেস্টসেলার। সাহিত্য-পদবাচ্য উপন্যাস কারও হাতে তেমন দেখি না। সাধারণ মার্কিনিদের হাতে হরহামেশা যে বইগুলোর দর্শন পাই সেগুলো সুপার মার্কেট বা পাড়ার মুদির দোকানের ক্যাশ কাউন্টারের পাশে র‍্যাক বোঝাই রাখা থাকে। বেস্টসেলার। তার মধ্যে সল বেলো, আপডাইক, রথ্ বা ম্যালামাডের স্থান নেই। তাছাড়া বেস্টসেলার মানেই নভেল, এই সংজ্ঞাটা শিরোধার্য করেও ঠিক বোধগম্য হয় না, চরম কাটতি নভেলের মহল্লা থেকে সিরিয়াস উপন্যাস নির্বাসিত কেন। সেগুলোকে বেস্টসেলারের মতো করে বাজারে ছাড়লে তাতে সিরিয়াস লেখকদের মর্যাদা হানি হবে, এ-জন্য কি? সেটাই বা হবে কেন? বইয়ের কারবার করে মুনাফা পেটা যাঁদের লক্ষ্য, তাঁরা লেখকদের মর্যাদা নিয়ে যতো না ভাবেন তার চেয়ে ঢের বেশি মাথা ঘামান লেখকদের কাটতি নিয়ে। টম স্পপার্ড বা হ্যারল্ড পিন্টারের কোনও নাটক অথবা গার্সিয়া মার্কেস বা হর্‌হে আমাদো বা ধরুন আপডাইকের কোনও

উপন্যাস যদি হ্যারল্ড রবিন্সের বইগুলোর মতো বিকোয় তাতে প্রকাশক বা গ্রন্থ পাটোয়ারদের কি এমন আপত্তি থাকতে পারে? পুঁজিবাদের ঘোর সমর্থক কোনও প্রকাশক যদি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা চে গুয়েভারার বই বেচে দুটো পয়সা করতে অরাজি না থাকেন তো হ্যারল্ড রবিন্সের পাশাপাশি ফকনার বা টোমাস মানের বই বেচতে তাঁর আপত্তি হতে যাবে কেন। সাধারণ পাঠক যদি নভেলপন্থীই হন তো তিন ডলার খসিয়ে একখানা সস্তা উপন্যাস কেনার চেয়ে স্টাইনবেক বা গ্রাহাম গ্রীনের কোনও উপন্যাস ঐ একই দামে কিনতে তাঁর অসুবিধেটা কোথায়? সকলকে যদি ঘাড় ধরে জয়েসের 'ফিনেগান্‌স ওয়েক' বা 'ইউলিসেস' পড়ানো হয়, অথবা প্রুস্ত—কিংবা ধরুন এরকম একটা আইন যদি হয় যে দুবেলা বেকেট্ না পড়লে হাজতবাস অনিবার্য তো তার বেলা গণপ্রতিবাদের যুক্তি মানবো না হয়। মুদির দোকানের গ্রন্থ পসরায় একশোটা বইয়ের মধ্যে পাঁচটা বইও যদি ফিনেগান্‌স ওয়েক গোছের হয় তো অনভ্যস্ত পাঠকের বিরক্তি মাননীয়। কিন্তু একশোর মধ্যে তিরিশটা বইও যদি ডাবলিনার্স গোছের বা মানের ম্যাজিক মাউন্টেন অথবা আপডাইকের র‍্যাবিট রান্ গোছের হয় তো তথাকথিত সাধারণ পাঠক কুপিত হবেন বলে মনে হয় না। জনতার সামনে সুসাহিত্য হাজির না-করাটাই জনতাকে অপমান, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার শামিল। বেস্টসেলারের সারিতে হেমিংওয়েকে দাঁড় করালে এবং সাধারণ মানুষ বাজার করতে গিয়ে সস্তায় একখণ্ড পেপারব্যাক 'স্নোজ অফ কিলিমাঞ্জারো' কিনে আপিস যাবার পথে সেটা পড়তে থাকলে তাতে লেখক পাঠক সাহিত্য প্রকাশক বিক্রেতা সকলেরই লাভ। মার্কিন মুলুকে বইয়ের বাজার দেখে মনে হয় না মুনাফাপিটনেওয়ালারা এ-লাভে আগ্রহী। আর সাধারণ পাঠকসমাজ? আবার সেই পাভ্‌লভীয় 'কণ্ডিশনিং' তত্ত্ব। উৎপাদন-মাধ্যম আর বাজার যাঁদের হাতে, সাধারণ পাঠক তাঁদেরই মর্জি আর কৌশলে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

কৌশলটা কোথায়? মার্কিনি বইয়ের বাজারে দুটো ভাগ আছে। একটার নাম "মাস মার্কেট", অন্যটা "ট্রেড"। নিউ ইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ প্রতি সপ্তাহে আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুটো উপ-বাজারের সংজ্ঞা লিখে রাখেন তাঁদের পেপারব্যাক বেস্টসেলার্স তালিকার শীর্ষে :

Mass Market paperbacks are soft-cover books sold at newsstands, variety stores and supermarkets, as well as in book stores.

Trade paperbacks are soft-cover books usually sold in book stores and at an average price higher than mass market paperbacks.

বেস্টসেলার তালিকায় নিয়মিত চোখ বোলালে, পত্রিকার স্টল, মনোহারী দোকান আর সুপারমার্কেটের গ্রন্থসম্ভার লক্ষ করলে এবং বইয়ের দোকানগুলোয় মাঝেমধ্যে হানা দিলে বোঝা যায় এই দুই সংজ্ঞার মর্ম কী।

ব্যবহারিক অর্থে, "মাস-মার্কেট-বই" হলো এ-দেশের আমজনতার জন্য, সাধারণ

পাঠকের জন্য, যাঁরা সচরাচর বই কিনতে 'বুকস্টোর' যান না, যান সুপারমার্কেটে বা হাঁটাপথের মুদির দোকানে।

আর যাঁরা বইপত্রের খোঁজে বুকস্টোরে যান এবং (নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংজ্ঞার কি মাহাত্ম্য) একটু বেশি দাম দিয়ে বই কেনার সামর্থ্য ও রুচি যাঁদের আছে, তাঁদের জন্য ট্রেড বই।

শ্রেণীসমাজের অবশ্যম্ভাবী ফারাক বইয়ের বাজারে ফাটল ধরিয়েছে। ধরিয়েছে পাঠক সমাজের মধ্যেও। এক ধরনের লোক থাকবেন যাঁরা বই বাবদ ধরা যাক প্রতি মাসে চারপাঁচ ডলারের বেশি খরচ করতে পারবেন না। সে সামর্থ্য তাঁদের নেই। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার মাস-মার্কেট তালিকা বিচার করলে দেখা যায় এ-সব বইয়ের গড়পড়তা দাম ৫ ডলার। ট্রেড বইয়ের গড় দাম সে-জায়গায় ৭ ডলার কি তারও বেশি। দু'ডলারের এই ফারাকটা এ-দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে অনেক—বিশেষ করে যখন, সাধারণভাবে দেখতে গেলে, ভাল বই পড়ার কোনও তাগিদ জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তোলে না সমাজ। যে সমাজ নিরঙ্কুশ বাণিজ্যভজনায় স্বীয় অস্তিত্বের যৌক্তিকতা খোঁজে, কথায় কথায় শুধু অবাধ বাণিজ্যকেই যে সমাজ গণতন্ত্রের একমাত্র মাপকাঠি ঠাওরায়, সে সমাজে সংস্কৃতি গৌণ ভূমিকা নিতে বাধ্য। এটা লক্ষণীয় যে মার্কিন সরকারের এবং পশ্চিমি দুনিয়ার বেশিরভাগ ধনতন্ত্রী সরকারের কোনও নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক নীতি নেই।

সাহিত্য বলতে লোকে যা বোঝে সেরকম বই বা ধরা যাক সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে লেখা সুপাঠ্য আলোচনাগ্রন্থ মার্কিনি 'মাস-মার্কেট' স্থান পাবে না। অর্থাৎ সাধারণ লোকে যেসব দোকানে নিয়মিত যায় সেইসব দোকানে এই ধরনের বইয়ের ঠাঁই নেই। সেখানে শোভা পাবে 'বেস্টসেলার'—সস্তা, বস্তাপচা রোমান্স, একঘেয়ে থ্রিলার-কাম-পর্নোগ্রাফি ও 'হরার'। সেইসঙ্গে রান্নার বই ইত্যাদি। সিরিয়াস বই পাওয়া যাবে 'ট্রেড-মার্কেটে'—অর্থাৎ বইয়ের দোকানে। মাস-মার্কেটের বই পড়ে যাঁরা অভ্যস্ত ট্রেড-মার্কেটের বই (অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) তাঁদের হজম হতে চাইবে না সহজে। তাছাড়া দামের ফারাকটা তো আছেই। অন্যদিকে, বুকস্টোরে গিয়ে পছন্দসই বই কিনে থাকেন যাঁরা, সুপারমার্কেটমার্কা বেস্টসেলার তাঁদের মনের চাহিদা মেটাবে না। এইভাবে বইয়ের বাজারে ও পাঠকসমাজে শ্রেণীভাগ হয়ে যায়।

সাধারণ পাঠক এ দেশে সাহিত্যের পাঠক নন, বেস্টসেলার-পাঠক, বইয়ের দাম তার একমাত্র কারণ নয়। অর্থাৎ ট্রেডমার্কা বই মাস-মার্কেটমার্কা বইয়ের চেয়ে দামে বেশি বলেই যে লোকে প্রথমটিকে এড়িয়ে চলে তা ভাবলে ভুল হবে। কেননা সাহিত্যিক হিসেবে যাঁরা গণ্য তাঁদের রচনার পেপরব্যাক সংস্করণগুলোর দাম বেস্টসেলারের দামের চেয়ে বেশি তো নয়ই, ক্ষেত্রবিশেষে এমনকি ডলারখানেক কম। বিশেষ করে উপন্যাস, ছোটগল্প ও কবিতার বই। আলোচনাগ্রন্থ বা গবেষণাগ্রন্থের

দাম অবশ্য সে-তুলনায় অনেকটা বেশি। এবং এ-ধরনের পেপারব্যাক বইয়ের দাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দিনেদিনে এতোই বেড়ে যাচ্ছে যে মগজের দাবি মেটাতে আর্থিক দিক দিয়ে শহীদ হতেও যাঁরা পরোয়া করেন না, জীবজগতের সেই বিপন্ন প্রজাতিও ইদানিং নৈরাজ্যের শিকার। কিন্তু পেপারব্যাক 'সাহিত্যের', বিশেষ করে উপন্যাসের দাম এখনও বেস্টসেলারের চেয়ে বেশি নয়। সুতরাং অর্থ এখানে মূল সমস্যা নয়। সমস্যার চরিত্রটা বরং সাংস্কৃতিক। এ-যুগের ধনতন্ত্রী সমাজ মানুষকে চিরখোকা করে রাখতে চায়। সে চায় সাধারণ মানুষ মনের দিক দিয়ে আজীবন অপরিণত থাকুক। পড়ুক সে কেবল সস্তা 'রোমান্স', 'থ্রিলার' আর 'হরার'। সাহিত্য?—সে তো এলিটশ্রেণীর বিচরণক্ষেত্র। জনতার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সাহিত্যচর্চা, মেধার চর্চা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘেরাটোপের মধ্যে অথবা তা সীমাবদ্ধ থাকবে বিশেষ একটি শ্রেণীতে। তার বাইরে রয়েছে মাস-মার্কেটের আমদরবার।

শ্রেষ্ঠীস্বার্থ, গ্রন্থপাটোয়ারচক্র এবং বই-বিপণন—এই তিনটি ব্যাপারের সমবায়ে মার্কিন মুলুকে যে গ্রন্থসংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে তার কিম্ভূতকিমাকার বৈশিষ্ট্যের চরম বিকাশ 'বুক-অফ-দ্য-মান্থ-ক্লাবে'। এই মাসিক গ্রন্থ সমিতিগুলো নামে বিভিন্ন হলেও আসলে কিন্তু এগুলো টাইমস ইনকর্পোরেটেডের মতো একটি বা দুটি কর্পোরেট সংস্থার শাখা। বই কেনার জন্য এখন আর দোকানে যাবার দরকার নেই—মুদির দোকানে, না বুকস্টোরে। কথাটা অবশ্য মোটামুটি সাধারণ পাঠকদের বেলা প্রযোজ্য। সে-কোনও সমিতির সদস্য হলে প্রথমে নামমাত্র দামে পছন্দসই (সমিতির নিজস্ব তালিকা থেকেই অবশ্য বইগুলো বেছে নিতে হবে) একাধিক বই পাওয়া যাবে। একটি শর্তে। ধরুন, দু'বছরে ঐ সমিতির কাছ থেকে অন্তত আটটি বই কিনতে হবে। এই আটটি বইও আবার সমিতির তালিকা থেকে বেছে নেওয়া দরকার। বাইরের কোনও তালিকা বা বিজ্ঞাপন দেখে সেইমতো অর্ডার দিলে চলবে না। অর্থাৎ পাঠক-ক্রেতার পছন্দ এখানে এক বা একাধিক গ্রন্থ-সমিতির পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভরশীল। মাসে অন্তত একবার এই সমিতিই পাঠিয়ে দেবে নানান বইয়ের তালিকা। সেখান থেকে বেছে নিয়ে ডাকে অর্ডার। ডাকেই বই চলে এল। দামও মেটানো হল ডাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, আয়োজনটা খারাপ কি। সমিতির তালিকায় অন্তত পঞ্চাশটা বইয়ের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কাজেই সদস্য-ক্রেতা মনমতো বই বেছে নেবার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটাই মনে হবার কথা। কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ, আগেই বলেছি, তালিকাটা পাঠকের তৈরি নয়, ঐ সমিতির তৈরি। ঐ সমিতি (যা আসলে একটি কোম্পানির বাণিজ্যশাখা) যেসব পেটোয়া প্রকাশকের (এইসব প্রকাশকও আসলে এই একই কোম্পানির আনুকূল্যে বা অর্থে পুষ্ট) যে যে বই বেচতে চান, কেবলমাত্র সেগুলোই স্থান পায় তালিকায় অর্থাৎ স্বার্থটা বিশুদ্ধ ব্যবসায়িক। এই ব্যবসায়িক স্বার্থ যে সাংস্কৃতিক অর্থে কতটা অবাস্তব হতে পারে তার একটা বড় প্রমাণ : দ্য লিটারারি গিল্ড।

'লিটারারি গিল্ড' নামটা শুনে প্রথমে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই সমিতি সাহিত্য ব্যবসায়ী। কিন্তু সভ্য সমাজে 'সাহিত্য' বলতে যা বোঝায় সে রকম কোনও বই এঁদের তালিকায় নেই। অধিকাংশ বই শক্ত-বাঁধাইয়ের বেস্টসেলার (রোমান্স, 'হরার'), রান্নার প্রণালী সংক্রান্ত, সঠিক পথ্য ও সরু কোমর-সংক্রান্ত, কেশচর্চা ও প্রসাধন বিষয়ক ইত্যাদি। অধুনায় মার্কিনি সাহিত্যিক ও লেখক হিসেবে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের একজনের বইও 'লিটারারি গিল্ড' রাখে না। একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া সবকটা বুক-অফ-দ্য-মান্থ-ক্লাব কেবলমাত্র শক্ত-বাঁধাই বই বেচে থাকে। ব্যতিক্রমের নাম "কোয়ালিটি পেপারব্যাক বুক ক্লাব।"। এই সমিতির নাম অতি বিভ্রান্তিকর। তালিকা মেলালেই বোঝা যায় যে কোয়ালিটি কথাটার সঙ্গে, এ ক্ষেত্রে, গ্রন্থের উৎকর্ষের কোনও সম্পর্ক নেই। এদের পসরাতেও রান্না, প্রসাধন, শরীরচর্চা ইত্যাদি বিষয়ক বইপত্রই দিনে দিনে সংখ্যাগুরু হয়ে উঠছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় চলে গেছে পিছনের সারিতে।

উল্লেখযোগ্য, রাজনীতি বিষয়টার অস্তিত্ব কোনও বুক-ক্লাবই তেমন স্বীকার করে না। এ-দেশের বা বিশ্বের যে কোনও দেশের বিতর্কিত বিষয়, অথবা পাশ্চাত্যের সমাজ-সংস্কৃতির সমালোচনা করে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই যেসব অসাধারণ বই নিয়মিত লেখা হচ্ছে, সেগুলো বুক-অফ-দ্য-মান্থ-ক্লাবের পসরায় পাওয়া যাবে না। বিতর্ক ও আলোচনা ব্যাপারটাই অনুপস্থিত। তবে পূর্ব ইউরোপিয় দেশগুলোর সমালোচনা করে লেখা বই এবং দেশত্যাগী তথাকথিত 'ডিসিডেন্টদের' লেখা বই এদের তালিকায় কালেভদ্রে চোখে পড়ে বৈকি। অর্থাৎ এখানেও শ্রেষ্ঠীস্বার্থ ও রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার সদ্ভাব। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, আমেরিকার 'বুক-অফ-দ্য-মান্থ-ক্লাব' একটা প্রচ্ছন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগ। সদস্য-ক্রেতাদের রুচি ও মানসিকতাকে একটা বিশেষ লাইনে, কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্যোগ।

আরও উল্লেখযোগ্য, মাসিক গ্রন্থসমিতি এখন ক্রমশ মনোহারী জিনিসপত্রেরও বিক্রেতা হয়ে উঠছে। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থতালিকার সঙ্গে চলে আসে অন্যান্য পণ্যের লিস্টি। বিজ্ঞাপন। এরপর হয়তো দেখা যাবে "লিটারারি গিল্ড" (এই নামটি বজায় রেখেই) স্নো-পাউডারের পসরা সাজিয়ে বসেছে, এবং উৎকৃষ্ট পেপারব্যাক বই বিক্রেতা মেলে ধরেছেন সুদৃশ্য ডিনারসেটের সম্ভার।—যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর পার্থিব-অপার্থিব কৌতূহলের শেকড় পাঠিয়ে দিয়েছেন রিডার্স ডাইজেস্টের কন্দরে, সে দেশে এটা সম্ভব বৈকি।

# আমেরিকার শিক্ষা জগৎ

"Modern society has achieved unprecedented rates of formal literacy, but at the same time it has produced new forms of illiteracy. People increasingly find themselves unable to use language with ease and precision, to recall the basic facts of their country's to make logical deductions, to understand any but the most rudimentary written texts. or even to grasp their constitutional rights."

**Christopher Lasch**
**(The culture of Narcissism)**

"Each and every day we are doing what we can, but it seems like a futile battle against overwhelming odds....I've never seen so many nonreading adults in my life."

**V. Harding, Director of Literacy Services, Wisconsin, USA**

আমরা গরীব দেশের লোক। দারিদ্র আমাদের সর্বাঙ্গে। এলুয়ারের কবিতায় সর্বত্র, সর্বাঙ্গে তার নাম লিখে চলে অবিরত। শত শত বছর ধরে যারা আমাদের শুষেছে, আজও শুষছে এবং আরও শুষতে চায়, সেই সায়েবরা আমাদের নাম রেখেছেন

''তৃতীয় বিশ্ব''। সরাসরি রাজদণ্ড ঘুরিয়ে, পাঙ্খাওয়ালার বিনিদ্র হাতে টানা পাখার হাওয়া খেতে খেতে যতোদিন তালুকদারি চালানো গিয়েছিল, ততোদিন প্রভুরা আমাদের আরও নানান খেতাবে সাজিয়েছেন : নেটিভ, নিগার, রায়বাহাদুর ইত্যাদি।

নেটিভ নিগার থেকে তৃতীয় বিশ্বে উত্তরণের পথে আমরা পেয়েছি কিছু বিশেষণের দেখা; উন্নত, উন্নতিশীল। উন্নয়নশীল বিকাশমুখীদের এককালে সোজাসাপ্টা অনুন্নত বলা হত। ও কাপে চুমুক দিতে গেলে ঠোঁটে ফোস্কা পড়ে, তাই কাপটাকে ঘরের তাপমাত্রায় এনে, রইয়ে সইয়ে নাম রাখা হয়েছে উন্নতিশীল বা উন্নয়নশীল। উন্নয়নের চেষ্টা করছি আমরা, আর আজকের দিনে উন্নতি কাকে বলে, উন্নত দেশ বলতে কোনগুলোকে বোঝায়—এসব ঠিক করে দিয়েছেন ওঁরা। ভারতবর্ষের ভূগোলের মতো আমরা সেটাও মেনে নিয়েছি। দারিদ্র্যের মতো মেনে নেওয়ার স্পৃহাও আমাদের সর্বাঙ্গে। আমরা মেনে নিয়েছি যে আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ—পৃথিবীর এইসব অঞ্চলগুলো হল গিয়ে উন্নত। এরা আমাদের আদর্শ। এদের হাতে সম্পদ আছে, তুণে আছে মারাত্মক অস্ত্র, যার দৌলতে, যার জাদুতে বণিকের মানদণ্ড রাত পোহালে রূপান্তরিত হয় রাজদণ্ডে। দিন পোহালে সেই রাজদণ্ডই ধরে ফের বণিকের মানদণ্ডের রূপ। এই মানদণ্ডে সবকিছু মেপে চলেছি আমরা। এখনও। মাপজোকের কাজটা আরও ভাল করে শিখে নিতে আমরা সায়েবদের দেশে যাই। তাঁরা আমাদের স্কলারশিপ দেন। এও এক ধরনের 'ডেভালাপমেন্ট এইড'—উন্নয়ন সাহায্য। এই ধরনের সাহায্য বোধহয় সবচেয়ে বেশি আসে মার্কিন মুলুক থেকে। সেখানে সবকিছু বেশি বেশি, বড়ো বড়ো। মার্কিনি সায়েবরা বড়ো বড়ো কারখানা বানিয়েছেন, বড়ো বড়ো জেলখানা বানিয়েছেন, বড়ো বড়ো খামার বানিয়েছেন, কারখানার মাল আর খামারের ফসল বেচার জন্য জগৎজুড়ে বড়ো বড়ো বাজার বানিয়েছেন, সেই বাজার হাতছাড়া হবার উপক্রম হলে বড়ো বড়ো যুদ্ধ বাধিয়েছেন ও আরও যুদ্ধের তোড়জোড় করছেন, বড়ো বড়ো হাসপাতাল বানিয়েছেন আবার বড়ো বড়ো অসুখ বানাতেও পিছপা হননি। তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী ছেলেমেয়েরা বড়ো বড়ো জিনিস শিখতে, ওদের বড়ো আর আমাদের ছোটোর মধ্যে তফাৎগুলো ঠিক কোথায় তা জেনে নিতে চলে আসেন স্কলারশিপ নিয়ে মার্কিন মুলুকে—বা আসার জন্যে হাপিত্যেশ করেন। তৃতীয় বিশ্ব শিখতে চায়। প্রথম বিশ্ব শেখাতে চায়। পরিস্থিতি যেখানে এরকম, সেখানে আমেরিকার শিক্ষাজগতের হালহকিকৎ কেমন তার খবর নিলে তৃতীয় বিশ্বের তাতে লাভই হবে। কারণ শেখার স্পৃহাও যে আমাদের সর্বাঙ্গে। দেখা যাক শেখা-শেখানোর জগতে মার্কিনিরা কি করছেন।

এ দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ছেড়ে বেরোনোর পর শিক্ষকতা করতে চাইছেন না বড়ো একটা। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিনে বেড়েই চলেছে। ফলে ১৯৯০ সাল নাগাদ শিক্ষকের একটা আকাল দেখা দেবে। এই আকালের পূর্বাভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৬৬ সালে যাঁরা হাইস্কুল চুকিয়ে কলেজে ঢুকেছিলেন, তাঁদের মধ্যে

শতকরা বাইশ জনের আদর্শ ছিল শিক্ষকতা। গত বছর হেমন্তে যাঁরা কলেজে নাম লেখান, তাঁদের শতকরা মাত্র ছ'জনের মধ্যে ঐ আদর্শ দেখা গেছে। বহু শিক্ষকদের সংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কমে যাচ্ছে তাঁদের শিক্ষার মান। ১৯৮২ সালে আমেরিকার ''স্কল্যাসটিক অ্যাপটিচ্যুড টেস্ট'-এ (সংক্ষেপে ''স্যাট'') হবু শিক্ষকদের ফলাফল ছিল বেদনাদায়ক। অঙ্ক আর ভাষাগত দক্ষতার যা গড়পড়তা মান, তাঁদের দৌড় দেখা গেছে তার একেবারে আশি পয়েন্ট তলায়। পূর্বোক্ত পরীক্ষার ফলাফলের দিক দিয়ে সারা আমেরিকা জুড়েই একটা সার্বিক অধঃপতন লক্ষ করার মতো। ১৯৬৭ সালে জাতীয় ভিত্তিতে গড় নম্বর ছিল ৯৫৮। গেল বছর ৮৯৩। শিক্ষক হতে গেলে এ-দেশে প্রথমে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয় একবার। পরীক্ষাটা নেহাতই প্রাথমিক পর্যায়ের। শেখানোর ক্ষমতা যেটুকু না-হলেই নয় সেটুকু অন্তত আছে কিনা তা যাচাই করার জন্যেই এই পরীক্ষা। ক্যালিফোর্নিয়ায় গত বছর সাত হাজার হবু শিক্ষক এই পরীক্ষায় বসেন। তাঁদের প্রতি তিনজনে একজন ফেল করেছেন।

আমেরিকার স্কুল শিক্ষকদের মনোবলও ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮১ সালে জাতীয় শিক্ষা সংস্থা দেশের ২২ লক্ষ শিক্ষকের মতামত যাচাই করেন। শতকরা ২৪ জন আফসোস করে বলেন যে পেশা বেছে নেবার আর একটা সুযোগ পেলে মাস্টারি করার কথা তাঁরা বোধহয় আর ভাববেন না। ১৯৬১ সালে এ হেন মন্তব্য করেছিলেন শতকরা ৮ জনেরও কম। সত্তরের দশকের শেষের দিকে জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ নতুন শিক্ষকদের ভাবগতিক লক্ষ করে দেখতে পান যে লেখাপড়ায় খুব ভাল ফল দেখিয়ে যাঁরা শিক্ষক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৬ জন তিরিশ পেরোনোর পরেও শিক্ষকতা করে যেতে চান। ছাত্র হিসেবে তেমন ভাল ছিলেন না এমন শিক্ষকদের মধ্যে সে-জায়গায় শতকরা ৬০ জন তিরিশের পরেও শিক্ষকতায় আগ্রহী।

স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা যে সুযোগ পেলেই অন্য চাকরি করতে চাইছেন তার প্রধান কারণটা আর্থিক। শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় পরিসংখ্যান কেন্দ্র হিসেব করে দেখেছেন যে শিক্ষকদের বর্তমান গড় মাইনে হল বছরে ১৭৬৪৪ ডলার। ১৯৭১ সালে মাইনে ছিল বছরে ৯২৬৯ ডলার। কিন্তু কথা হল, মাঝের এগারো বছরে ডলারের দাম কমেছে এবং অন্য সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে ও ক্রমশই বাড়ছে। সেই হিসেবে ১৯৭১-এর ৯২৬৯ ডলার আজ ২০১৬৮ ডলারের সমান। অর্থাৎ মুদ্রামূল্যের দিক দিয়ে শিক্ষকরা এখন আগের চেয়ে কম মাইনে পাচ্ছেন। ভবিষ্যতেও এর কোনও সুরাহা হবার আশা নেই। পরিসংখ্যান কেন্দ্র থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৯১ সাল নাগাদ শিক্ষকদের গড় মাইনে দাঁড়াবে বছরে ২০১১৩ ডলার। অর্থাৎ ১৯৭১ সালে যে মাইনে ছিল, আসল হিসেবে তার চেয়েও ৫০ ডলার কম। কোনও একটি বিষয়ে মাস্টার্স খেতাব পেয়ে বছর ছ'সাত স্কুলে পড়িয়ে এ-দেশের কোনও শিক্ষক এই মাইনেতে সংসার চালাতে রাজি হবেন কিনা, এবং রাজি হলেও সব মিলিয়ে তা

সম্ভব হবে কিনা সেটা একটা বড়ো প্রশ্ন বৈকি। আমেরিকার স্কুল শিক্ষকরা আজ যে মাইনে পাচ্ছেন তাতে কুলোচ্ছে না বলে অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন পার্টটাইম কাজ নিতে। গত বছর টেক্‌সাস রাজ্যে যতোজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁদের শতকরা ২৯ জনই শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে অন্য কাজ করছেন। ৮০ সালে এঁদের সংখ্যা ছিল শতকরা ২২। আরও ভাল মাইনের চাকরি খুঁজতে আমেরিকার স্কুল শিক্ষকদের দিল্লি-লাহোর যেতে হয় না। হাতের কাছেই খবর মেলে। শিক্ষকতা শুরু করেন তাঁরা বছরে গড়ে ১২৮০০ ডলারে। একজন অ্যাকাউন্টেন্ট সে জায়গায় পান ১৬২০০ ডলার। কম্‌পিউটার বিজ্ঞানীদের কর্মজীবন শুরু হয় ২০৩৬৪ ডলারে। মাস্টার্স ডিগ্রি থাকলে নতুন শিক্ষক ১৪০৭৯ ডলারেও শুরু করতে পারেন হয়তো। কিন্তু যেসব ইঞ্জিনিয়ারের ঐ খেতাবটা আছে, তাঁরা শুরুতেই পান আরও ১১০০০ ডলার। ফলে গণিত ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর খেতাব নিয়ে অনেক তরুণ তরুণী শিক্ষকতার ধার না মাড়িয়ে বরং আরও বেশি মাইনের চাকরি খুঁজছেন। গণিত ও বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ শিক্ষকরাও সকাল বিকেল কাগজের কর্মখালি পাতাটা লালনীল পেনসিলে দাগিয়ে চলেছেন। অন্য চাকরি মানেই বেশি মাইনে। কপাল ভাল হলে ডবল, নয়তো নিদেনপক্ষে দেড়া। ফলে সারা আমেরিকা জুড়ে এখনই স্কুলে স্কুলে গণিত আর বিজ্ঞান পড়াবার লোকের অভাব। যে হারে তাঁরা শিক্ষকতা ছেড়ে পগারপার হচ্ছেন এটা চলতে থাকলে আর দশ বছরের মধ্যে এ দেশের স্কুলে স্কুলে গণিত আর বিজ্ঞান পড়ানোর যোগ্যতাঅলা অন্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের তিন ভাগের এক ভাগই বহাল থাকবেন অন্য চাকরিতে। এ বিপদের পূর্বাভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে। কোনও কোনও জায়গায় সংকটটা এতোই তীব্র যে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে গণিত আর বিজ্ঞানের ক্লাস নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। পশ্চিম উপকূলের রাজ্যগুলোয় গণিত আর বিজ্ঞানের নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে শতকরা চুরাশি জন আসলে ঐ দুই বিষয়ের লোক নন। অভাব পুরণের জন্য তাঁরা কোনোক্রমে ঠেকা দিচ্ছেন।

স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা আর শিক্ষকমহলের অবস্থা যেখানে এইরকম, গোটা সমাজের অবস্থাটা যে সেখানে কিরকম হয়ে উঠতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়। ব্যাপক নিরক্ষরতার দিন পশ্চিমি দুনিয়া থেকে টলে গেছে বহু আগে। যদিও নিরক্ষতার অন্ধকারমাখা গলিঘুঁজি এখনও খুঁজলে পাওয়া যায় আলো-ঝলমল রাজপথের আড়ালে। মার্কিন আদম সুমারি দপ্তরের অভিমত হল, চোদ্দো বছর বয়সের পরেও যারা স্কুলের "ফিফথ্ গ্রেড" অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পুরো করতে পারেনি, তারাই হল গিয়ে নিরক্ষর। এই মাপকাঠিতে মার্কিন জনগণের শতকরা ১ ভাগেরও কম এই সামাজিক ব্যাধির শিকার। শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা কিন্তু এই মাপকাঠিটা মানতে রাজি নন। কারণ তাঁদের মতে, আমেরিকায় জীবন আজ যেরকম তাতে কাজের ধরন ক্রমশই আরও জটিল হয়ে উঠছে। এবং সমাজজীবনে একটা গঠনমূলক ভূমিকা

নিতে হলে শুধু নাম সই করতে জানা বা বিজ্ঞাপন পড়তে পারা অথবা এক থেকে একশো অবধি গুণতে পারাটাই যথেষ্ট নয়। মোটামুটি জটিল একটা লেখা পড়তে পারা, তার মূল অর্থটা ধরতে পারা এবং নিজের চিন্তাভাবনা লিখে প্রকাশ করতে পাবার ক্ষমতাটুকু এখন না থাকলে মুশকিল। এই ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদের নাম দিয়েছেন এঁরা "ফাংশানালি লিটারেট"। যাঁদের নেই তাঁরা হলেন "ফাংশানালি ইললিটারেট" ব্যবহারিক দিক দিয়ে, কার্যত নিরক্ষর। এবং আমেরিকার নিরক্ষতার বিষয়ে একেবারে হালফিল গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ-দেশের তিন কোটি দু'লক্ষ লোক ঐ দ্বিতীয় দলের। অর্থাৎ সমাজজীবনে গঠনমূলক কাজ করার কোনও ক্ষমতাই তাদের নেই। গবেষণাটা করা হয়েছে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের "অ্যাডাল্ট্ পারফরমেন্স লেভেল প্রজেক্টের" তরফে। এবারে ব্যবহারিক নিরক্ষরতার অনুপুঙ্খ খতিয়ান :

৫ কোটি ২১ লক্ষ আমেরিকান স্রেফ প্রাথমিক স্তরের হিসেবে নিকেশও করতে পারেন না। ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ লোক পড়তে পারেন না। ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক লিখতে পারেন না। ৪ কোটি ৮ লক্ষ মানুষ জানেনই না সরকারের অধিকারই বা কি আর তাঁদের নিজেদের অধিকারই বা কতোটুকু (এঁরাই কিন্তু এই গণতান্ত্রিক দেশে ভোটদাতা)। ইউ এস নিউজ অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট পত্রিকায় বলা হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনে যেটুকু লেখাপড়ার ক্ষমতা না থাকলেই নয়, আমেরিকায় মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ নাগরিকের সেটুকুও নেই। অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্কর মধ্যে আজ একজন কার্যত নিরক্ষর। আরও ৩ কোটি মানুষ ব্যবহারিক জীবনে সাক্ষরতা ও নিরক্ষরতার ধূসর সীমারেখায় বাস করছেন। হাইস্কুলে গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে শতকরা ১৩ জনের লেখার বা পড়ার ক্ষমতা আসলে ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত।

এই বিপর্যয় শুধু লোকসমাজের সাধারণ স্তরে ঘটে চলেছে তাই নয়। আমেরিকার ডাকসাইটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও কিছুদিন যাবৎ এই রোগে আক্রান্ত। ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগতদের মধ্যে শতকরা ৪২ জনকে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে বুনিয়াদী জ্ঞানের অভাবের দরুণ বিশেষ ক্লাসে পাঠানো হয়েছে। মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ে যতোজন ভর্তি হয়েছেন তাঁদের অর্ধেকই এই স্তরের। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত "দ্য কালচার অফ ন্যারসিসিজম্" গ্রন্থে এ দেশের এক অগ্রণী ইতিহাসবেত্তা ও সমাজসমালোচক ক্রিস্টোফার ল্যাশ লিখেছেন : "Every year, 40 to 60 percent of the students at the university of california find themselves required to enroll in remedial English. At Stanford, only a quarter of the students in the class entering in 1975 managed to pass the university's placement test, even though the students had achieved high scores on the Scholastic Aptitude Test."

এখন থেকে ঠিক একবছর আগে নিউ ইয়র্ক শহরে একটা পরিসংখ্যান নিয়ে

দেখা গিয়েছিল যে সেখানে ১৪ থেকে ২১ বছর বয়সীদের মধ্যে শতকরা ৮ জন বিলকুল নিরক্ষর। একেবারে সনাতন অর্থে। বেচারিরা না জানে পড়তে, না জানে লিখতে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শহর এলাকায় অবস্থা একই। এক নতুন সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, ছাপা লেখা পড়তে পারেন অথচ তার মানে ধরতে পারেন না এমন কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীদের সংখ্যা আমেরিকায় হইহই করে বেড়ে চলেছে। এই আধাখ্যাঁচড়া সাক্ষরতার চোট পড়ছে এখন আমেরিকার সর্বত্র—মায় সেনাবাহিনীতেও। ইউ এস নিউজ পত্রিকা সখেদে জানাচ্ছেন : "Instructional materials of the armed forces increasingly resemble comic books, with pictures and simplifed language used to assist recruits who have reading deficiencies. One Army manual has five pages of pictures to show a soldier how to open the hood on a truck."

সমাজের সর্বস্তরে এমন ভয়ানক অবস্থা হল কি করে—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানী আজ আমেরিকার টেলিভিশনটাকে দাঁড় করিয়েছেন আসামীর কাঠগড়ায়। টেলিভিশন এ দেশে দিবারাত্রির কাব্য। চাইকি ২৪ ঘণ্টাই টেলিভিশনের সামনে বসে থাকা যায়। লোকে খবর আর পড়ে না আজকাল। শোনে এবং দেখে। আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৫৫ জন এখনও রোজ কাগজে চোখ বুলোন। বাকিরা ও কারবার তুলে দিয়েছেন। বই পড়া? টেলিভিশন থাকতে বই কেন?

তাছাড়া, ভাল বই পড়ার অভ্যাসটা তৈরি করার বা একবার তৈরি হলে সেটা রাখার কোনও উৎসাহও এ সমাজে পাওয়া যায় না। "সাধারণ" পাঠকদের জন্য হুদো হুদো সস্তা বই ছাপা হচ্ছে। সেগুলো রুচি ও দাম দুদিক দিয়েই সস্তা। এসব বই বিক্রয় হয় মহাবিপণিগুলোয় আর পাড়ার ড্রাগস্টোরে। একটু ভাল মানের বই হলেই অমনি তার দাম বেশি। এত বেশি যে নেহাত গ্রন্থপ্রেমী না হলে লোকে সেসব বই যেচে কিনতে যাবে না। সস্তা এডিশানের পেপারব্যাক ভাল বই—সাহিত্যই বলুন আর অন্য কোনও বিষয়েই বলুন (আমাদের দেশে বই-এর দোকানে যেগুলো হরবখৎ দেখা যায়, এবং মুদ্রাস্ফীতির ঠ্যালায় এখন যেগুলো অগ্নিমূল্য)—এ দেশের সাধারণ দোকানে চোখে পড়ে না। এমনকি অনেক সাধারণ বইয়ের দোকানেও নয়। সাধারণ লোকে এ দেশে বই-এর দোকানে যায় না তেমন। দৈনন্দিন বাজার সওদা করতে বা সখের জিনিসপত্র কিনতে তারা যেসব দোকানে যায় সেখানে বইও থাকে। এগুলো বেস্টসেলার বা থ্রিলার বা আধাপর্ণোগ্রাফি। ট্রামে বাসে আসা-যাওয়ার পথে লোকে সময় কাটানোর জন্য এগুলোই পড়ে।

যাই হোক, বই-এর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এ-দেশে লেখাপড়ার অধঃপতনের মূল কারণ নয় বোধহয়। আসল কারণ বরং সরকারের সাংস্কৃতিক নীতি বা তার অভাব।

জাতিগত বৈষম্য, সামাজিক-অর্থনৈতিক অসমতা, ক্যাডিলাকের পাশেই চরম দারিদ্র, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার অভাব আর বিত্তশালী মার্কিনিদের ঔদ্ধত্য ও রুচিবিকার এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক। এ দেশের নেতারা অন্য দেশে বামপন্থী গণ-আন্দোলন আটকাতে, বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর বাজার সামলাতে এবং দুনিয়ার মানুষকে গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র সম্পর্কে লেকচার দিতে চিরকালই এত ব্যস্ত যে নিজেদের দেশে সাধারণ মানুষের অন্ধকার ঘোচানোর কথা এঁরা বড়ো একটা ভাবেন না। ক্রমবর্ধমান নিরক্ষরতা আর ব্যবহারিক অক্ষমতা রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার কালেভদ্রে আধাখ্যাঁচড়া অভিযান চালান। ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি লিনডন জনসন একটা 'অ্যাডাপ্ট বেসিক এডুকেশন প্রোগ্রাম'' হাতে নিয়েছিলেন। তখন হিসেব করে দেখা গিয়েছিল যে এ দেশের ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের বুনিয়াদী শিক্ষার মান এতোই নিম্নস্তরের যে তাঁরা হয় চাকরি পাচ্ছেন না, আর নয়তো হাতের চাকরি হারাতে বসেছেন। এঁদের যোগ্যতা বাড়ানোই ছিল জনসন সাহেবের লক্ষ্য। ৭০ দশকের শেষাশেষি দেখা গেল ৫ কোটি ৬০ লক্ষ অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত আমেরিকাবাসীর মধ্যে শতকরা মাত্র ৫ জন এই সরকারি উদ্যোগের প্রসাদ পেয়েছেন।

সেই ট্যাডিশন সমানে চলে আসছে। আর মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থার তহবিল কেটে অর্ধেক করে দিতে চান। সেই টাকায় বানানো হবে ক্ষেপণাস্ত্র, বোমারু বিমান, নিউট্রন বোমা—যার আঘাতে বই পোড়ে না, পোড়ে পাঠক।

# পারিশ্রমিকের বৈষম্য

বেশিরভাগ মানুষই চাকরি করে মাইনের জন্য। মাইনের টাকায় সংসার চালানোর দায় যদি মানুষের না থাকতো তাহলে অনেকেই বোধহয় চাকরি করতেন না, কাজ করতেন। কাজেই প্রধানত মাইনের জন্যেই চাকরি জিনিসটা জরুরি। তাছাড়া কে কত "বড়ো" চাকরি করে, কাকে কতটা দায়িত্ব নিতে হয়, কার পদমর্যাদা কতটা উঁচু—এসব সাধারণত বেতনেই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মাইনেই হল এ দুনিয়ায় গুরুত্বের, মর্যাদার মাপকাঠি। ধনতান্ত্রিক শ্রেণীসমাজে অবশ্য মাইনের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সেই সমাজের কাঠামোগত বিভিন্ন দ্বন্দ্বের ছায়াও পড়ে। ফালতু, পোশাকি কাজ করেও কেউ কেউ ঢের বেশি টাকা পিটে নিয়ে যান মাসে মাসে শিক্ষকদের চেয়ে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখেন যাঁরা, রাস্তাঘাট নোংরাকরনেওয়ালাদের চেয়ে তাঁরা কম মাইনে পান। ম্যানেজমেন্ট নামে এক ধোঁয়াটে স্তরের লোকজন ঢের বেশি মাইনে পান, ধরা যাক, হাসপাতালের সেবিকা, ধাত্রী স্কুলশিক্ষক বা শ্রমিকদের চেয়ে। সামাজিক গুরুত্বের বিচারে এসব গরমিল সত্ত্বেও লোকে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আশা করে না যে একই চাকরিতে পুরুষ আর মহিলা কর্মীর পারিশ্রমিকে ফারাক থাকবে। ধরা যাক একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একই শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নিয়ে একই চাকরি করছেন। এ-ক্ষেত্রে পুরুষটি অন্য কোনও কারণে নয় তিনি নেহাত পুরুষ বলেই অমনি তাঁর মহিলা সহকর্মীর চেয়ে

বেশি মাইনে পাবেন, এমনটি আধুনিক সমাজব্যবস্থায় হবার কথা নয়। কিন্তু আধুনিকতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমান সুযোগ-পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি নিয়ে সবচেয়ে বড়ো বড়ো লেকচার ঝাড়ে যে দেশ, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা এখনও হয়ে চলেছে। অথচ এ-দেশের সংবিধানে বলা আছে যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ কোনও কারণেই এই দেশের কোনও নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলবে না।

১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি আইন পাশ হয় যার নাম 'ইকুয়াল পে অ্যাক্ট''। তাতে বলা ছিল যে সমান কাজে সমান মাইনে দিতে হবে। তারপর কুড়িটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু এখনও যেসব মহিলা পুরোদস্তুর (ফুলটাইম) চাকরি করেন, তাঁরা গড় হিসেবে পুরুষদের চেয়ে কম মাইনে পান। পুরুষরা এক ডলার রোজগার করলে মহিলারা কামান ৫৯.৮ সেন্ট। মার্কিন সরকারের শ্রম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দপ্তরের কমিশনার জ্যানেট নরউড বলেছেন, শিক্ষা, পেশাগত অভিজ্ঞতা, দায়িত্ব ও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য হিসেবের মধ্যে ধরলেও দেখা যায় যে মাইনের ফারাকটা অন্তত ২৭ শতাংশ।

অনেক ধরনের কাজই দীর্ঘকাল পুরুষদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। মহিলারা ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে সেসব জায়গায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যেসব চাকরিতে মাইনে সবচেয়ে কম, মহিলা কর্মীর সংখ্যা সেগুলোতেই সবচেয়ে বেশি। তার চেয়েও বড়ো কথা হল, একই চাকরিতে (যেমন বুককিপিং বা নার্সিং) মহিলারা পুরুষদের চেয়ে কম মাইনে পাচ্ছেন—যদিও বয়েস, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় তাঁরা সমান সমান। এম. বি. এ ডিগ্রিধারিণীদের অবস্থা বিচার করেও একই ব্যাপার লক্ষ করা গেছে। অথচ ১৯৬৪ সালের নাগরিক অধিকার আইনের সাত নম্বর বিধিতে বলা আছে যে জাতি ধর্ম লিঙ্গ ইত্যাদি কোনও কারণেই চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য বরখাস্ত করা হবে না। বিধি আছে বিধির জায়গায়। বাস্তবে, চাকরির বাজারে মার্কিনি মহিলারা বৈষম্যনীতির শিকার।

এই বৈষম্য ঘোচাতে সম-অধিকার সংগ্রামীরা সমমাত্রিক বেতনের দাবিতে লড়াই করছেন এ-দেশে। এঁরা চান ''পুরুষদের'' চাকরি আর ''মহিলাদের'' চাকরির মধ্যে বেতনের বৈষম্য দূর করতে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে এ-ব্যাপারে একটা বড়োগোছের মামলাও হয়ে গেছে ১৯৮১ সালে। আদালত রায় দিয়েছেন যে সমান বেতনের দাবি ন্যায্য এবং এই দাবির ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার আইনের সাত নম্বর বিধি দর্শিয়ে মামলা রুজু করা যাবে। গত হেমন্তে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের পোস্টঅফিস ও সিভিল সার্ভিস কমিটির তিনটি সাবকমিটি একটি যৌথ শুনানির আয়োজন করেন সমান বেতনের ব্যাপারে। তাতে বোঝা যায় যে চুরাশির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পুরুষ-মহিলা বৈষম্যের বিষয়টা একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব পাবে। লক্ষণীয় যে শাসনক্ষমতাসীন রিপাবলিকান দলের কোনও কংগ্রেস সদস্য ঐ শুনানিতে অংশ নেননি।

এখন প্রশ্ন হল, সমান বেতনের মূল বিষয়টা কী। এবং মাইনের বৈষম্য ঘোচানোর লড়াই সফল হবার সম্ভাবনা কতটা। সাত নম্বর বিধি অনুসারে চাকরির বৈষম্য বলতে কী বোঝায় সেটাই এখানে আসল কথা। একই চাকরিতে মাইনের অসমতা স্পষ্টতই বৈষম্যমূলক। চাকরি পাবার সুযোগের অসমতাও তাই। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনও মহিলাকে বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে চাকরির দরখাস্ত করার সুযোগ না-দেওয়াটা এই শ্রেণীতে পড়ে। সমান বেতনের লড়াই আদতে শুরু হয়েছিল এই দুই বৈষম্যের সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় একটি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। সেই তৃতীয় লক্ষ্যটা ছিল : তুলনীয় কাজের জন্য সমান মাইনে আদায় করা। ব্যাপারটা এইরকম যে কোনও চাকরি বজায় রাখতে গেলে যে যে শিক্ষা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশেষ বিশেষ দক্ষতা ও ক্ষমতা একজন কর্মীর থাকা দরকার, প্রথমে সেগুলোর হিসেবে নেওয়া হবে। তারপর দেখা হবে ঐ চাকরি করতে গেলে অন্য কোন কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ অপরিহার্য—যেমন, কাজটা করার জন্য তাগদ থাকা দরকার কিনা, শারীরিক নৈপুণ্য, দায়িত্ববোধ, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ইত্যাদি আবশ্যক কিনা। এগুলোর ভিত্তিতে এবার বিভিন্ন চাকরির বেতনমাত্রা তুলনা করা যাবে টাকার মূল্যে। যেমন, কোনও শহরে যদি কাঠুরেরা সেবিকাদের চেয়ে বেশি মাইনে পান তো সেটা যুক্তিসংগত কিনা তা মিলিয়ে দেখা যাবে কাঠুরেবৃত্তি ও সেবিকাবৃত্তির জন্য যেসব যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার সেগুলোর তুলনামূলক বিচারে। সমান বেতনের আন্দোলন এভাবেই শুরু হয়েছিল।

মাইনের সমতা আদায়ের উদ্যোগে আমেরিকায় প্রথম নেওয়া হয় চল্লিশ বছরেরও আগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে "লেবর পাওয়ার্স বোর্ড" দেখতে পান যে কারখানায় মহিলারা পুরুষদের চেয়ে কম মাইনে পাচ্ছেন স্রেফ আলাদা চাকরির ভিত্তিতে—যদিও দু'ধরনের চাকরিতে একই শিক্ষা, তাগদ ও দায়িত্বজ্ঞান লাগে। হুকুম জারি করা হয় এই অসমতা দূর করার জন্য। যুদ্ধের পর ঐ বোর্ড উঠে যায় এবং অসংখ্য মালিক আবার সেই সনাতন বৈষম্যপ্রথা ফিরিয়ে আনেন—অর্থাৎ একই কাজের জন্য মহিলারা আবার পুরুষদের চেয়ে কম মাইনে পেতে থাকেন। ১৯৬৩ সালে পাস হল "ইকুয়াল পে অ্যাক্ট"। তাতে বলা হল, সমান কাজের জন্য সমান মাইনে দিতে হবে। পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের মাইনের বৈষম্য বজায় রাখতে আমেরিকায় অনেক কোম্পানি এতোই বদ্ধপরিকর ছিলেন যে তাঁরা ঐ আইন ফাঁকি দেবার জন্য একটা নতুন ফন্দি বের করে ফেললেন। মহিলাদের কাজের বহর তাঁরা সামান্য একটু পাল্টে দিলেন এমনভাবে যাতে করে ঐ আইনের আওতায় তাঁরা আর না পড়েন। অর্থাৎ একই চাকরিতে পুরুষ কর্মী আর মহিলা কর্মীর কাজে ও দায়িত্বে নামমাত্র ফারাক সৃষ্টি করা হল যাতে মহিলারা আর আইন দর্শিয়ে বলতে না পারেন যে হুবহু এক কাজ করেও তাঁরা পুরুষদের চেয়ে কম মাইনে পাচ্ছেন। কারণ আইনে ফরমান দেওয়া ছিল যে কাজের বহর এক হলে তবেই মাইনে এক হতে পারে।

কার্টার আমলে ''ইকুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অপারচুনিটি কমিশন'' ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শ্রমদপ্তর চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কায়েমি বৈষম্য (সাদা-কালো, নারী-পুরুষ ইত্যাদি) ঘোচানোর প্রস্তুতি নেন। রাষ্ট্রপতি কার্টার ''অফিস অফ ফেডারেল কনট্র্যাক্ট কমপ্লায়ান্স প্রোগ্রামস''-এর ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন যাতে করে এই দপ্তর খুঁটিয়ে দেখতে পারেন, মাইনে স্থির করার ব্যাপারে নারী-পুরুষে কোনও ভেদাভেদ হচ্ছে কিনা। রেগানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দপ্তর তাঁদের বিশেষ ক্ষমতাটি হারান। তারপর থেকে, বেতন বৈষম্যের অভিযোগ নিয়ে তাঁরা আর আগের মতো মাথা ঘামাননি। শুধু তাই নয়। কার্টার সরকারের শেষ বছর ৪৩৩৬ জনকে—তাঁদের যে এতদিন অন্যায়ভাবে কম মাইনে দেওয়া হয়েছে এটা প্রমাণিত হবার পর—ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৯৩ লক্ষ ডলার দেওয়া হয়। রেগান সরকারের প্রথম বছর ৪৭৫৪ জন এই সুবাদে পান কুল্লে ৫১ লক্ষ ডলার। আর ৮২ সালের প্রথম ৯ মাসে মাত্র ৭৬১ জনকে মোট ১৬ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এই ছোট্ট হিসেব থেকে বোঝা যায়, চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য ঘোচানোর ব্যাপারে রেগান সরকারের আলস্য কতটা। মার্কিন মুলুকের নারী ও পুরুষের মাইনের ফারাক দূর করার ব্যাপারে এরকমেরই একটা অদ্ভুত আলস্য মোটের ওপর বিরাজ করছে বহুদিন যাবৎ। এটা, বলা বাহুল্য, শারীরিক আলস্য নয়। এ আলস্য মানসিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক।

ডেনভার শহরে সেবিকারা কিছুকাল আগে এই বলে শহর-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন যে, মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা রেখেও কম মাইনে পাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ জবাবে বলেছিলেন, অন্যান্য পুরুষ কর্মীর মাইনের সঙ্গে তাঁরা সেবিকাদের মাইনে মিলিয়ে দেখতে রাজি নন। আঞ্চলিক হাসপাতালগুলো সেবিকাদের কত টাকা মাইনে দিচ্ছেন সেটাই তাঁদের কাছে বিচার্য। অর্থাৎ তাঁরা সেবিকাদের বাজারদর নিয়ে চিন্তিত, অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীদের যোগ্যতা ও সেই অনুপাতে তাঁরা কত মাইনে পাচ্ছেন এসব কথা তাঁদের কাছে অবান্তর। ১৯৭৮ সালে এক আদালত রায় দেন যে মাইনের অসমতা সম্পর্কে সেবিকাদের দাবি ন্যায্য—''সত্যিকার এক সুষম সমাজব্যবস্থায় তাঁদের আরও বেশি বেতন পাওয়া উচিত।''—কিন্তু মাইনে ঢেলে সাজানোর আর্জি সেই আদালত মানেননি। বিচারক বলেছিলেন, শতাব্দী শতাব্দী ধরে যে বৈষম্য চলে আসছে তা ঘোচানোর ক্ষমতা দেশের আইনব্যবস্থা আদালতগুলোকে দেয়নি।''—এই রায়ের ওপর আপীল করা হলে ১৯৮১ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে দেন।

এ-ধরনের বাজারি রায় অন্যান্য বিচারকও দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে আদালত রায় দেন যে ''রবার্ট হল'' নামে এক কাপড়ের দোকানে পুরুষরা পুরুষদের জামাকাপড় বেচে মহিলা কর্মীদের চেয়ে বেশি মাইনে পাবেন, যদিও মহিলাদের কাপড় আর পুরুষদের কাপড় দামের দিক দিয়ে সমান। এই অদ্ভুত বিচারের যুক্তি হল

এই যে পুরুষদের জামা বেচে ঐ দোকানের বেশি আয় হয়। বাজারি যুক্তি, নারী-শোষণ, পুরুষ-শাসন ইত্যাদির বিরুদ্ধে 'গভর্নমেন্ট-অফ-দ্য-পিপ্‌ল্‌-বাই-দ্য-পিপ্‌ল-ফর-দ্য-পিপ্‌ল'-এর পীঠস্থানে মামলা মকদ্দমা চলছে,—কোনও ফয়সালা এখনও হয়নি। কেননা ফয়সালা হতে গেলে মার্কিন সরকারকে এবং জনগণকে চূড়ান্তভাবে মেনে নিতে হবে যে বেতনের ব্যাপারে মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে এবং তা দূর করা দরকার। মার্কিন সরকার এখন দৃশ্যত কোনও মানামানির মধ্যে যেতে চান না। কিন্তু তাঁরা না চাইলেও আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি সেই ১৯৮১ সালে একটি সমীক্ষায় বলে দিয়েছিলেন :

"...Not only do women do different work than men but also the work women do is paid less, and the more an occupation is dominated by women, the less it pays."

অল্প মাইনের চাকরিতেই যে মহিলা কর্মীর সংখ্যা আমেরিকায় বেশি এবং মেয়েরা যে এ-দেশে পুরুষদের চেয়ে ঢের কম মাইনে পান এই তথ্য এতোটা প্রাতিষ্ঠানিক যে এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতেও তা উল্লেখিত।

"In the economic sphere, for example, women who work outside the home are heavily concentrated in the lowest paying work and that having the lowest status. Women also earn less than men in the same kinds of jobs. The median pay of women workers in the U.S. was 60 per cent that of men in 1982."

**(Women's Liberation Movement/Micropaedia, Vol. X)**

মুশকিল হল, জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি বা ব্রিটানিকা বা নারীমুক্তি আন্দোলনের হোতারা যাই-ই বলুন না কেন, এ দেশের বর্তমান কর্ণধাররা এখন ঘরের খেয়ে বিদেশের মোষ তাড়াতেই বেশি ব্যস্ত,—বিশেষ করে যদি সেই মোষের গায়ে লাল কালির ছাপ থাকে। স্বদেশে মহিলারা কম মাইনে পাচ্ছেন, নাকি কৃষ্ণাঙ্গরা বিপন্ন বোধ করছেন এসব ব্যাপার তাঁদের কাছে তুচ্ছ। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেসব রাজ্যে মহিলাদের প্রতি ব্যাপকভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে, প্রচলিত আইনের নজির দর্শিয়ে সেসব রাজ্যেও অবিচার চলছে ও চলবে। কারণ অনেক মার্কিন নারী-অধিকার-গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের সংশোধন ("ইকুয়াল রাইটস অ্যামেণ্ডমেন্ট" বা সংক্ষেপে "ই. আর. এ) ঘটানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেও গত বছর ব্যর্থ হয়েছেন। এই সাংবিধানিক সংশোধন ঘটলে, অনেক রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে যেসব বৈষম্যমূলক আইন চালু রয়েছে সেগুলো বাতিল হয়ে যেতো। এই সংশোধনী প্রস্তাব মার্কিন কংগ্রেস ১৯২৩ সালে প্রথম বিবেচনা করেন। এবং তা অনুমোদিত হয় ১৯৭২ সালে। মানবাধিকার সংগ্রামের ইতিহাসে এও এক স্মরণীয় নজির। বিভিন্ন রাজ্যের আইন যে মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং সেই আইনগুলো যে পালটানো দরকার—শুধু এই প্রস্তাবটুকু অনুমোদন করতেই এক সভ্য, গণতান্ত্রিক

দেশের বিধায়করা ঝাড়া পঞ্চাশটা বছর ধানাই পানাই করে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু শুধু কংগ্রেসের অনুমোদন পেলেই চলবে না। বিভিন্ন রাজ্যেরও সায় থাকা চাই। 'ই. আর. এ' বিল তাই এর পর প্রতি রাজ্যের বিধানসভায় পেশ করা হয় রাজ্যভিত্তিক অনুমোদনের জন্য। তার চরম সময়সীমা ছিল ১৯৮২ সালের তিরিশে জুন। এ-দেশের আইন অনুযায়ী কম করে ৩৮টি রাজ্যে এই সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হলে তবে তা দেশব্যাপী স্বীকৃতি পাবে। গত বছর তিরিশে জুন এই প্রস্তাব ৩৮ টি রাজ্যের অনুমোদন পায়নি। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত অনেক বৈষম্যমূলক আইন আজও বলবৎ।

## উপসংহার

এ-নিবন্ধের উপসংহার লেখার সময় আজও আসেনি, কারণ মার্কিন নারী-অধিকারগোষ্ঠীগুলি তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে ডবল দাঁড়ি টানার আগে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যে-ঘটনা সাময়িক উপসংহার হিসেবে গণ্য হওয়ার হক রাখে। গত তেইশে মে এই সমীক্ষায় আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী তিরিশজন ব্যক্তির নামের একটি তালিকা বেরোয়। তালিকাটি তিনটি সমান ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ, দ্বিতীয় দশ ও তৃতীয় দশ। তিরিশ জনের মধ্যে দু'জন মাত্র মহিলা, তাঁদের একজন আবার স্বয়ং রেগানপত্নী ন্যান্‌সি। একজনেরও কিন্তু প্রথম দশের তালিকায় স্থান নেই। একজনের স্থান দ্বিতীয় বিভাগের সাত নম্বর। অন্যজন রয়েছেন তৃতীয় দশজনের মধ্যে ন' নম্বরে। প্রথম দশজনের সকলেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। এই পত্রিকারই ৬ জুন সংখ্যায় পূর্বোক্ত সমীক্ষা সম্পর্কে লেখা একটি চিঠি বেরোয়। জনৈক পাঠিকার এই চিঠিটাই এ-নিবন্ধের সবচেয়ে মানানসই সাময়িক উপসংহার।

## The powerful Few

Your cover story on "Who Runs American" (May 23 issue) is the best explanation of the gender gap that I have seen in a long time. Women don't have to be card-carrying feminists to recognize that, inded, women are not yet in positions influential enough to be counted in the top 10-your cover photos of 10 white men made plain who runs this country.

You noted that the gender gap is particularly bothersome to the President's political advisers now that women are voting more and in greater numbers. Someday, soon women's economic and political gains will not depend on the whims of these and other influential men in your story. The patriarchal leaders of today will either become enlightened-or ex.

**Patricia Blau Reuss**
**Women's Equity Action League**

# সাক্ষাৎকার : মার্গারেট র‍্যানডাল

মার্গারেট র‍্যানডাল একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, শিক্ষিকা, সাংস্কৃতিক কর্মী ও আলোকচিত্র শিল্পী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর জন্ম। ইংরেজী তাঁর মাতৃভাষা। কিন্তু তিনি স্প্যানিশ ভাষাতেও লেখেন। এখন পর্যন্ত তাঁর পনেরোটি কবিতার বই বেরিয়েছে। প্রবন্ধ সংকলনের সংখ্যা পাঁচ। তার মধ্যে তিনটি স্প্যানিশ ভাষায়। বেরিয়েছে মেক্সিকো, পেরু ও কোস্টারিকা থেকে। তাঁর একটি কবিতার বই-'দ্য ব্লু প্ল্যাসটিক পোয়েমস্'-বোম্বাই' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে। মার্গারেট র‍্যানডাল কিউবায় ও নিকারাগুয়ায় কাটিয়েছেন বেশ কয়েকবছর। সে সময়ে কিউবার বর্তমান সমাজে নারীর স্থান ও নিকারাগুয়ার বিপ্লবে মহিলাদের ভূমিকা এবং ভিয়েতনামের মেয়েদের ওপর মোট আটখানি বই লিখেছেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত তিনি ছিলেন হাভানায় কিউবার গ্রন্থ-বিভাগের সম্পাদিকা। নিকারাগুয়ায় বিপ্লব সফল হবার পর ৮১ থেকে ৮২ সাল পর্যন্ত তিনি মানাগুয়ায় নিকারাগুয়ার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। পরের বছরটা মার্গারেট কাজ করেছেন নিকারাগুয়ার 'ফরেন প্রেস্ সেন্টার'-এ। এরই মধ্যে তাঁর সম্পাদনায় সাতটি কবিতার সংকলন বেরিয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে। আমেরিকার বিটনিক কবিদের লেখা স্প্যানিশভাষীদের কাছে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব যাঁরা দাবি করতে পারেন, মার্গারেট র‍্যানডাল তাঁদের প্রথম সারিতে। আবার, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের কবি ও গদ্য লেখকদের কাজ তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন দশ বছর ধরে। তাঁরই অনুবাদের ভিত্তিতে ফরাসি, জার্মান, পর্তুগীজ,

ইতালীয়, বুলগেরিয় ও জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের সংকলন।

গত দু' বছরে মার্গারেট র‍্যানডালের তোলা ছবির প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে মেক্সিকো, কারাকাস, টরোণ্টো, ভ্যাংকুভার ও ওয়াশিংটন ডি.সি-তে।

ইয়লে, হার্ভার্ড, এম আই টি, প্রিন্সটন, স্ট্যানফোর্ড, শিকাগো, নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো, ক্যালিফোর্নিয়া, ম্যাক্‌গিল, মেক্সিকো, টরোণ্টো, হাভানা ও নিকারাগুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্গারেট র‍্যানডাল আমন্ত্রিত হয়েছেন বক্তৃতা দেবার জন্য এবং কবিতা পাঠ করার জন্য।

## সাক্ষাৎকার

**সুমন : মার্গারেট, আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। এই যেমন, কোথায় আপনার জন্ম, ছেলেবেলা কোথায় কেটেছে, কিভাবে লিখতে শুরু করলেন, এইসব।**

মার্গারেট র‍্যানডাল : আমার জন্ম নিউইয়র্ক শহরে, ১৯৩৬ সালে। সে বছর স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। কয়েকটা দিক দিয়ে আমার বাবা-মা ছিলেন "শ্রেণীচ্যুত" মধ্যবিত্ত আমেরিকান। বাবা এসেছিলেন এক ইহুদি পরিবার থেকে। সেই পরিবারের কিছু টাকা পয়সা ছিল। আমার মনে হয়, আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী-কাঠামোয় নিজেদের স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে আমার মা-বাবা দু'জনেই বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমার বাবা হয়ে গেলেন সঙ্গীতশিল্পী, চেলো-বাজিয়ে। মা ছিলেন ভাস্কর। অনেক বছর। পরে তিনি অনুবাদের কাজ শুরু করেন। হোসে মার্‌তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনিই প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। (হোসে মার্‌তি ছিলেন কিউবার এক বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও লেখক। স্পেনের বিরুদ্ধে কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি শহীদ হন। তাঁর লেখা গান 'গুয়ান্‌তানামেরা" আজও অম্লান—সুমন।) ১৯৪৭ সালে আমরা সপরিবারে নিউ মেক্সিকো চলে যাই। আমার বড় হয়ে ওঠায় এই নিউ মেক্সিকোর ভূমিকা ছিল বিরাট। তার বিশাল, বিস্তৃত মরুভূমি, তার মাটির প্রত্যক্ষতা। আমি, মার্কিন মধ্যবিত্ত সমাজের আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো পাবলিক ইস্কুলে পড়েছি। তারপর গেছি নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু এক সেমেস্টারের বেশি টিকতে পারিনি কলেজে, -এত একঘেয়ে লেগেছিলো। ছেলেবেলা থেকেই জানতাম লিখবো, লেখক হবো। ৬ বছর বয়সে একটা ছোট্ট খবরের কাগজ বের করেছিলাম। হাতে লিখে। নয় কি দশ বছর বয়েসে আমি খবরকাগজ বিলি করতে শুরু করি, -এবারে আসল খবরের কাগজ অবশ্য। চেয়েছিলাম কাগজ বিলি করে পাওয়া পয়সা জমিয়ে জমিয়ে একটা টাইপরাইটার কিনতে। কিনলামও। এবং টাইপ করতে শিখলাম। সবই কিন্তু লেখক হবো বলে। মার্কিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে-কোনও লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমিও ভাবতাম লেখক হতে গেলে টাইপরাইটার একখানা থাকতেই হবে।

**সুমন : আপনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন লাতিন আমেরিকায়। কবে বেরোলেন দেশ ছেড়ে?**

র‍্যানডাল : ৫৫-৫৬ সালে আমি স্পেনে ছিলাম। ৫০-এর দশকে মেক্সিকোতেও

গিয়েছিলাম অল্প সময়ের জন্য। তবে এখানকার পাট তুলে লাতিন আমেরিকায়, আসলে মেক্সিকোয় চলে যাই ১৯৬১ সালে। সে সময়ে নিউ ইয়র্কে ছিলাম। সেখানে, ১৯৬০ সালে আমি প্রথম মা হলাম। একটা ছেলে হলো আমার। মেক্সিকোতে চলে যাবার একটা বড় কারণ ছিল এই যে আমি ভেবেছিলাম মেক্সিকোয় ছেলেটাকে আরও সহজে বড় করতে পারবো, নিউ ইয়র্ক শহরের টানাপোড়েন থেকে দূরে চলে গেলে সেটা সম্ভব হবে, আরো বেশি সময় দিতে পারবো আমার ছেলেটাকে। তাছাড়া, ঐ শহরটায় আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। লেখক হতে গেলে যে ওখানেই থাকতে হবে, থাকতেই হবে, এটা আর মনে হচ্ছিল না। মেক্সিকোয় চলে গেলাম যখন, তখন মোটেও ভাবিনি যে এতদিন থাকবো বিদেশে, ভাবিনি যে ২৩ বছরের আগে দেশে ফিরতে পারবো না।

**সুমন : লাতিন আমেরিকান কোন কোন দেশে আপনি থেকেছেন?**

র‍্যানডাল : প্রথমে মেক্সিকো, তারপর কিউবা, শেষে নিকারাগুয়া।

**সুমন : লাতিন আমেরিকায় আপনার দিন চলতো কিভাবে?**

র‍্যানডাল : নানাভাবে। হরেকরকম কাজ করে রোজগার করতাম। মেক্সিকোয় তো প্রথম প্রথম ইংরেজি পড়ানো থেকে শুরু করে স্প্যানিশ ভাষায় কমিক্ বই অনুবাদ করা পর্যন্ত সবরকমের কাজ করেছিলাম। তারপর ধরুন শিল্প-সমালোচনা আর নাটকের সমালোচনা লিখেছি। অন্য ধরনের অনুবাদও করে গেছি। কিউবার থাকার সময়ে ওদের প্রকাশনা দপ্তরে কাজ করেছি। কিউবার সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রকাশনা দপ্তরে। নিকারাগুয়ায় কাজ করেছি পত্রপত্রিকার সঙ্গে, বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে। কিন্তু লিখে গেছি সমানে। আরও হালে ছবি তুলতে শুরু করেছি। এইভাবে, নানা দিক দিয়ে রোজগার করেছি আমি। আজকাল আমি প্রচুর বক্তৃতা দিয়ে আর আমার লেখা থেকে পাঠ করে বেড়াই। সেই সঙ্গে নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি-আমেরিকান স্টাডিজ আর ইংরেজি।

**সুমন : শুনেছি মেক্সিকো থেকে আপনি একটা দ্বিভাষিক পত্রিকা বের করতেন।**

র‍্যানডাল : হ্যাঁ। পত্রিকাটির নাম 'এল কর্‌নো এমপ্লমাদো', ইংরেজিতে 'দ্য প্লিউমড্ হর্ন'। দুই সংস্কৃতির মিলনে জন্ম নিয়েছিলো ঐ পত্রিকা। সে সময়ে নানা দেশের তরুণ-তরুণী-তাঁরা সকলেই তখন মেক্সিকোয়—বুঝতে পেরেছিলেন যে পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা দরকার, জানা দরকার কে কী ভাবছে বা চাইছে-কবিতা আর গদ্যের মাধ্যমে। সেই সময়ে বিশ্বের নানা জায়গায়, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের ভেতরে একটা সাংস্কৃতিক নবজাগরণ হচ্ছিল যেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ এই সময়টার কথা বলছি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু নবীন প্রতিভা লিখতেন আমাদের পত্রিকায়। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও আমাদের কিছু যোগাযোগ ছিল। ভারতের সঙ্গে যেমন। ভারতের তথাকথিত 'হাংরি জেনারেশনের' কিছু তরুণের সঙ্গে পরিচয়

হয়েছিল আমাদের। তাঁদের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। কিন্তু আমার মনে আছে যে তংাদের কিছু চিঠি, কিছু কবিতা আমরা ছেপেছিলাম। সবই ইংরেজিতে। খুব জানতে ইচ্ছে করে তাঁরা এখন কোথায়, কী করছেন। কিন্তু, ঐ যে বললাম, নামগুলো ভুলে গিয়েছি একদম।

**সুমন : আপনি তো কিউবায় ছিলেন। কিউবার বিপ্লবের পর থেকেই তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমানে চেষ্টা করে গেছে ঐ বিপ্লবকে ধ্বংস করতে। তা, আপনি যে একজন মার্কিন নাগরিক হিসেবে কিউবায় ছিলেন, এটা কিউবার মানুষ নিয়েছেন কিভাবে? কিরকম প্রতিক্রিয়া দেখেছেন আপনি?**

র‍্যানডাল : দেখুন, কিউবার মানুষ উত্তর আমেরিকার জনগণ আর মার্কিন সরকারকে এক চোখে দেখেন না মোটেও। এ ব্যাপারে তাঁরা খুব সতর্ক। উত্তর আমেরিকার মানুষের জন্য তাঁদের মনে বিপুল ভালবাসা আছে। মার্কিন সরকারগুলো মোটামুটি চেষ্টা করে গেছে যুক্তরাষ্ট্র আর কিউবার মধ্যে একটা আক্রোশপূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখতে। কয়েকটা দিক দিয়ে কেনেডি আর কার্টারের আমলে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে অবশ্য। যাই হোক ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিউবানদের তরফে আমি কোনও শত্রুতা টের পাইনি।

**সুমন : কিউবায় আর নিকারাগুয়ায় শিল্প সাহিত্যের ওপর বিপ্লবের প্রভাব কেমন পড়েছে জানতে ইচ্ছে করে। কিউবার শিল্পী ও লেখক-লেখিকারা কি অবাধে কাজ করতে পারেন, লিখতে পারেন যা মন চায়, নাকি কোনও বাধা বা চাপ আছে?**

র‍্যানডাল : কিউবা আর নিকারাগুয়ায় শিল্পের ওপর ঐ দুটি দেশের জনতার বিপ্লবের অসাধারণ প্রভাব পড়েছে। বিপ্লব মানুষের মনের বাঁধগুলোকে ভেঙে দেয়, আটকে রাখা দমিয়ে রাখা শক্তিটাকে মুক্ত করে। জীবনের সব ক্ষেত্রে। সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি তা থেকে বাদ পড়ে না। তবে কি জানেন, কোনও দেশের মুখ, ছিরিছাঁদ, খোলনলচে পাল্টে দেওয়া অতি জটিল একটা ব্যাপার। তাতে বিপুল অভ্যুত্থান ঘটে যায় নানা দিক দিয়ে। সেখানে প্রচণ্ড উত্তেজনা থাকে, পরীক্ষানিরীক্ষা থাকে, বিস্তর নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা এসে পড়ে, দেখা দেয় প্রচুর লড়াই। কিউবায় যেমন, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে ঘিরে কোনও কোনও সময়ে তুমুল লড়াই, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব হয়েছে। এক এক সময়ে আশঙ্কা হয়েছিল যে সেই অভিব্যক্তি দমিয়ে দেওয়া হবে। আমার ধারণা, এই আশংকার অনেকটাই এসেছিল শিল্পীদের চিরকেলে সেই 'আমরা-একটা-আলাদা-উঁচুজাতের-লোক' গোছের মনোভাব থেকে। তাছাড়া নিদেন টিকে থাকার জন্য যে দেশকে বিপুল সমস্যা সঙ্কটের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে, সেই দৈনন্দিন জীবনে শিল্পীদের জায়গাটা ঠিক কোথায়, কোথায় তাঁরা খাপ খাবেন, এটাও তাঁরা অনেক সময়ে বুঝে উঠতে পারেন না। নতুন, নবীন শিল্পীরা আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটা পাল্টাতে থাকে, কারণ এই নবীন-নবীনারা তো জন্মেইছেন এক নতুন সমাজে। সব ব্যাপারেই তাঁদের ধারণাটা হয় আলাদা। কিউবার বিপ্লবের ২৫

বছরে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুব নতুন ও উত্তেজনাকর কিছু ব্যাপার ঘটতে দেখা গেছে। নিকারাগুয়ার বিপ্লব হয়েছে কিউবার ২০ বছর পরে। তবু নিকারাগুয়ার বেলাতেও একই কথা বলা যায়। নিকারাগুয়ায় কবিতা দারুণ গুরুত্বময় একটা ব্যাপার। সত্যি বলতে, আমি যতো দেশে গিয়েছি তার মধ্যে নিকারাগুয়াই একমাত্র দেশ যেখানে ''কবি'' কথাটা একটা উপাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনবেন লোকে বলছে 'কবি কার্দেনাল', 'কবি বেল্লি'। নিকারাগুয়া এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি, রুবেন দারিয়োর জন্মভূমি। যাই হোক, ভাব-প্রকাশের স্বাধীনতা-নানান ভুল ধারণা আর আশঙ্কায় মোড়া এই বহু শোনা, বহু-বলা কথাটার প্রসঙ্গে বলি : হ্যাঁ, কিউবা ও নিকারাগুয়া দুটো দেশেই ভাব-প্রকাশের, মনের কথাটা অবাধে বলে দেবার প্রচুর স্বাধীনতা আছে। যা মন চায় বলে দেবার, জানিয়ে দেবার স্বাধীনতাই যে শুধু আছে তা নয়, সেইসব উক্তি ও অভিব্যক্তিকে সযত্নে লালন করার সত্যিকার একটা চেষ্টাও রয়েছে। প্রকাশনা, কবিতার ওয়ার্কশপ, নাটক, সঙ্গীত, নাচ আর ফটোগ্রাফির জন্য বিপুল টাকা খরচ করা হয়। মনে রাখবেন, এগুলো যেখানে হচ্ছে সেখানে সামাজিক প্রয়োজন অসংখ্য, আর হাতের টাকা নেহাতই সামান্য।

**সুমন : মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, শোষণ, দমন আর বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণের যে সংগ্রাম, ঐ সব অঞ্চলের শিল্প-সাহিত্যের ওপর তার কেমন প্রভাব পড়েছে? রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম, সংস্কৃতির ফ্রন্টেও কি সেটা চলছে?**

র‍্যানডাল : মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় একনায়কতন্ত্র, শোষণ, দমন আর বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম, ঐসব জায়গার শৈল্পিক অভিব্যক্তির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। নিঃসন্দেহে ঠিক যেমন, আমার ধারণা, ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রভাব রেখে যাচ্ছে ভারতের চিন্তা ও সৃজনশীলতার ওপর। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় জনগণের লড়াই নিত্যজীবনের একটা অঙ্গ, একটা বাস্তব ঘটনা। বহু শতাব্দী ধরে এরকমই চলছে। রাজনৈতিক সংগ্রাম ''আলাদা'' বা ''জীবনবর্হির্ভূত'' কোনও ব্যাপার নয়। ওটা জীবনেরই একটা দিক, খুব গুরুত্বময় একটা অঙ্গ। ফলে সেটা শিল্পের একটা সক্রিয়, পরিবর্তনশীল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আপনি যে দুটি দেশের কথা জানতে চেয়েছেন এর আগে, সেখানে এবং সাধারণভাবে গোটা লাতিন আমেরিকাতেই এই সংগ্রাম সাহিত্যের একটা নতুন শাখার জন্ম দিয়েছে : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য। ইংরেজিতে এটাকে ''ওরাল হিস্ট্রি'' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু লাতিন আমেরিকানরা ''তেস্তিমোনিয়ো'' বলতে বোঝান 'সাহিত্য'। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক, আটপৌরে অভিজ্ঞতা নানান রূপান্তরের পথ বেয়ে কিভাবে সাহিত্য হয়ে ওঠে, সেটাই বলতে চান তাঁরা। এটা কবিতা, বা ছোটগল্প, বা উপন্যাসের রূপ নেয়। এ থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের বই পাওয়া যাচ্ছে। বলিভিয়ার মানুষ দমিতিলা বার্‌রিয়স দে চুংগারা, ব্রাজিলের মোয়েমা ভিয়েজেরকে যা যা বলে গেছেন তার ভিত্তিতে মেক্সিকোয় লেখা হয়েছে একটা উপন্যাস : ''মানুয়েলা, আমায় বলতে দাও''।

এল্ সাল্ভাদোরের রোকে দাল্তন লিখেছেন, ''মিগেল মার্মল্''। এলিজাবেথ বুর্গোস লিখেছেন : ''আমি, রিগোবের্তা মেন্চ''। নিকারাগুয়ার লেখক ওমার কাবেসা লিখে ফেলেছেন : ''পাহাড় শুধু একরাশ সবুজ নয়''। আমার নিজের লেখা ''সান্দিনোর মেয়েরা'' একই ধরনের বই। আমি কয়েকটা মাত্র বই-এর নাম করলাম। যাই হোক, এইসব বই-এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে একেবারে সাধারণ মানুষের চেতনা। এঁদের অনেকেই আগে নিরক্ষর ছিলেন। অথবা, নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলা বা লেখার কোনও সুযোগ এঁদের কারুরই ছিল না এর আগে। জগৎ-সংসার সম্পর্কে তাঁরা যা ভেবেছেন সেটা তাঁরা হঠাৎ জানিয়ে দিতে পারছেন এখন অন্যদের।

**সুমন : মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাব সারা পৃথিবীর ওপরেই পড়েছে। কোথাও কোথাও প্রচণ্ডভাবে। জার্মান পরিচালক ভিম্ ভেনডার্স একবার বলেছিলেন : 'আমেরিকা আমাদের অবচেতনে উপনিবেশ গেড়েছে।' লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাব আপনি কতোটা দেখেছেন?**

র‍্যানডাল : লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তীর্ণ। খুব ব্যাপকভাবেই তা পড়েছে এবং বেশ বিকৃতিও ডেকে এনেছে। সংস্কৃতির এক সত্যিকার জাতীয় অভিব্যক্তির জন্য যে চেষ্টা, মার্কিন সংস্কৃতি একেবারে তারই ওপর প্রভাব ফেলে থাকে। কারণ ঐ চেষ্টার অনেকটাই হলো বাইরের ক্ষতিকর প্রভাব আর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে মানুষ যেভাবে খায়, ঘুমোয়, জামাকাপড় পরে, ভাবে, ভালবাসে, চলাফেরা করে, কাজ করে এবং জীবনের কাছ থেকে তারা যা-চায়-এই সব কিছুর ওপরেই বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যনির্ভর বাজারী সংস্কৃতি।

**সুমন : 'আমেরিকান সাহিত্য' আর 'উত্তর আমেরিকান সাহিত্যের' মধ্যে একটা সমীকরণ করার প্রবণতা সারা দুনিয়াতেই লক্ষ করা যায়। এক উত্তর আমেরিকান লেখিকা ও কবি হিসেবে আপনি লাতিন আমেরিকায় এতদিন কাটিয়েছেন। তাই আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই উত্তর আমেরিকান সাহিত্য এবং লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের মধ্যে মিল ও অমিল সম্পর্কে আপনার মত কী, আর এই দুই মহাদেশের সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্কটাই বা কেমন?**

র‍্যানডাল : দেখুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বই-এর ব্যবসাটা বিশাল। আজ বলে নয়, অনেককাল ধরেই। অগুণতি বই এ দেশে ছাপা হয় এবং সেগুলো কাটানো হয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে। বহু দূরের দেশেও পৌঁছে যায় মার্কিনি বই। ফলে, স্বাভাবিকভাবে, তার অনেকটাই পৌঁছে গেছে লাতিন আমেরিকায়। লাতিন আমেরিকান বই অবশ্য ঐ পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারেনি। মার্কিনি সাহিত্যের এই যে রপ্তানি, এর কিছু ভাল দিকও ছিলো। ৫০-এর দশকে নিকারাগুয়ার দুই প্রথম সারির কবি হোসে করোনেল উর্তেচো আর এর্নেস্তো কার্দেনাল উত্তর আমেরিকান কবি পাউন্ড, উইলিয়ামস, হুইটম্যান ও ডিকিনসনের কবিতা স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। সেই অনুবাদ করা কবিতার সংকলনগুলো নিকারাগুয়ার

সাহিত্যের ওপর গভীর প্রভাব রেখেছে। ভাষা দুটো যে একেবারেই আলাদা, সেটা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি আর স্প্যানিশের ভাষাগত চরিত্র আর মালমশলা, স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শ এত ভিন্ন ধরনের যে তারা দুই বিভিন্ন সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে। ভাষার পার্থক্য থেকে অভিজ্ঞতার পার্থক্যও এসে পড়ে এবং অভিজ্ঞতার ফারাক থেকে ভাষার ফারাক। লেসামা লিমা, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস আর হুয়ান রুল্‌ফোর লেখায় যে রূপকথামুখী বাস্তবতা, সেটা ভাষার পার্থক্যেরই সাক্ষী। এমনকি অনুবাদেও সেটা ধরা পড়ে। যে তিনজনের নাম করলাম তাঁদের প্রথম জন কিউবান, দ্বিতীয় লেখকটি কলোম্বিয়ান, আর তৃতীয় ব্যক্তিটি মেক্সিকোর লোক। আপনার প্রশ্নের প্রতি সুবিচার করতে গেলে একটা বড় মাপের প্রবন্ধ লেখা দরকার। অতো সময় তো আর নেই। তাই সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে আমার মতে উত্তর আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকা এই দুই মহাদেশের সাহিত্য খুবই, একেবারেই আলাদা জাতের। আলাদা আলাদা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা তৈরি হয়েছে, ইতিহাসের পথ ধরে তারা আলাদাভাবে গড়ে উঠেছে এবং যে দুই ভাষায় তারা রূপ পেয়েছে সেই ভাষাদুটোও একেবারে আলাদা চরিত্রের। তবে দুই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো পরস্পরের সম্পূরক।

**সুমন : ২৩ বছর লাতিন আমেরিকায় কাটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলেন আপনি। চলে যাবার কারণগুলো আপনি নিজেই বলেছেন আমায়। ফিরে আসারও কি তেমন কোনও বিশেষ কারণ আছে?**

র‍্যানডাল : ফিরে এলাম, কারণ সকলকেই এক সময়ে-না এক সময়ে ঘরে ফিরতে হয়।

**সুমন : এত বছর পর দেশে ফিরে এসে আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দিক দিয়ে এবং মার্কিনিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মনোভাবের ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন?**

র‍্যানডাল : নিশ্চয়ই। বলার মতো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। সময় কখনও থেমে থাকে না। আর জনতার সংগ্রাম সারাক্ষণই চলে, এমনকি খুব অবদমিত অবস্থাতেও। আমি মনে করি গত দু'দশকে নারীর অধিকার, কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারের সংগ্রাম, দারিদ্র্য ঘোচানোর লড়াই, সমকামীদের অধিকারের সংগ্রাম এ দেশে অনেক সুফল এনে দিয়েছে। এই সময়ে এই দেশে যাঁরা থেকেছেন তাঁরা এটা বিলক্ষণ জানেন। অসমতা, বৈষম্যগুলো এখনও এতো জঘন্য আকারে রয়েছে যে সাফল্যের নজিরগুলো প্রায়ই দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। সেটা দুঃখের। স্পষ্ট যে আজ যাঁরা এ দেশের রাজনৈতিক নেতা তাঁরা খুবই রক্ষণশীল, গোঁড়া। এবং সরকার আজ' দেশকে টেনে নিয়ে চলেছেন এক নয়া-রক্ষণশীলতার দিকে যেটা অনেকের কাছে, বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ, দরিদ্র, নারীসম্প্রদায় ও সমকামীদের কাছে ফ্যাসিবাদের ধারঘেঁষা। মধ্য আমেরিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। তবে আমি সবকিছু ইতিহাসের সামগ্রিকতায় বিচার করি বলে

খুব আশাবাদী। আমার বিশ্বাস, ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ঘটনার স্রোত এগিয়ে চলেছে সকল মানুষের মুক্তির দিকে।

**সুমন : মার্কিন নাগরিক হয়েও আপনি কিউবা ও নিকারাগুয়ায় থেকেছেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এদিকে তো মার্কিন সরকার ঐ দুটো দেশকে শত্রু মনে করেন। তা, আপনার কাজকর্ম আর মতামতের জন্য, দেশে ফেরার পর আপনাকে কোনও ঝামেলায় পড়তে হয়নি?**

র‍্যানডাল : না।

**সুমন : কিউবা ও নিকারাগুয়ার ওপর আপনি কয়েকটা বই লিখেছেন। এগুলো লিখেছেন আপনি ঐ দুই দেশের বিপ্লবের সঙ্গে সংহতি দেখিয়ে। আমেরিকার বড় বড় প্রকাশকরা কি আপনার বই-এর ব্যাপারে আগ্রহী? আমেরিকার বড় বড় পত্রিকায় আপনি কি লিখতে পারেন? আপনার বইগুলো তারা রিভিউ করে কি?**

র‍্যানডাল : আমার বেশির ভাগ বই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকতা ও প্রকাশনার মূল-স্রোতের বাইরে। বাজারি প্রকাশকরা আমার বই কালেভদ্রে ছেপেছেন অবশ্য। তবে হ্যাঁ, প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলো আমায় তেমন পছন্দ করে না, আমার বই সম্পর্কে লেখেও না তেমন। কিন্তু অপরদিকে, থেকে থেকেই আমার ডাক পড়ে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দেবার জন্য বা আমার লেখা থেকে পাঠ করার জন্য। অনেক, অনেক প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বক্তৃতা দিয়েছি, আমার লেখা থেকে পড়ে শুনিয়েছি। প্রচুর লোক এসেছে শুনতে। নানা ধরনের লোক। এবং রচনাপাঠ ও বক্তৃতার এইসব আসরের খবর প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলোয় প্রায়ই বেরিয়েছে।

**সুমন : আপনার বইগুলোর পাঠক প্রধানত কারা?**

র‍্যানডাল : সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহিলারাই আমার বই সবচেয়ে বেশি পড়েন। কারণ, মহিলাদের সমস্যা নিয়েই আমি এতো বছর কাজ করেছি, লিখেছি। কয়েক ডজন বই লিখেছি মেয়েদের ওপর। আমার ধারণা, অনেক তরুণ-তরুণী ও প্রগতিশীল মানুষ আমার বই পড়েন। তবে "আপনার বই পড়ে আমার জীবন পাল্টে গেছে"-এটা আমি মহিলাদের কাছেই সবচেয়ে বেশি শুনেছি।

**সুমন : এই মুহূর্তে কী করছেন, কী লিখছেন আপনি?**

র‍্যানডাল : ফিরে এসেছি নিউ মেক্সিকোর আল্‌বুকারকি শহরে। এখানেই আমার যৌবন কেটেছিল। নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি। বছর তিরিশ আগে এই কলেজ ছেড়েই আমি চলে গিয়েছিলাম, একঘেয়ে, বিরক্তিকর লেগেছিল বলে। লিখছি প্রচুর। এই মুহূর্তে তিনটি বই-এর কাজ করছি। আমি ফেরার পর থেকে আমার চারখানা বই ছাপা হয়ে গিয়েছে, বেরিয়ে গিয়েছে। প্রচুর ছবি তুলছি। বছর ছয়েক আগে কিউবায় থাকাকালেই ফটোগ্রাফিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম খুব বেশি রকম। সেই সঙ্গে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি, আসরে আসরে পড়ে শোনাচ্ছি আমার কবিতা।

# নিকারাগুয়া : বন্ধন ও মুক্তি

*'Good morning, Revolution :*
*You are the very best friend*
*I ever had.*
*We gonna pal around from now on.....*
***Langston Hughes***

মধ্য আমেরিকার ছোট্ট এক দেশ নিকারাগুয়া। তার উত্তরে অন্দুরাস। উত্তর-পূর্বে এল্ সালভাদোর। দক্ষিণে কস্তারিকা। তার এক দিকে প্রশান্ত মহাসাগর। অপর দিকে অতলান্তিক। ওপরে নীচে ছোট ছোট আরও কয়েকটি দেশ : বেলিস, গুয়াতেমালা, পানামা।

যত দূর জানা যায়, মোটামুটি হাজার দুই বছর আগে ইন্ডিয়ানরা (যাঁদের আমরা 'রেড ইন্ডিয়ান' বলে থাকি) দল বেঁধে এসেছিলেন নিকারাগুয়ায়। বেশির ভাগই মেক্সিকো ও ক্যারিবিয় অঞ্চল থেকে। অসংখ্য ছোট বড় নদী, লেগুন, সুফলা মাটি আর সবুজের সমারোহ দেখে তাঁরা নিকারাগুয়াতেই থেকে গেলেন। নিকারাগুয়ায় প্রথম অধিবাসীরা ছিলেন সম্ভবত 'মিস্কিতো' উপজাতির লোক। 'চেরোতেগা' নামে আর এক উপজাতি একসময়ে মিস্কিতোদের কোণঠাসা করে ফেলেন। কালক্রমে চোরোতেগারাও রেহাই পেলেন না। মেক্সিকো থেকে 'নাহুয়া' উপজাতি নিকারাগুয়ায় এসে তাঁদের হঠিয়ে দিলেন এবং গোটা অঞ্চলের ওপর চাপিয়ে দিলেন মেক্সিকান

সংস্কৃতি। নাহুয়ারা মেক্সিকানদের মতোই চাষ-আবাদ আর শিকার করতেন, মাছ ধরতেন। গণিত আর সামান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানও জানা ছিল তাঁদের। একটি ব্যাপার তাঁদের একেবারেই জানা ছিল না : নিজেদের 'সভ্য' বলে জাহির করে থাকেন এমন এক ধরনের মানুষ অন্য এক মহাদেশ থেকে জাহাজ ভাসিয়ে এসে নিকারাগুয়া ও তার অধিবাসীদের একদিন আবিষ্কার করে বসবেন।

১৫০২ খ্রিস্টাব্দের বারোই সেপ্টেম্বর অতলান্তিক উপকূলে রামা নদীর মোহানায় স্পেনের নিশান উড়িয়ে জাহাজ ভেড়ালেন অ্যাডমিরাল কলোম্বাস। চারদিকে দেখেশুনে তিনি রায় দিলেন : "নতুন দুনিয়ায় যত দেশ দেখলুম তার মধ্যে মাটি আর মানুষ সবচেয়ে ভাল এই নিকারাগুয়ায়। এখানে অনেক নদী আর লম্বা লম্বা গাছ রয়েছে।"

কার্যত অবশ্য সুভ্য শ্বেতাঙ্গরা "নদী আর লম্বা লম্বা গাছ"-এর দিকে বেশি না তাকিয়ে নজর দিলেন নিকারাগুয়ার সোনা, তোতাপাখি আর মেয়েদের দিকে। পনেরো দিন ধরে এই সব "সম্পদ" সংগ্রহ করে কলোম্বাস দলবল নিয়ে পাড়ি দিলেন ঘরপানে। 'সভ্য' দুনিয়া নিকারাগুয়া আবিষ্কারের খবর পেয়ে গেল।

আবিষ্কার ডেকে আনল সভ্য-বানাও অভিযান। অর্থাৎ এলোপাথাড়ি লুঠতরাজ নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় মানুষদের শেকলে বেঁধে ফেলা, ব্যাপক গণহত্যা ও ধর্ষণ। স্প্যানিশরা অবশ্য নিকারাগুয়ার ইন্ডিয়ানদের দাস বানিয়ে ফেলা বা খুন করার আগে তাঁদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিলেন। ইহকাল ও পরকালের পাকা বন্দোবস্ত করে দেওয়া সভ্য মানুষের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন স্প্যানিশ "কন্‌কিস্‌তাদোরেস" বা বিজেতারা। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের যুগ শুরু হল নিকারাগুয়ায় ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে। ফলে মেক্সিকোর মতো নিকারাগুয়াতেও বিজেতারা স্থানীয় সংস্কৃতি উৎখাত করলেন, পুড়িয়ে দিলেন বহু প্রাচীন ও মূল্যবান পুঁথি। স্থানীয় ভাষার মূল্যে চাপিয়ে দেওয়া হল স্প্যানিশ ভাষা। গায়ের জোরে কায়েম করা হল ভিনদেশী বিজেতাদের (স্প্যানিশ) সংস্কৃতি—যার মূল স্তম্ভ হল মধ্যযুগীয় ক্যাথলিকবাদ।

১৮২১ সালে মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা স্পেনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীন হয়ে ওঠে। নিরাপত্তার কারণে মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশের মতো নিকারাগুয়াও আগুস্তিন্ দে ইতুর্‌বিদের মেক্সিকান সাম্রাজ্যের সঙ্গে হাত মেলায় ১৮২২ সালে। কিন্তু ১৮২৩ সালেই ইতুর্‌বিদে গদিচ্যুত হলেন। সাম্রাজ্য গেল ভেঙে। ফলে গুয়াতেমালা, অন্দুরাস, এল্ সালভাদোর, নিকারাগুয়া ও কস্তারিকা একজোট হয়ে একটা প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলল। মাত্র পনেরো বছর টিকল এই ব্যবস্থা। ১৯৩৮ সালের ৩০ এপ্রিল নিকারাগুয়ানরা ঠিক করলেন তাঁরা স্বাতন্ত্র্যের পথ ধরবেন। জন্ম নিল নিকারাগুয়ার প্রজাতন্ত্র।

স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল আঞ্চলিক রেষারেষি মহামাত্যে মহামাত্যে কোন্দল আর মারামারি। লেয়ন আর গ্রানাদা এই দুই শহরের সব চেয়ে নামজাদা

ও বিত্তশালী পরিবারগুলোর মধ্যে ক্ষমতার যে লড়াই চলছিল তা থেকেই বেরিয়ে এলেন নিকারাগুয়ার প্রথম নেতারা। বিবাদমান দু পক্ষই ঠিক করলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁরা গুন্ডা ভাড়া করে আনবেন। সে ১৮৫৫ সালের কথা। এইভাবে ভাড়াটে সৈন্যের বেশে নিকারাগুয়ায় প্রবেশ করলেন মার্কিনিরা। কালক্রমে তাঁরাই হয়ে উঠলেন নিকারাগুয়ার ইতিহাসের চালকশক্তি।

উইলিয়ম ওয়াকার নামে এক মার্কিনি ভাগ্যান্বেষী ১৮৫৫ সালে একদল ভাড়াটে মার্কিনি সৈন্য নিয়ে নিকারাগুয়ায় এলেন। দেশের ভেতরকার চরম বিশৃঙ্খলা আর অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে বছরখানেকের পরেই ওয়াকার ঘোষণা করলেন যে তিনিই নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি। তাঁর লক্ষ্য ছিল মধ্য আমেরিকায় দাসপ্রথা ফের চালু করা এবং মার্কিনি শ্রেষ্ঠীদের নিকারাগুয়ায় জাল বিস্তারের পথ সুগম করা। ওয়াকার সাহেব মাত্র বছর দুই রাজত্ব করতে পারলেন। তারপর ব্রিটিশদের সাহায্যে কস্তারিকার বাহিনী তাঁকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু ওয়াকারের অন্তত একটি কাজ ততদিনে হাসিল হয়ে গিয়েছে। মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থ ততদিনে সিঁধ কেটে ফেলেছে নিকারাগুয়ায়।

তার পরের একশো বছরের ইতিহাস, নিকারাগুয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বের ইতিহাস। এই সময়ে নিকারাগুয়ার অর্থনীতি প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। খোদ নিকারাগুয়ায় তখন অভিজাত শ্রেণীর রাজত্ব। অভিজাত প্রভুরা স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে সেগুলো তুলে দিতে লাগলেন কফি উৎপাদক আর মার্কিনি বিনিয়োগকারীদের হাতে। এই সব জমিজমা আগে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল না। এগুলো ছিল গোটা সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সম্পত্তি। কাজেই জমি লুঠ করতে গিয়ে স্থানীয় মহামাত্যরা গোষ্ঠীকে গোষ্ঠী, গ্রামকে গ্রাম সাবাড় করে দিলেন। শুধু ১৮৮১ সালেই কফি চাষ আর কাঠের ব্যবসার হাঁড়িকাঠে প্রাণ দিলেন অন্তত সাত হাজার ইন্ডিয়ান।

যে জমিতে ভুট্টা আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় শস্যের চাষ হবার কথা (আর জনগণের খেয়ে বাঁচার কথা), সেই জমিতে কফি চাষ করে এবং তা মার্কিনি ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে নিকারাগুয়ার মহামাত্যরা কাঁচা ডলারের স্বাদ পেলেন। সেই ডলার ওড্রানোর জন্য তাঁরা যেতে লাগলেন মায়ামি ও নিউ অর্লিন্স। মার্কিনি পুঁজিবাদই হয়ে দাঁড়াল নিকারাগুয়ার ধনিকশ্রেণীর আদর্শ। অচিরেই মার্কিনি পুঁজিপতির দল আর স্থানীয় অভিজাত বিত্তশালীরা জোট বাঁধলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি স্থানীয় শ্রেষ্ঠীদের সহায়তায় নিকারাগুয়ায় বেশ বড় মাপের একটা কলা চাষের এলাকা তৈরি করলেন। কলার সূত্রে আরও নানান ফলের চাষ শুরু হল। কফির সঙ্গে এগুলোও রপ্তানি হতে লাগল ঢালাওভাবে। আদতে যাঁরা ছিলেন জমির মালিক, এবারে তাঁরা হয়ে পড়লেন মার্কিনি কোম্পানি আর স্থানীয় বোম্বেটে বড়লোকদের প্রজা। নামমাত্র মজুরিতে প্রজা-চাষীরা বিশাল প্ল্যানটেশনে দিনরাত খেটে

চললেন। ফসল বিক্রির টাকা আর মজুরি-মারা লাভের গুড় গেল কোম্পানি আর স্থানীয় মালিকদের ঘরে। জন্ম নিল নিকারাগুয়ায় ধনতন্ত্র।

নিকারাগুয়ার রাজনীতি তখন আক্ষরিক অর্থেই 'রাজনীতি', অর্থাৎ রাজারাজড়াদের নীতি—থুড়ি লীলাভূমি। রাজারাজড়া বলতে ভূস্বামী, কফিস্বামী, কলা-আনারসস্বামীরা। এঁদের পরিবারগুলোই তখন সর্বেসর্বা। বিশেষ বিশেষ পদবীর অধিকারী হওয়াই ছিল রাষ্ট্রপতি হবার প্রাথমিক শর্ত। ১৮৫০ সাল থেকে শতকসন্ধি পর্যন্ত নিকারাগুয়ায় রাষ্ট্রপতির পদটা ছিল বিশেষ কয়েকটি পরিবারের সম্পত্তি। ঘুরেফিরে তাঁরাই পেতেন মসনদ। এবং লেখাপড়া না জানলেও নামসই করার বিদ্যেটা তাঁরা ভালই রপ্ত করেছিলেন। ফলে বিদেশি কোম্পানি ও পুঁজিপতিদের হাতে স্বদেশের সম্পদ তুলে দেওয়ার চক্রান্ত সংবলিত একরাশ চুক্তিতে সমানে সই করে গেলেন তাঁরা। নিকারাগুয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতি হাত ধরাধরি করে চলে গেল মার্কিনিদের কুক্ষিতে। এক সময়ে দেখা গেল নিকারাগুয়ার রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৯০ ভাগই চলে যাচ্ছে মার্কিন মুলুকে। মার্কিনি কোম্পানিগুলো হয়ে উঠল নিকারাগুয়ার বিশাল বিশাল সম্পত্তির মালিক। লাগাম আর ছপ্‌টি যে আসলে কার হাতে এটা নিকারাগুয়ার জনগণকে সম্যক বুঝিয়ে দেবার জন্য নিকারাগুয়ার মুদ্রায় এক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ছবিও ছাপা হল।

সামরিক শক্তির বাটখারা ছাড়া অর্থনীতি ও রাজনীতির দাঁড়িপাল্লাটাকে স্বার্থমাফিক ব্যবহার করা যায় না। তাই মার্কিন সরকার সামরিক দিক দিয়েও নাক গলালেন। ১৯১২ সালে মার্কিনি মেরিন বাহিনী নেমে পড়ল নিকারাগুয়ায়। কুড়ি বছর দখল করে রাখল তাঁরা এ দেশ। দখলদার বাহিনী হিসেবে থাকাকালে মার্কিনিদের একটা বড় কাজ ছিল নিকারাগুয়ার বাহিনী গড়ে তোলা। এমন এক বাহিনী যা রাষ্ট্রপ্রধানের বশংবদ হবে। নির্বাচিত কোনও সরকারকে উৎখাত করেও যদি কেউ ক্ষমতা দখল করে তাহলেও সেই ভুঁইফোঁড় 'নেতার' প্রতি আনুগত্য দেখাবে যে বাহিনী। ১৯২৭ সালে এই বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা হল। তার নাম রাখা হল 'লা গুয়ার্দি'য়া নাসিয়োনাল' বা ন্যাশনাল গার্ড। দখলদার মার্কিনি সেনাবাহিনীই প্রথম থেকে অর্থ, অস্ত্র আর প্রশিক্ষণ যোগাল এই রক্ষীবাহিনীকে। প্রথম দিকে এ বাহিনীর অফিসাররাও ছিলেন মার্কিনি। ১৯৩৩ সালে, অর্থাৎ ঝাড়া ছ'বছর সরাসরি মার্কিনি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকার পর, একজন নিকারাগুয়ানকে পাওয়া গেল যিনি এ-হেন বাহিনীর প্রধান হবার যোগ্য। তাঁর নাম আনাসতাসিয়ো সোমোসা গার্সিয়া। ১৯৩৩-এর পয়লা জানুয়ারি পরম মার্কিনবন্ধু মার্কিনি রাষ্ট্রদূতপত্নীর প্রেমিক মেজর আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসা হলেন ন্যাশনাল গার্ডের প্রথম নিকারাগুয়ান জেনারেল। সেইদিনই মার্কিনি মেরিন বাহিনী নিশ্চিন্ত মনে পাততাড়ি গোটাল নিকারাগুয়া থেকে।

কয়েক বছরের মধ্যেই আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসা দেশের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং গার্ড বাহিনীকে পুরোদস্তুর কাজে লাগিয়ে নিকারাগুয়ার ডিক্‌টেটর

হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সোমোসা পরিবার ও ন্যাশনাল গার্ড নিকারাগুয়ায় যে চরম স্বৈরাচার, নৃশংসতা ও দুর্নীতি চালিয়ে গিয়েছে, অসভ্যতার ইতিহাসে তা এক বিরাট অধ্যায়। গ্রামের জনগণকে সন্ত্রস্ত রাখা, হরতাল ভাঙা ও রাজনৈতিক শত্রুদের খুন করা হয়ে দাঁড়াল ন্যাশনাল গার্ডের আসল কাজ। চাষীদের ওপর চলল অমানুষিক নির্যাতন। নারী ধর্ষণ হয়ে পড়ল প্রাত্যহিক ব্যাপার, হাজারে হাজারে। সোমোসার বিরোধী হওয়া আর খুন হওয়া দাঁড়াল সমার্থক।

ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দেবার আগে আনাস্তাসিয়ো সোমোসা ছিলেন পুরনো গাড়ির ব্যাপারী। ক্ষমতা দখলের সময়েও তাঁর বিত্ত বিশেষ ছিল না। কিন্তু ১৯৭৯ সালে গদিচ্যুত হবার সময়ে সোমোসো-পরিবারের সম্পত্তির দাম ছিল আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ কোটি ডলার। সোমোসা পরিবার ও তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করলেন নিকারাগুয়ার অর্থনীতি।

১৯৪৪ সালে আনাস্তাসিয়ো সোমোসা ছিলেন ৫১টা 'ক্যাট্‌ল্ র‍্যাঞ্চ' (cattle ranch) আর ৪৬টা কফি খামারের মালিক। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরিবহণ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জমিজমার ব্যবসা, ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে 'বেসবল টিম', দোকানবাজার সবই চলে গেল তাঁর মালিকানায়। নিকারাগুয়ার যত চিনির কল তার অর্ধেকই গেল আনাস্তাসিয়োর হাতে। মাছের ব্যবসার বারো আনা, চালের ব্যবসার শতকরা ৪০ ভাগ, দুধের কারবার—সবই আনাস্তাসিয়োর। তামাক ব্যবসা আর সিমেন্টের কারখানাতেও সিংহভাগটা ছিল তাঁরই। রাস্তা তৈরির পাথর আর ইঁট সবটাই তৈরি হত সোমোসা-পরিবারের কারখানায়। পরে ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে লড়ার সময়ে শহরের তরুণতরুণীরা এগুলো দিয়েই ব্যারিকেড খাড়া করেছিলেন। জাতীয় জাহাজ কোম্পানি আর বিমান সংস্থা-দুটোই ছিল সোমোসা-পরিবারের সম্পত্তি। দুটো টিভি-কেন্দ্র, একটি বেতারকেন্দ্র ও একটি দৈনিক পত্রিকাও ছিল সোমোসার নামে। ১৯৭৫ সাল নাগাদ দেখা গেল পাঁচশোরও বেশি করপোরেশনে সোমোসা পরিবারের বেশ বড় শেয়ার রয়েছে।

সোমোসা-পরিবার যে বিনা বাধায় এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হতে পারলেন তার প্রধান কারণ ছিল মার্কিন সরকারের প্রতি সোমোসাশাহীর অবিচল সমর্থন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট একবার বলেছিলেন : "Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch."

সোমোসাদের অধীনে নিকারাগুয়া হয়ে পড়ল মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির এক চমৎকার ক্রীড়নক। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় সংখ্যাগুরু ভোটে নির্বাচিত আরবেন্স-সরকারকে উৎখাত করার জন্য মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ যে আক্রমণ চালাল তার আগে আগ্রাসী বাহিনীকে তালিম দেওয়া হল নিকারাগুয়ায়। ১৯৬১ সালে মার্কিন সরকারের পরিচালনায় বে অফ পিগস্-এ কিউবার ওপর আক্রমণ হল। সেই আক্রমণ অভিযান চালান হল নিকারাগুয়ার পূর্ব উপকূল থেকে। জাতিসঙ্ঘে

সোমোসার নিকারাগুয়া ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অক্লান্ত সমর্থক। এই সব চূড়ান্ত আনুগত্যের প্রতিদান হিসেবে মার্কিন সরকার সোমোসা-পরিবার ও তাঁদের ঘাতক বাহিনীকে দশক দশক ধরে যা ইচ্ছে তাই করে যাবার সুযোগ দিলেন।

## জনগণের অবস্থা

কয়েক দশক ধরে সোমোসা পরিবারের সম্পত্তি যে হারে বেড়ে চলল, নিকারাগুয়ার জনসাধারণের দুর্দশাও বেড়ে চলল সেই একই হারে। ইস্কুল, হাসপাতাল, মায় বিদ্যুৎ ও জল এগুলো সাধারণ মানুষের স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেল।

১৯৭৯ সালে সোমোসাশাহীর পতনের সময়ে দেশের অর্ধেকেরও বেশি লোক ছিলেন নিরক্ষর। শিশুমৃত্যুর হার ছিল, সাধারণভাবে প্রতি ১ হাজারে ১৩০। আর গরিব এলাকাগুলোয় প্রতি ১ হাজারে ৩৩০। ১৯৭৬ সালে জাতিসঙ্ঘের এক সমীক্ষায় দেখা গেল যে পাঁচ বছরের নীচে যত শিশু রয়েছে নিকারাগুয়ায়, তাদের মধ্যে শতকরা ৫৭ জনই ভুগছে অপুষ্টিতে।

রাজধানী মানাগুয়ায় (যা ছিল দেশের সবচেয়ে উন্নত শহর) শতকরা ৮৭ জন নাগরিকই ছিলেন জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা আর পয়ঃনালী—এর একাধিক থেকে বঞ্চিত। প্রতি দশটি বাড়ির মধ্যে একটির ছাদ ছিল আস্ত। শতকরা ৫০ জন রুগীর জন্য চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বিশ হাজারেরও বেশি নিকারাগুয়ান ভুগছিলেন অতি খারাপ ধরনের যক্ষ্মায়।

১৯৭২ সালে নিকারাগুয়ার লোকসংখ্যা যখন কুড়ি লক্ষ, তখন ডাক্তারদের সংখ্যা ছিল ১ হাজারেরও কম এবং সব মিলিয়ে পাঁচশো সেবিকাও ছিলেন না। ১৯৭৭ সালে সারা দেশের হাসপাতালে মাত্র ৫০৫২ জন রুগীকে রাখার ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষা-ব্যবস্থাটা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সম্পত্তি। সত্তর দশকের মাঝামাঝি দেখা গেল নিকারাগুয়ার শতকরা মাত্র ৫ জন প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছেন। মাধ্যমিক স্কুলের অর্ধেকই ছিল প্রাইভেট। সরকারি স্কুলেও মাইনে যা ছিল সেটা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

গ্রামাঞ্চলে মানুষের দশা ছিল আরও করুণ। অধিকাংশ চাষী ও ক্ষেতমজুরের জন্য চিকিৎসা বা শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। দেশের মোট আবাদী জমির অর্ধেকই ছিল মাত্র শ'দুয়েক পরিবারের মালিকানায়। একেবারে গরিব চাষীদের হাতে (সংখ্যায় তাঁরাই ছিলেন অর্ধেক) ছিল কুল্লে শতকরা মাত্র ৩.৪ ভাগ জমি। বছরে ৩ থেকে ৪ মাস চাষ হতো। তার বাইরে কারও কোনও কাজ জুটত না। অথচ শুধু চাষ-আবাদ করে গ্রাসাচ্ছাদন করার উপায়ও ছিল না অধিকাংশ চাষীর।

শ্রমিকরা যে তাদের অধিকারের জন্য জোট বেঁধে লড়াই করবেন তার কোনও পথ ছিল না। শতকরা মাত্র ৬ জন শ্রমিক ছিল ইউনিয়নের সদস্য। ইউনিয়ন ছিল

মোট ছটি। তার মধ্যে একটি ছিল সোমোসার হাতে। বেকারত্বের হার ছিল সাধারণভাবে ৩৬%। মাঝেমধ্যে তা ৫০%-এও উঠত।

সামাজিক-অর্থনৈতিক অবিচারের শিকার যাঁরা হন, প্রায়ই দেখা যায় যে প্রকৃতিও যেন তাঁদের প্রতি বিরূপ। ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মানাগুয়া শহরের বিশাল একটা অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। ১০ হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারায়। জখম হয় ৫০ হাজার। ২ লক্ষ মানুষ হল গৃহহীন।

পৃথিবীর চারদিক থেকে সাহায্য আসতে লাগল। সোমোসা ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তার বেশির ভাগটাই পকেটে পুরলেন। নানা দেশের মানুষ রক্তদান করেছিলেন আহতদের বাঁচানোর জন্য। সোমোসা এমনকি সেই রক্তও বেচে দিলেন। সভ্য পশ্চিমি দুনিয়ার সরকারগুলো যুগ যুগ ধরে দেখে গেলেন এই খেলা। নিকারাগুয়ার জনগণ কিন্তু....মন্দা তখন চরমে পৌঁছেছে। মার্কিনি জনগণ তখন প্রশ্ন তুলতে লাগলেন, স্বদেশে যখন লক্ষ লক্ষ লোক বেকার তখন মধ্য আমেরিকায় একটা দখলদার বাহিনীকে পোষা হচ্ছে কোন যুক্তিতে।

স্বদেশে এই বিক্ষোভ আর খোদ নিকারাগুয়ায় সান্‌দিনো বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধ এই দুয়ের চাপে পড়ে মার্কিন সরকার ১৯৩৩ সালে মেরিন বাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। সানদিনো ও তাঁর সহযোদ্ধাদের জয় হল একদিক দিয়ে। কিন্তু যাবার আগে মার্কিনিরা গড়ে তুলেছিলেন এক শক্তিশালী ঘাতকবাহিনী-ন্যাশনাল গার্ড, আর আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রধান পদে। এক সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের অজুহাতে সোমোসা ডেকে পাঠালেন সান্‌দিনোকে। সেই বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতও হাজির ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে জাতীয় প্রাসাদ থেকে বেরোনোর মুখে ন্যাশনাল গার্ডের ঘাতকরা সান্‌দিনো ও তাঁর তিন সহকারীকে খুন করল। এটা করা হল আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসার বিশেষ হুকুমে ও মার্কিনিদের নীরব সমর্থনে। তার পরের কদিনে তিনশো জন বিশিষ্ট 'সান্‌দিনিস্তা' বা সান্‌দিনোপন্থী খতম হলেন। উত্তর নিকারাগুয়ায় সান্‌দিনো যে সব কৃষক সমবায় গড়ে তুলেছিলেন তার শয়ে শয়ে চাষীকেও মেরে ফেলা হল ন্যাশনাল গার্ড পাঠিয়ে।

কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে আগুন ততদিনে ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে, তা আর নেবানো গেল না। সান্‌দিনো ফৌজের যে সব গেরিলা তখন জীবিত তাঁরা গোটা তিরিশ দশক জুড়ে বিক্ষিপ্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক ও ছাত্রছাত্রীরা একযোগে উঠে দাঁড়ালেন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

১৯৫৬ সালে 'লেয়ন' শহরে আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসার সম্মানে একটা নাচগান ও পানভোজনের আসর চলছে—এমন সময়ে রিগোবের্তো লোপেস পেরেস নামে এক তরুণ কবি ঢুকলেন সেখানে। দু এক পাক 'চা চা চা' নেচেই নাদুস নুদুস সোমোসার বুকে চারটি বুলেট সেঁধিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর নিজের কপালে জুটল যাটটি বুলেট। স্বৈরাচারী আনাস্‌তাসিয়ো ও বিদ্রোহী রিগোবের্তো দুজনেই প্রাণ

হারালেন। রিগোবের্তোর লাশ দুদিন পড়েছিল সেখানে। ন্যাশনাল গার্ডের ভয়ে তাঁর বাবা মা দুদিন যেতে পারেননি ছেলে মৃতদেহ উদ্ধার করতে। আজ, মুক্ত নিকারাগুয়ায় রিগোবের্তো লোপেস পেরেস পেয়েছেন জাতীয় বীরের সম্মান।

সোমোসার মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে লুইস হলেন কর্ণধার। ১৯৬৭ সালে অপর এক ছেলে আনাস্তাসিয়ো সোমোসা দেবাইলে শাসনক্ষমতা টেনে নিলেন নিজের হাতে।

সান্দিনোর নেতৃত্বে কৃষক মজুর ও সাধারণ মানুষের একনিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং রিগোবের্তোর বীরত্ব ও আত্মত্যাগ—এই দুই ঐতিহ্যের মিলনে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে জন্ম নিল 'ফ্রেন্তে সান্দিনিস্তা দে লা লিবেরাসিয়োন নাসিয়োনাল' বা সানদিনিস্তা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। সংক্ষেপে এফ. এস. এল. এন।

১৯৫০ দশকের শেষদিকে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তার তিন নেতা : কার্লোস ফন্সেকা আমাদোর, তোমাস বর্হে ও সিল্ভিয়ো মায়োর্গা হাত মেলালেন সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী অন্যান্যদের সঙ্গে। তাঁরাই সান্দিনিস্তা ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা। জেনারেল সান্দিনোর এক সহযোদ্ধা কর্নেল সান্তোস লোপেসও এসে যোগ দিলেন গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে। সান্দিনিস্তারা শুধু যে সান্দিনোর মতবাদ ও লড়াই থেকে প্রেরণা পেলেন তাই নয়, ১৯৫৯ সালের কিউবান বিপ্লবও তাঁদের চোখের সামনে থাকল একটা আদর্শ হিসেবে।

নবীন সান্দিনিস্তারা নিকারাগুয়ার উত্তর অঞ্চলে গেরিলা তৎপরতা শুরু করে দিলেন। প্রথম চোটে বেশ বড় মাপের ক্ষতি স্বীকার করতে হল তাঁদের। কিন্তু তাঁরা দমলেন না। পাহাড়ে, জঙ্গলে, শহরের আনাচে-কানাচে, কৃষক ও ছাত্রসমাজে, কারখানায় আর গরিবদের মহল্লায় চলতে লাগল সংগ্রাম ও প্রতিরোধ। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা গা ঢাকা দিয়ে। সশস্ত্র লড়াই আর সাংগঠনিক কাজকর্মের পাশাপাশি সমানতালে চলতে লাগল তাত্ত্বিক কাজ, জাতীয় মুক্তি আর মৌলিক সামাজিক সংস্কারের বাস্তবিক পরিকল্পনা।

এর জবাবে সোমোসা ও ন্যাশনাল গার্ড আদায় করে নিল চরম মূল্য। শয়ে শয়ে সান্দিনিস্তা খুন হতে লাগলেন। সান্দিনিস্তা গেরিলা সন্দেহে হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করা হল। চলল অকথ্য নির্যাতন। লাতিন আমেরিকায় দক্ষিণপন্থী নির্যাতনের এক অন্যতম পন্থা হল মেয়েদের সদলে বলাৎকার ও তারপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা, এবং পুরুষদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একে একে কেটে ফেলা। অসংখ্য মানুষ এর শিকার হলেন। (মনে রাখা দরকার যে এল সালভাদোর ও গুয়াতেমালায় সরকার-বিরোধীদের ঢিট করার জন্য এই পদ্ধতি আজও প্রয়োগ করা হচ্ছে।)

## সোমোসাতন্ত্রের পতন ও মুক্ত নিকারাগুয়ার জন্ম

সান্দিনিস্তাদের নাছোড়বান্দা লড়াই, সংগঠন আর আত্মত্যাগের দরুন দেড়

দশকের মধ্যেই নিকারাগুয়ার সাধারণ মানুষ ও কৃষকমজুর শ্রেণী তাঁদের সমর্থক হয়ে পড়লেন। গেরিলাদের কব্জা করতে গিয়ে সোমোসা ও ন্যাশনাল গার্ড প্রথমেই যাঁদের ওপর চরম অত্যাচার চালাল, তাঁরা নিরস্ত্র গ্রামবাসী। এঁরা এমনিতেই শোষিত ও নিপীড়িত। তাঁর ওপর সমানে মার খেতে খেতে এঁরা যে শেষমেশ আর মুখ বুজে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন না, গেরিলাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন, এটাই স্বাভাবিক। শহরের মধ্যবিত্ত ছাত্র সমাজেও বিপ্লবী চেতনা ছড়িয়ে পড়েছে ততদিনে। এমন সময়ে ১৯৭৮ সালে ন্যাশনাল গার্ড সোমোসাবিরোধী পত্রিকা 'লা প্রেন্সার' (La Prensa)-এর সম্পাদক পেদ্রো হোয়াকিন্ চামোর্‌রোকে খুন করল।

হাজার হাজার লোক পথে নেমে পড়ল এর প্রতিবাদে। দেশের অর্থনীতির প্রায় পুরোটাই সোমোসার হাতে চলে যাওয়ায় নিকারাগুয়ায় বেশ কিছু ব্যবসায়ীও সোমোসাবিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। চামোর্‌রো হত্যার প্রতিক্রিয়ায় যে গণ-আন্দোলন চাগিয়ে উঠল সেটাকে নিজেদের হাতে আনার আশায় এই সব বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী এক সপ্তাহ ধর্মঘট ডাকলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়ল।

এর ঠিক এক মাসের মাথায় 'মাসায়া' শহরের 'মোনিম্‌বো' নামে এক ইন্ডিয়ান মহল্লায় শুরু হল বিদ্রোহ। এটা সামলাতে না পেরে সোমোসা হুকুম দিলেন : "মোনিম্‌বো মহল্লায় বিমান থেকে বোমা ফেলো।" হাজার হাজার লোক মারা গেল। শয়ে শয়ে তরুণ তরুণীকে খুন করা হল, কারণ তাঁরা তরুণ তরুণী—অতএব তাঁরা গেরিলা হতে পারেন।

কয়েক মাস পরেই, ১৯৭৮ সালের অগাস্ট মাসে ২৫ জন তরুণ সান্‌দিনিস্তা গেরিলা জাতীয় প্রাসাদটা দখল করলেন এক অতর্কিত আক্রমণে। সোমোসার পুতুল জাতীয় সংসদের ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সবাই হলেন পণবন্দী। এঁদের মুক্তির বিনিময়ে গেরিলারা ৮০ জন রাজবন্দীকে (তাঁদের মধ্যে সান্‌দিনিস্তা ফ্রন্টের এক অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তোমাস বর্হেও ছিলেন) ছাড়িয়ে এনে নিরুপদ্রবে সকলের বিদেশ যাত্রার অনুমতি আদায় করে নিলেন। পণবন্দীদের মুক্তির আর-এক শর্ত হিসেবে সোমোসা বাধ্য হলেন দেশের সবকটা কাগজে (এমন কি তাঁর নিজের কাগজেও) একটি সান্‌দিনিস্তা ইশ্‌তেহার ছাপাতে। এই প্রাসাদ আক্রমণের এক অন্যতমা কমান্ডার ছিলেন বাইশ বছরের তরুণী দোরা মারিয়া তেইয়েস্। আজ তিনি গেরিলা কমান্ডারের পদ পেয়েছেন।

কমান্ডার দোরা ও কমান্ডার এদেন পাস্তোরার নেতৃত্বে গেরিলারা ৮০ জন রাজবন্দীর মধ্যে ৬০ জনকে মুক্ত করতে পারলেন। বাকি ২০ জন ততদিনে বন্দী অবস্থাতেই খুন হয়ে গিয়েছেন। কমান্ডার তোমাস বর্হেও ছাড়া পেলেন। জেলখানায় তাঁকে একটানা ন'মাস চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। আর তাঁর সেলের গরাদের সঙ্গে তাঁকে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল টানা সাত মাস। সান্‌দিনিস্তা ফ্রন্টের তিন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে তোমাস বর্হেই আজ জীবিত। ফন্‌সেকা ও মায়োর্‌গা সত্তরের দশকে

লড়াই-এ শহীদ হন। তোমাস আজ নিকারাগুয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি বন্দী থাকাকালে তাঁর স্ত্রীকে ন্যাশনাল গার্ড প্রথমে অকথ্য নির্যাতন ও পরে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল।

কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে প্রাসাদ দখলের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ১৯৭৪ সালে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সম্মানে এক খানাপিনার আসর চলাকালে সান্‌দিনিস্তা গেরিলাদের একটি দল সেখানে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে পণবন্দী আটক করেছিলেন। সেবারেও মুক্তি-শর্ত ছিল : রাজবন্দীদের মুক্তিদান, শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো, ৫০ লক্ষ ডলার নগদ এবং সব কটা কাগজে ও বেতারে সান্‌দিনিস্তাদের বৈপ্লবিক ইশ্‌তেহার প্রচার।

৭৪-এর ঐ গেরিলা সাফল্যের পর সোমোসা কালবিলম্ব না করে মার্কিন সরকারের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তা পেয়েছিলেন। ফলে ৭৬ ও ৭৭ সালের লড়াইয়ে অনেক সান্‌দিনিস্তা গেরিলা প্রাণ হারান। ৭৮-এর প্রাসাদ আক্রমণের পর কিন্তু বিদেশি উপদেষ্টাদের দিয়ে আর সুবিধে হল না। গেরিলাদের উপর্যুপরি সাফল্য দেখে সারা দেশে সক্রিয় বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে শামিল হলেন অসংখ্য তরুণ তরুণী। সান্‌দিনিস্তাদের নেতৃত্বে নিকারাগুয়ার সর্বত্র বিদ্রোহ ফুঁসে উঠল। ৭৮-এর অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেশের ছোট বড় প্রতিটি শহরে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ব্যারিকেড খাড়া করলেন পথে পথে। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়লেন তাঁরা ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে। শহিদ হলেন তাঁরা হাজারে হাজারে। শ্রমিকপাড়া, ইস্কুল আর কারখানাগুলোর ওপর এলোপাথাড়ি বোমা ফেলে গেল সোমোসার জঙ্গী বিমান।

৭৮-এর অভ্যুত্থান ফলপ্রসু হল না। কিন্তু ব্যাপক সংঘর্ষের দিক দিয়ে, ব্যারিকেড-লড়াই আর শহরে শহরে গেরিলা যুদ্ধের দিক দিয়ে ৭৮ বয়ে আনল মূল্যবান অভিজ্ঞতা। ৭৯'র মে মাসে সান্‌দিনিস্তারা চূড়ান্ত অভিযান শুরু করলেন সোমোসাশাহীর বিরুদ্ধে। সারা দেশের মানুষ আবার সাড়া দিলেন তাঁদের ডাকে। জুন মাসের গোড়ায় সান্‌দিনিস্তাদের ডাকা এক সাধারণ ধর্মঘট পঙ্গু করে দিল গোটা দেশটাকে।

ওয়াশিংটনও তখন তৎপর। মার্কিন সরকার তখন প্রাণপণ চেষ্টা করছেন শেষরক্ষা করতে—সান্‌দিনিস্তাদের নেতৃত্ব জনগণের বিজয়ের পথ রোধ করতে। কিন্তু ভিয়েতনামের স্মৃতি তখনও এত দগ্‌দগে যে এক নৃশংস ডিক্‌টেটরের জন্য মার্কিনি সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব মার্কিনি জনগণের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে সোমোসাকে সরাসরি সামরিক সাহায্য পাঠাতে পারল না ওয়াশিংটন।

কার্টার সরকার তখন চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা (ও এ এস) নিকারাগুয়ায় এক শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায়। উদ্দেশ্য : সানদিনিস্তারা যাতে যুদ্ধে না জেতেন। কিন্তু এমনিতে মার্কিন সরকারের বশংবদ এই সংস্থা এবারে বেঁকে বসলেন। উল্টে, সোমোসার নৃশংসতায় ক্ষেপে গিয়ে মেক্সিকো, পানামা, একুয়াদোর ও কস্তারিকা সোমোসাশাহীর সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। জিমি কার্টার

তখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছেন "আলোচনার মাধ্যমে" একটা নিষ্পত্তি ঘটিয়ে সানদিনিস্তাদের ঠেকাতে। কিন্তু নিকারাগুয়ায় এমন কাউকে পাওয়া গেল না যাকে দিয়ে এ কাজ হাসিল হতে পারে। মার্কিন সরকারের সুসম্পর্ক ছিল কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে সান্‌দিনিস্তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা ও-হেন ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এদিকে সোমোসার নৃশংসতার ছবি নানা দেশের মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় তখন নিয়মিত দেখে চলেছেন। সৈন্যরা শিশুহত্যা করছে, ট্যাংকবাহিনী ভেঙে ফেলছে গরিব শ্রমিকদের বস্তি, হাসপাতাল আর স্কুলবাড়ির ওপর পড়ছে সরকারি বোমা। লক্ষ লক্ষ মানুষ একদিন টেলিভিশনে একটি বিশেষ ছবি দেখলেন : মার্কিনি সংবাদ মাধ্যম এ বি সি'র সাংবাদিক বিল স্টুয়ার্টকে ন্যাশনাল গার্ড ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছে। সোমোসার বর্বরতার এই জলজ্যান্ত প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে মার্কিনি জনগণও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এরপর আর কার্টারের পক্ষে সোমোসাকে প্রকাশ্যে সাহায্য করা কোনমতেই সম্ভব হল না। তাঁর সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ৭৯'র ১৭ জুলাই সোমোসা পালিয়ে গেলেন—অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

ন্যাশনাল গার্ড গেল ভেঙে। সরকারি সৈন্যরা নিজেদের উর্দি ছিঁড়ে পালাতে লাগল। ৭৯ সালের ১৯ জুলাই সানদিনিস্তা ফ্রন্টের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা সার বেঁধে ঢুকলেন মানাগুয়ায়। কেউ বাধা দিল না।

পরের দিন, বিশে জুলাই, আড়াই লক্ষ মানুষের এক বিজয়সমাবেশে কমান্ডার তোমাস বর্হে এক নতুন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন : "এবারে যুদ্ধ অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ধ্বংসের বিরুদ্ধে।"

## নিকারাগুয়ার বিপ্লব ও জাতীয় পুনর্গঠন

গৃহযুদ্ধে গোটা দেশটা পরিণত হয়েছিল এক বিশাল ধ্বংস্তূপে। নিহতের সংখ্যা ৪০ হাজার। জখম হন ১ লক্ষ মানুষ। ২ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে পড়েন। ৪০ হাজার শিশু অনাথ হয়ে যায়। সান্‌দিনিস্তারা যখন ক্ষমতা দখল করলেন সে-মুহূর্তে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোক নিরন্ন। সোমোসার জঙ্গিবিমান যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কলকারখানাগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। শস্য নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিল ন্যাশনাল গার্ড। এবং ৮০ সালের জন্য তেমন শস্য রোপণ করাও হয়নি যুদ্ধের ডামাডোলে।

আনাস্‌তাসিয়ো সোমোসা দেবাইলে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন রাজকোষের বেশির ভাগ নগদ টাকা নিয়ে। পড়েছিল মাত্র সাড়ে তিরিশ লক্ষ ডলার। এটা আর বিমানে তোলা সম্ভব হয়নি। নিকারাগুয়ার বৈদেশিকা ঋণ ছিল তখন ১৬০ কোটি ডলার।

নতুন সরকারের সামনে তখন পাহাড় প্রমাণ কাজ। দেশের মানুষকে খাবার, আশ্রয়, জামাকাপড়, ওষুধপত্র দিতে হবে। গোটা দেশটাকে গড়ে তুলতে হবে। সশস্ত্র সোমোসাপন্থীদের দল তখনও দেশের কোণে কোণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং বেশ কিছু ন্যাশনাল গার্ড তখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে ফের ক্ষমতা দখলের জন্য জোট বাঁধতে শুরু করেছে। কাজেই প্রতিরক্ষার দিকেও নজর না দিলেই নয়। পরে রেগন সরকার এই সব সোমোসাপন্থী ও ন্যাশনাল গার্ডকে 'মুক্তিযোদ্ধা'' আখ্যা দিয়ে তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জোগানোর দায়িত্ব নিলেন।

সান্‌দিনিস্তাদের সামনে তখন এই যে এত এত কাজ তা সম্পন্ন করার মতো নতুন প্রতিষ্ঠান একটাও ছিল না। নিকারাগুয়ার জনগণের জীবন উন্নত করে তোলার যে বৈপ্লবিক সংকল্প সানদিনিস্তাদের ছিল তা কাজে পরিণত করার জন্য প্রথমে গড়ে তুলতে হল নতুন সব বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান। শুরু হল নিকারগুয়ার বিপ্লব।

নতুন সরকারকে যে কীভাবে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কমান্ডার তোমাস বর্হে বলেছেন : ''আমাদের ছিল কেবল উপাধি— তুমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, তুমি হলে সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট। রাজ্য শাসন কাঠামো বলতে কিছুই ছিল না। এমন কি কোনও দপ্তরও ছিল না আমাদের। ছিল না ফাইল বা কাগজপত্র। কিচ্ছু ছিল না আমাদের। বিলকুল কিচ্ছু ছিল না।''

নিকারাগুয়ার বিপ্লব এই কিচ্ছু না থাকার অবস্থা থেকে শুরু হল, এগিয়ে চলল।

বিপ্লবী সরকার সোমোসা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেগুলো জনগণের কাজে লাগিয়ে দিলেন। ২০ লক্ষ একর আবাদী জমি সরাসরি চলে এল সরকারি মালিকানায়। সমস্ত দেশি ব্যাংকের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হল। সান্‌দিনোর তত্ত্ব ও আদর্শ অনুসারে দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করা হল, টেনে আনা হল তাঁদের দেশ পরিচালনার প্রক্রিয়ায়।

সোমোসার পতনের দু'সপ্তাহের মধ্যে বিপ্লবী সরকার নিকারাগুয়ার নিরক্ষর জনগণকে লেখাপড়া শেখানোর এক ঐতিহাসিক পরিকল্পনা হাতে নিলেন। নিকারাগুয়ার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ তখন নিরক্ষর। প্রায় ১ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী এই বিশাল অভিযানে যোগ দিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই স্কুলের ছাত্রছাত্রী। ছ'মাসের ভেতর এই বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা লিখতে পড়তে শেখাল অন্তত ৪ লক্ষ ৬ হাজার গ্রামবাসীকে। স্প্যানিশ ছাড়া আর যেসব আঞ্চলিক ভাষা নিকারাগুয়ায় আছে সেগুলোর মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হল আরও ১২ হাজার মানুষকে। শহুরে স্বেচ্ছাসেবীরা ('ব্রিগাদিস্তা') একদিকে যেমন তাঁদের নিরক্ষর দেশবাসীদের লেখাপড়া শেখালেন, অপরদিকে তেমনি তাঁরা নিজেরাও শিখে নিলেন কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের শরিক হতে। চাষের কাজ, ঘরের কাজ, নির্মাণের কাজ শিখলেন তাঁরা। কৃষক কুমোর কামার তাঁতি জেলেদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শহুরে ব্রিগাদিস্তারা গ্রামে গ্রামে গড়ে তুললেন শয়ে শয়ে সেতু, খুঁড়ে চললেন কুয়োর পর কুয়ো, তৈরি করলেন পাঠশালা, স্কুলবাড়ি।

নিরক্ষরতা দূর করার এই জেহাদের পর বিপ্লবী সরকার প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এক বিশেষ শিক্ষা-কার্যক্রম চালু করলেন। ৮১ সালের মাঝামাঝি দেখা গেল ৮ লক্ষ ৮৩ হাজার মানুষ—অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ—কোনও-না-কোনও বিষয়ে রীতিমতো পাঠ নিচ্ছেন।

গ্রামের কৃষক ও ক্ষেতমজুর

নিকারাগুয়ার বিপ্লবের প্রথম বছরেই ৪৫ হাজার ভূমিহীন চাষীকে আবাদী জমি দেওয়া হল। বিপ্লবের পর থেকে ২৫ লক্ষ একরেরও বেশি জমি চলে এসেছে রাষ্ট্রের হাতে। এর বেশির ভাগটাই পরিণত হয়েছে বিশাল বিশাল সরকারি খামারে। হাজার হাজার খামার শ্রমিক ও ক্ষেতমজুর সেখানে সারা বছর কাজ পাচ্ছেন। বিপ্লবের আগে বছরে তিন-চার মাসের বেশি কাজ পাওয়া (তাও কপাল নেহাতই ভাল হলে) নিকারাগুয়ার অধিকাংশ ক্ষেতমজুরের স্বপ্নের নাগালেও ছিল না।

রাষ্ট্রীয় খামারে উৎপাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন চাষী ও মজুররা নিরন্তর আলোচনার মাধ্যমে। এই সব খামার থেকে যা আয় হয় তার একটা বড় অংশ যায় সামাজিক প্রকল্পে। ফলে নিকারাগুয়ার হাজার হাজার চাষী ও শ্রমিক বিপ্লবের পরই প্রথম জানতে পারলেন ডাক্তার, হাসপাতাল বা ইস্কুল কাকে বলে।

অপরদিকে সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে পাওয়া হাজার হাজার একর জমিতে এককালের ভূমিহীন চাষীরা গড়ে তুলেছেন কৃষি সমবায়।

যেসব খামারজীবী আগে থেকেই জমির মালিক ছিলেন তাঁদেরও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে বিপণন, উৎপাদন ও ঋণ সমবায়ে যোগ দিতে। এর ফলে ছোট চাষীরা সহজেই তাঁদের পণ্য বাজারে পাঠাতে পারছেন এবং বীজ, সার, চাষের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পেয়ে যাচ্ছেন নামমাত্র মূল্যে।

ঋণ সমবায়ের নিয়মটা হল এই যে, যে চাষী জমি ও অর্থের দিক দিয়ে যত কমজোরি, তিনি তত বেশি ঋণ পাবেন। সমবায়গুলোকে সুদ দিতে হয় সবচেয়ে কম।

নিকারাগুয়ার গ্রামে গ্রামে পল্লীমজদুর সমিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। কৃষিদপ্তরে এই সব সমিতির আসন পাকা ও তাঁদের কণ্ঠ সবচেয়ে জোরালো। এঁরা যা বলেন, সেটাই মোটামুটি আইন। পল্লীমজদুর সমিতি সবচেয়ে বেশি সজাগ গ্রামের কিষাণ মজদুরদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে, তাঁদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে। কারণ নিকারাগুয়ায় চাষ আবাদের অনেকটাই রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানায়। এই প্রাইভেট সেক্টরে মজদুরদের স্বার্থ রক্ষা করা পল্লীমজদুর শ্রমনীতির একটা বড়ো কাজ। এঁদের চেষ্টায় ও সংগ্রামে ক্ষেতমজুরদের পারিশ্রমিক বিপ্লবের এক বছরের মধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে যায়।

দেশের ভুট্টা, বিন, চাল আর কফির একটা বড় অংশের জন্য সানদিনিস্তা সরকারকে নির্ভর করতে হয় ছোট ও মধ্য চাষীর ওপর। এঁরা বিপ্লব বিরোধী হয়ে

পড়লে তার ফল হতো অতি গুরুতর। কিন্তু এঁরা প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে বিপ্লবের সমর্থক। তার একটা বড় কারণ হল সরকারের ঋণনীতি। আর-একটা উল্লেখযোগ্য কারণ : বুনিয়াদী খাদ্যদ্রব্য কেনাবেচার জন্য সরকার একটা সংস্থা তৈরি করেছেন। ফলে চাষীরা তাদের পণ্যগুলো ন্যায্য মূল্যে সরাসরি এই সরকারি সংস্থার কাছে বেচতে পারে। মধ্যস্থ বা দালালদের কাছে তাদের আর যেতে হচ্ছে না। এইভাবে দালাল শ্রেণীও আপনিই লোপ পাচ্ছে। অপরদিকে সরকার আর একটি সংস্থা তৈরি করেছেন কীটনাশক ওষুধ, সার, চাষের যন্ত্রপাতি আর যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য। এগুলো চাষীরা অনেক কম দামে পেয়ে যায়। তাছাড়া কৃষি বিশেষজ্ঞ, পশু চিকিৎসক আর অন্যান্য প্রকৌশলীদেরও কৃষিদপ্তর নিয়মিত পাঠিয়ে দেন ছোট চাষীদের কাছে। এর জন্য চাষীদের কোনও টাকা লাগে না।

## কলকারখানার শ্রমিক

বিপ্লবের পর শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নগুলোয় যোগ দিতে লাগলেন হাজারে হাজারে। বেশির ভাগই যোগ দিলেন সান্দিনিস্তা শ্রমিক ফেডারেশনে। শ্রমিকদের স্বার্থে বিশেষ আইন চালু করা হল প্রথম থেকেই। নিকারগুয়ার ইতিহাসে মজদুররা সেই প্রথম সবেতন ছুটি পেল। কাজের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হল। বিপ্লবের আগে এসবের বালাই ছিল না। হাজার হাজার শ্রমিককে টেনে আনা হল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে শ্রমদপ্তর ও স্বাস্থ্যদপ্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা হল। তাছাড়া শ্রমিকদের নিয়েই একটি বিশেষ তদারক কমিটি তৈরি হল। এই সমিতির অধিকার আছে কোনওরকম জানান না দিয়েই যে কোনো সময়ে যে কোনও কারখানা পরিদর্শন করার—শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর কিনা সেটা যাচাই করতে। সমিতি এই কাজটা নিয়মিত করে থাকেন। কলকারখানার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকরা যাতে সক্রিয় অংশ নিতে পারে, সান্দিনিস্তা সরকার তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

## অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা

শতাব্দীব্যাপী মার্কিনি কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের কারণে নিকারাগুয়ার অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবেই অনগ্রসর, অনুন্নত। নিকারাগুয়ার শাসকবর্গ ও পুঁজিপতিরা দেশটাকে একরকম বেচেই দিয়েছিলেন মার্কিন সরকার ও মার্কিনি পুঁজিপতিদের কাছে। বিনিময়ে পেয়েছিলেন তাঁরা সামরিক সাহায্য-সমর্থন ও শ্রেণীগত ফায়দা। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত নিকারাগুয়ার শ্রমিক কৃষক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী কখনও নামমাত্র মূল্যে, কখনও বা স্রেফ বিনামূল্যে বিদেশি ও স্বদেশি শাসক শ্রেণীর দাসত্ব করেই কাটিয়েছেন।

বিপ্লবের পর খামারজীবী ও কৃষকদের জাতীয় সমিতির প্রথম সম্মেলনে ভাষণ

দিতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী হাইমে হুইলক্ বলেছিলেন : "নিকারাগুয়া হল ঠিক এক 'কাম্পেসিনোর' (চাষীর) মতো। দু'জনেরই জমি আছে। দু'জনেই উৎপাদন করে। আপনারা শস্য ফলান, যা আপনাদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয় শস্তায়। আর আপনাদের যা যা দরকার—তা সে জামাকাপড়ই হোক আর অন্য যাই-ই হোক—সেগুলো বেচা হয় আপনাদের কাছে সাংঘাতিক চড়া দামে। অর্থাৎ দু'দিক দিয়েই আপনাদের ক্ষতি। নিকারাগুয়ার দশা ঠিক একইরকম। আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারে নিকারাগুয়া ঠিক আপনাদের মতোই শোষিত।"

দেশকে কী রাজনীতি, কী অর্থনীতি—সব দিক দিয়ে শোষণমুক্ত করার জন্য বিপ্লব করে চলেছেন নিকারাগুয়ার জনগণ। এবং দক্ষতা দখলের পর থেকে নিকারাগুয়ায় অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে সাম্যবাদের লক্ষ্যে। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে নিকারাগুয়ার জনগণের অর্থনৈতিক সংগ্রাম অঙ্গাদি জড়ানো আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সঙ্গে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কফি হল নিকারাগুয়ার অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে কফির দাম পড়ে গেলে গোটা দেশটাকেই তার ধাক্কা সামলাতে হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কারণ কফি রপ্তানির টাকা দিয়ে নিকারাগুয়াকে আমদানি করতে হয় অন্যান্য অপরিহার্য জিনিস। ১৯৭৭ সালে ১০০ পাউন্ড নিকারাগুয়ান কফি দিয়ে কেনা যেত ১২.৮ ব্যারেল জ্বালানি তেল। ১৯৮০ সালে ৪.৯ ব্যারেল। আর ১৯৮১ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২.৬ ব্যারেল-এ। এইভাবে নিকারাগুয়ার আমদানি-ব্যয়ের মাত্রা রপ্তানি আয়ের চেয়ে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বিশ্বের সব গরিব দেশের পরিস্থিতিই এক।

তবে সাধারণত দেখা যায়, আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারের দরুন কোনও গরিব দেশের অর্থনীতি মার খেলে তার চোট সবচেয়ে বেশি পড়ে সে-দেশের শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর ওপর। আশির দশকের গোড়ায় কফির দাম পড়ে যাওয়ার মধ্য আমেরিকার সব দেশ, বিশেষত কস্তারিকা, অন্দুরাস ও নিকারাগুয়াকে জরুরি ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। কিন্তু একমাত্র নিকারাগুয়া সরকারই দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বোঝাটা শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের ওপর পড়তে দেননি। বিলাসসামগ্রীর ওপর চড়া আমদানি শুল্ক চাপিয়ে মুশকিল আসানের পথ খুঁজেছেন তাঁরা।

নিকারাগুয়ার সামনে আজ নানান চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যে প্রধান হল সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং মার্কিন মদতপুষ্ট প্রতি-বিপ্লবীদের বিশাল আগ্রাসন। রেগান রাষ্ট্রপতি হবার পর থেকেই উঠে পড়ে লেগেছেন সানদিনিস্তা সরকারকে উৎখাত করতে। এই লক্ষ্যে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্রশস্ত্র জোগানো হচ্ছে নিকারাগুয়া-ছেড়ে পালানো প্রাক্তন ন্যাশনাল গার্ড, অন্যান্য সোমোসাপন্থী এবং অন্দুরাস, এল্ সালভাদোর ও গুয়াতেমালার দক্ষিণপন্থীদের। পড়শি দেশগুলোয় মার্কিনি সামরিক উপদেষ্টারা ঘাঁটি গেড়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন প্রতি-বিপ্লবীদের। অন্দুরাস ও এল সালভাদোর থেকে দক্ষিণপন্থীরা নিকারাগুয়ার উত্তর সীমান্তে ক্রমাগত

আক্রমণ করছে। তাদের প্রধান কাজ নিকারাগুয়ার কফি চাষ লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া ও নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো। ইতিপূর্বে সি আই এ'র টাকায় ও তত্ত্বাবধানে নিকারাগুয়ার একাধিক বন্দরে মাইন পেতে রাখা হয়েছিল যাতে বিদেশি সরবরাহ জাহাজগুলো জখম হয় ও ভয়ের চোটে আর নিকারাগুয়ায় নোঙর না ফেলে। উপরন্তু রেগান সরকার—সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে—গত ৭ মে নিকারাগুয়ার ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছেন।

নিকারাগুয়ার সংস্কৃতি মন্ত্রী যাজক-গেরিলা-কবি ফাদার এর্নেস্তো কার্দেনালের আমন্ত্রণে তিন সপ্তাহের এক সফরে ৬ মে নিকারাগুয়ায় গিয়ে এই নিষেধাজ্ঞার পরিণাম স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল।

ঐতিহাসিকভাবে নিকারাগুয়া নানা দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায় সফল হয়েছে মাত্র ১৯৭৯ সালে। এত তাড়াতাড়ি এই নির্ভরশীলতা ঘোচার নয়—বিশেষত যখন নিকারাগুয়া জোট নিরপেক্ষতার মূল শর্তগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে অন্য কোনও শিবিরে ঢোকেনি। অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস যেমন সার, কৃষির যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, চিকিৎসার সরঞ্জাম, অন্যান্য অসংখ্য যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নিকারাগুয়া বিপ্লবের পরেও আমদানি করছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এই জন্যেই রেগান,—সরাসরি মেরিন বাহিনীকে মৃগয়ায় পাঠাতে না পেরে,—বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছেন, যাতে নিকারাগুয়ার অর্থনীতি ও জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। ৭ মে থেকে নিকারাগুয়ায় যাবতীয় মার্কিনি আমদানি বন্ধ। (উল্লেখ করা দরকার যে অনেক দেশের মতো ভারতও এই নিষেধাজ্ঞার বিরোধী)।

বিশ্বের এক অন্যতম পরাশক্তি এবং আশপাশের চরম দক্ষিণপন্থীদের তরফে পরিচালিত এই ব্যাপক সামরিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে গিয়ে নিকারাগুয়াকে বিপুল কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। জাতীয় সম্পদের শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগই তলিয়ে যাচ্ছে প্রতিরক্ষায়। ফলে উৎপাদন মার খাচ্ছে, কিছু কিছু ভোগ্যপণ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে আর নয়তো তার দাম যাচ্ছে বেড়ে।

অবশ্য চিকিৎসা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রয়েছে আগের মতোই—সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। খাবার দাবার, জ্বালানি, বাস ভাড়া ইত্যাদি আগের মতোই চড়ামাত্রায় সরকারি অনুদানপুষ্ট। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনকল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক প্রকল্পগুলোর খরচও টেনে চলেছেন সান্দিনিস্তা-সরকার।

তিন সপ্তাহ ধরে নিকারাগুয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে প্রকাশ্যে ও একান্তে কথা বলে স্পষ্ট বুঝেছি যে জনগণ বিপ্লবের পক্ষে এবং বিপ্লবের পূর্ণ রূপায়ণে ও আগ্রাসন প্রতিরোধে দৃঢ়সঙ্কল্প।

# আট বছর পরের একদিন

ফেরা আর চলে যাওয়ার অর্থ বিপরীত হলেও চুম্বকের বিপরীত দুই মেরুর মধ্যে যেমন নিবিড় এক সম্পর্ক, এ দুয়ের মধ্যেও যেন তাই। তবে, ভালোবাসায় বাঁধা দু'জন মানুষের মধ্যে যেমন ভালোবাসার মাপ ঠিক সমান হয় না সচরাচর, এর প্রতি ওর ভালোবাসায় আর ওর প্রতি এর ভালোবাসায় মাত্রার হেরফেরটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই স্বাভাবিক হলো ফেরা ও চলে যাওয়ার মধ্যে একটা গরমিলের আভাস। চলে যাওয়ার মধ্যে ফেরার সম্ভাবনাটা (আর কোনওদিন না ফেরার মতোই সমান পরিমাণে) রয়ে গেলেও সেটা অবশ্যম্ভাবী নাও হতে পারে। কিন্তু ফেরার ভেতর চলে যাওয়ার ব্যঞ্জনাটা থাকবেই। চলে না গেলে আর ফেরা কিসের? আট বছর আগে চলে গিয়েছিলাম পশ্চিম জার্মানির এই কোলোন শহরটা ছেড়ে। আট বছর পর ফিরলাম আবার এই শহরেই।

আট বছর অনেকটা সময়। অনেকগুলো বছর। বিশেষত আজকের যুগে, যখন সমাজ আর মানুষের ভোল মাসে মাসে, হয়তো বা দিনে দিনে পাল্টায়। পাল্টাবেই তো। বদলানোরই তো কথা। ছন্দে ছন্দে রঙ না-বদলালে বলতে হবে দুনিয়া আর ঘুরছে না বন্‌বন্‌ করে। পশ্চিম জার্মানি আবার এমন এক দেশ যা তার রাজধানী বনকে ঘিরে ঘোরে না বন্‌বন্‌। এ দেশ ঘোরে বরং কোলোন-কোলোন, মিউনিখ-মিউনিখ, হামবুর্গ-হামবুর্গ ক'রে।

কলিকাতার কলিকাতাতেই থাকার সঞ্জীবীয় থিয়োরিটাকে মেনে নিয়ে করোলারির মতো বলা যায়—কোলোন এখনও কোলোনেই আছে। কোলোন বললে যে জিনিসটার কথা মধ্যবিত্ত বাঙালির চট্ করে মনে হওয়া উচিত, সেটিও—চেশায়ার বেড়ালের হাসির ঢঙে হলেও—এখনও কোলোনেই।

ও-ডি-কোলোন। গত আট বছরে অনেককিছু পাল্টালেও ৪৭১১ নম্বরটা এ শহরেরই ঐতিহাসিক সম্পত্তি। তারপর ধরুন, কোলোনের সঙ্গে আর যে বিশাল জিনিসটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই প্রকাণ্ড ক্যাথিড্রালও গেল আট বছরে কোলোন ছেড়ে নড়েনি। তবে তার কারুকার্যমোড়া বাইরেটায়, ক্যাথিড্রালের গায়ে লেগেছে হালকা 'যাই-যাই'। ক্যাথিড্রাল নড়তে না-চাইলে কি হবে, শহরের বিষাক্ত বাতাসের কামড়ে ক্যাথিড্রালের গায়ে ধরেছে হাজা। এখানে ওখানে খসে পড়ছেন আদ্যিকালের দেবশিশু। কত শত বছর আগে ওস্তাদের ছেনি-বাটালির ঘায়ে যে সন্ত অবয়ব পেয়েছিলেন এই মহাগির্জার বাইরের দেওয়ালে, আধুনিক ওস্তাদদের প্রসাদপুষ্ট বিষাক্ত নাগরিক বাতাসের অদৃশ্য তীরের আঘাতে তিনি আজ শূর্পনখা সেজেছেন। এককালে যেখানে তাঁর নাক ছিল, আজ সেখানে খোঁদল। কালের যাত্রার ধ্বনি আজকাল আর শুনিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যাথিড্রালের পেছনেই কোলোনের চিরসঙ্গী রাইন নদী। ইনিও এখনও যথাস্থানেই। কোলোনেই। এঁকে স্থানচ্যুত করতে গেলে বিধাতার, স্বয়ং বিধাতার হস্তক্ষেপ দরকার। তিনি এখনও রাইনে নাক গলাননি দেখছি। তবে মানুষ গলিয়েছে। গোটা চার-পাঁচ পেল্লায় পেল্লায় রাসায়নিক কারখানার ভয়ানক বিষাক্ত আবর্জনা আর অন্যান্য কলকারখানার রাজ্যের জঞ্জাল নির্বাণ লাভ করে রাইনের জলে মিশে। কোলোনের আবর্জনা গঙ্গা পায় না, রাইন পায়। টক্সিক্ পদার্থের মোক্ষ যেখানে, মানুষের তৈরি এইসব উপাদেয় জিনিস নানান আধুনিক নর্দমা বেয়ে এসে যেখানে যাত্রা শেষ করেছে, মাছ নামে একটা প্রাণী সেখান থেকেই শুরু করছে তার মহাযাত্রা। গত আট-দশ বছরে রাইন হয়ে দাঁড়িয়েছে জলের প্রাণীদের ভবনদী। সভ্য, শিল্পোন্নত মানুষের উৎসাহে পেরিয়ে যাচ্ছে তারা এ নদী অলিম্পিকের সোনা জেতা সাঁতারুদের মতো। কারখানার মালিকরা রাইনের ধারে দাঁড়িয়ে মাছেদের মহাপ্রস্থান দেখবেন আর হাততালি দেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না। নদীর জল এখন এত নোংরা যে বড় বড় লোকেদের গা গুলোয়। ফলে তাঁরা আমোদ-আহ্লাদ করছেন সেই একঘেয়ে মুনাফা দেখে দেখে। আর রাইনের বিষাক্ত স্রোতে গঙ্গা-পাওয়া মাছেদের লাশ এসে লটকে যাচ্ছে কোলোনের গায়ে। গুন্টার গ্রাসের ফ্লাউণ্ডার যদি আজ রাইনের মাছ হতো তো আধলা ইঁটের মতো উপন্যাসখানা জুড়ে বুক্নি ঝাড়ার সুযোগ পেতো না বাবাজী। কথাটথা সব আটকে যেতো আবর্জনায়। কিছু পাঠকও হয়তো তাতে উপকৃত হতেন। কে বলতে পারে!

গুন্টার গ্রাসদের একটা সুবিধে আছে। মাছের মুখ দিয়ে ইতিহাস-ভূগোল-

দর্শনটর্শন বলিয়ে নিয়েই তাঁরা খালাস। মাছেরা যেখানে থাকে, সেই নদীনালার দিকে ভাল করে তাকানোর ফুরসত তাঁদের নেই তেমন। এটা যাঁদের আছে, মানুষকে যদি বাঁচতে হয় তো সুস্থ পরিবেশ ছাড়া গতি নেই—এই চেতনা যাঁদের আছে, তাঁরা আজ পশ্চিম জার্মানির রাজনীতিতে কায়েম। সবুজ দল।

গত আট বছরে এই সবুজ দলের উত্থান পশ্চিম জার্মানির রাজনীতি ও সমাজ জীবনে একটা বিরাট ঘটনা। যা কিছু সুস্থ পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর, সবুজ দল তার শত্রু। পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে তোলার চেয়ে বরং মুনাফাযোগ্য ও যুদ্ধযোগ্য করে তোলার দিকেই যাঁদের নজর, তাঁদেরও শত্রু সবুজ দল। অর্থাৎ এঁরা পরিবেশবাদী ও শান্তিবাদী। সবুজ রংটা সচরাচর যাঁদের মনের রং, এই দল তাঁদেরই প্রতিনিধি এই দেশে। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে ছাত্রছাত্রী এঁদের আসল সমর্থক। এবং সবুজদের র‍্যাডিক্যাল দর্শন পশ্চিম জার্মানির তরুণতরুণীদের মধ্যে অনেকের মনেই গভীর দাগ কেটেছে।

ক্ষতিকর প্রযুক্তির জাঁতাকল থেকে মুক্তি পাবার অভিলাষ এ-দেশের অনেকের, বিশেষত অল্পবয়সীদের মধ্যে আজ যতটা স্পষ্ট, আট বছর আগে ততটা ছিল না। চেরনোবিলের বিপর্যয় বেশ ভাল মতো নাড়া দিয়েছে পশ্চিম ইউরোপের জনগণকে। কারণ, পরমাণু রিয়্যাকটর তো এখানেও। কাজেই রাসায়নিক কারখানাগুলোর পরিবেশ ধর্ষণের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধেও এসব দেশে আজ অনেকে সোচ্চার। কিছুদিন আগে কোলোনে পরমাণুবিরোধী শিল্পীদের আঁকা পোস্টারের একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল। তার একটাতে লেখা : "লাস্ট ঠেয়োরিয়েন্ স্টেয়র্বেন, আনস্টাট্ মেন্শন্"-মানুষের বদলে থিয়োরিগুলোকেই বরং মরতে দাও। আর একটা পোস্টারের বিষয় : একটি ছেলে রূপকথার একটা বই আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ছে। বইটার নাম : হিরোসিমা চেরনোবিল ও অন্যান্য রূপকথা।

অপর একটা পোস্টার কমিক স্ট্রিপের কায়দায়। ভয়ানক এক বিস্ফোরণে ঘরের জিনিসপত্র চারদিকে ছিট্‌কে যাবার ছবি। প্রেমিকার কণ্ঠ : "গেল বারে তো এতো গরম হয়নি"। প্রেমিকের মন্তব্য : "আজকাল ওরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে, সোনা।" সময়ও এগোচ্ছিলো সমানে। আট বছর ধরে। যেতে যেতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল এক নদীর। পশ্চিমি দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এইড্‌স্ রোগের। চারদিকে নাকি এইড্‌স্। এ-দেশের সবকটা পত্রিকার প্রচ্ছদে এইড্‌স্। ভালমন্দ, শস্তা-দামি, সরু-মোটা, ডান-বাম কাগজপত্রে প্রবন্ধ-নিবন্ধ আলোচনা-সমীক্ষা খবর-কেচ্ছা হুঁশিয়ারি গদ্য-পদ্য-অভিযোগ হাহুতাশ : এইড্‌স্। কী করে এই রোগ ছড়াচ্ছে, কী কী না করলে রেহাই মিলতে পারে, কী কী করলে নির্ঘাৎ এইড্‌স্-তার সচিত্র ফিরিস্তি। কদিন আগেও যাঁরা কসম খেয়ে বলতেন-"কমিউনিজম বা রাশিয়াই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু", আজ তাঁরা কেঁদে বলছেন : "না না, এইড্‌স্।" লাল সন্ত্রাস, পীত সন্ত্রাসের দিন বোধ হয় বিগত। এসে গিয়েছে নতুন

দানব। স্বয়ং কার্ল মার্কস বেঁচে থাকলেও হয়তো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর গোড়ার একটা শব্দ কেটে দিয়ে নতুন সংস্করণের জন্য লিখে দিতেন-''এইড্‌স্''।

পশ্চিম ইউরোপের প্রায় হাজার চারেক লোক এখন এই ভয়ানক রোগের শিকার বলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এ ব্যাপারেও পরাশক্তি। সেখানে একত্রিশ হাজার। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের এইড্‌স্ রোগীদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে প্রতি নয় থেকে এগারো মাসে। ফ্রান্সে ১২২১ জন এ রোগে ঘায়েল। পশ্চিম জার্মানিতে ৮৭৫ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ধারণা, পশ্চিম ইউরোপে পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ লোকের দেহে এই রোগের জীবাণু সেঁধিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। সংক্রামিতদের শতকরা দশ থেকে তিরিশ জনেরও যদি সত্যি সত্যিই এইড্‌স্ হয় তাহলে সামনের পাঁচ বছরের মধ্যে শুধু ইউরোপেই মারা যাবেন পঞ্চাশ হাজার থেকে তিন লক্ষ মানুষ।

এই ভয়ানক অসুখটার বলি যাঁরা হলেন, তাঁরা তো গেলেনই। কিন্তু এর শিকার যাঁরা এখনও নন তাঁদের সামাজিক আচরণে এইড্‌স্-এর ভয় যে কতটা পরিবর্তন আনতে পারে তা এখনো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা ইউরোপে, তবে আভাস পাওয়া যাচ্ছে বইকি। এই রোগের ভয় মানেই নারী-পুরুষের মেলামেশায় ভয়। নিবিড় সম্পর্কের ভয়। অ্যাডভেঞ্চার হেম্‌লক্‌বৎ পরিত্যাজ্য। বিয়ে না করলেও ভয়, করলেও ভয়। প্রেম নিবেদনে ভয়, পাছে মিঞা-বিধির ঐকমত্য রোগজীবাণুকে নিয়ে যায় এক দেহ থেকে অন্য দেহে। অতএব কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে প্রেমই উঠে গেল এ পাড়া থেকে। পাকা আস্তানা গাড়বে সন্দেহ। নতুন কোন মুখ? সে কি এইড্‌স্-এর এজেন্ট? নতুন প্রতিবেশী? সর্বনাশ, এইড্‌স্ বোধহয় পাশের ফ্ল্যাটে ছুরি শানাচ্ছে।

ভয়ের, ত্রাসের, মড়কের আভাস এখানে ওখানে। তবু ইউরোপ এখনো ইউরোপেই। কোলোন এখনও কোলোনেই। রাইনের বারোটা বেজে গিয়েছে বলে রেস্তোরাঁয় এক গেলাস কলের জল চাওয়ার দিন বিগত, কোলোনের ঘরে ঘরে ওয়াটার ফিল্টারের রেওয়াজ, তবু এখনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রেমিক-প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলেছেন রাইনের পাশেপাশে। এইড্‌স্‌কে সপাটে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দুটি সুদর্শন তরুণ আদর করল পরস্পরকে। প্রকাশ্যে, দিনদুপুরে। আট বছর আগে এ দৃশ্য এখানে এভাবে দেখিনি। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গিনী এই দুই নগর গেরিলাপ্রেমিকের দিকে বিদ্বেষ ও সেই সঙ্গে কিছুটা অনুকম্পা, কিছুটা ভয়ের চোখে তাকালেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ফণা তুললো এইড্‌স্। ছেলে দুটির নির্মল আদরে কিন্তু ও-রোগ নেই। ''প্রতিবাদহীন সর্বজনীন প্রেম''—এর শরিক এক যুবক তার প্রেমিকাকে চুমু খেলেন সুন্দর করে। রাইন বলে উঠলো : ''আমাকেও ও-থেকে একটুখানি দাও, নোংরা অবজ্ঞা দিও না, আবর্জনা দিও না; আমিও তো তোমাদেরই একজন।''

কতকটা ওরকমেরই ভাবনা নিয়ে আয়ারল্যাণ্ড থেকে আসা একদল তরুণ-তরুণী ক্যাথিড্রালের চত্বরে বেশ ঘটা করে, মাইক-টাইক লাগিয়ে গান ধরেছেন। আইরিশ বিপ্লবের গান। ইংরেজিতে। জার্মান শ্রোতারা ভাষা না বুঝলেও সুর-তাল-ভাব তারিফ করছেন সদলবলে। আমরা তো আসলে সকলেই সকলের। নয় তো আর শীতের মধ্যেও খোলা জায়গায় কাঁপতে কাঁপতে ভিনদেশীয়দের মুখে ভিনভাষায় গান শোনা কেন?

অল্প দূরে এক শিল্পী ঐ গান শুনতে শুনতেই আপন মনে ছবি এঁকে চলেছেন রাস্তার ওপর। রং খড়ি দিয়ে। একটি মেয়ের মুখ। শিল্পী দেখছি মেয়েটির চোখদুটো খুব সযত্নে আঁকার পর তার টুপিটাকে গাঢ় রঙে, খুব গাঢ় রঙে আঁকছেন। অনেকক্ষণ ধরে, সমানে গভীর রঙ বোলাচ্ছেন। ঘন করে। যেন টুপিটা খুব জরুরি। ওটা মজবুত হওয়া চাই। ঘনরঙের ঠাসবুনোট যেন বাঁচাতে পারে ঐ সুন্দর মেয়েটাকে অ্যাসিডবৃষ্টির ঝাপ্‌টা থেকে।।

# ক্লাউন, কিন্তু মেয়ে

মেয়ে পুলিশ, মেয়ে ক্রিকেট-খেলোয়াড়, মেয়ে মন্ত্রী, মেয়ে সেপাই সবই তো দেখেছেন। মেয়ে ক্লাউন দেখেছেন কখনও? ছেলেরা, পুরুষেরা যে সব কাজ বা পেশা অনেক যুগ "কেবল পুরুষদের জন্য" বলে আগলে রেখেছিল, মহিলারা, মেয়েরা তার অনেকগুলোই ছিনিয়ে নিয়েছেন। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ওরকম লেবেল-সাঁটা স্রেফ অযৌক্তিক। পুরুষদের বিস্তর গোঁয়ার্তুমি আর মৌরসি পাট্টা যে সার্টের গায়ে ইচ্ছে করে লাগানো কালির দাগের মতো, বিশ্বের ধোপানিরা তো সেটা সেই কোন যুগ থেকে আছড়ে আছড়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু ক্লাউনের বেলা? আমি পেশাদার ক্লাউনদের কথা বলছি।

মঞ্চের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে বেজায় আটপৌরে ছোপছাপ লাগা কাপড় পরা, বেশ মোটাসোটা এক মহিলাকে। এঁর নাম হানা। বিদূষী হানা আরেন্টকে বাদ দিলে 'হানা' নামটা জার্মান ভাষী দুনিয়ার পুরুষদের তেমন নাচায় না। এই নামটার মধ্যে কেমন যেন একটা সেকেলে-সেকেলে গন্ধ আছে। আজকের মৌতাত নেই, রঙ নেই। মঞ্চে যে হানাকে দেখছেন, এ-দিক দিয়ে তিনি সার্থককামী। যে কাজটি তিনি করছেন সেটি এমন কি খোদ হেলেন অফ ট্রয়কে করতে দেখলেও পুরুষদের বুকে কাব্য সুড়সুড়ি দেবে না। মঞ্চে হানা কাপড় কাচছেন। রাজ্যের ময়লা কাপড় নিয়ে ব্যাজারমুখে কাচতে বসেছেন হানা। পেশায় তিনি ধোপানি। অপরের ঘাম

আর ময়লা সাফ করতে করতে, রগড়াতে রগড়াতে এক সময়ে দুত্তোর বলে উঠে দাঁড়ালেন হানা। কোত্থেকে একটা প্লাসটিকের নাক বেরিয়ে এল। লাল রঙের নাক। ক্লাউনরা যেটা কিনা নিজের নাকের ওপর লাগিয়ে নেন। বেশ গোল আর থ্যাবড়া-মতো। ময়লা কাপড় পরা, পৃথুলা ধোপানি হানার ব্যাজার মুখে এবারে সেই লাল প্লাসটিকের নাক। ফলে মুখটা আর ঠিক ব্যাজার দেখাচ্ছে না। ক্লাউনের নাকটার মতোই হানা এবারে, ভোজবাজি যেন,—একটা বই টেনে বের করলেন। সামান্য একটু স্বগতোক্তি। বোঝা গেল, এই কেতাবে জোন অফ আর্ক থেকে শুরু করে বিশ্বের যতো বীর মহিলাদের গল্প আছে। ময়লা কাপড়ের পাঁজা ভুলে ধোপানি হানা এবারে তাঁর লাল থ্যাবড়া নকল নাকটা প্রায় গুঁজে দিলেন বইয়ের পাতায়। এবারে স্বপ্ন দেখছেন হানা। স্বপ্ন দেখছেন সংগ্রামের। জোন অফ্ আর্কের মতো নেমে পড়েছেন তিনি শত্রু নিধনে। তাঁর কাঁধে একটা চেলা কাঠের ক্রুশ। মোল্লার দৌড় যদি মসজিদ পর্যন্ত হয় তো এই বীর ধোপানির দৌড় কতোটা? শিরোস্ত্রাণ-পরা ইয়া গোঁফঅলা প্রতিপক্ষের জায়গায় হানাকে রণে আহ্বান করছে পুরুষদের জামাকাপড়, মায় অন্তর্বাস। কাপুরুষ শত্রুর মতোই পুরুষদের ইজেরগুলো ক্লাউন ধোপানি হানাকে আক্রমণ করছে পেছন থেকে। পৃথুলা হানা বীর বিক্রমে লড়াই করছেন ইজেরগুলোর সঙ্গে। যে কাঠের গদাটা দিয়ে এর আগে তিনি ব্যাজারে মুখে কাপড় কাচছিলেন, সেটাই এখন তাঁর হাতিয়ার। আত্মরক্ষার ও পুরুষ-ইজের-শত্রু বা কাপুরুষ-ইজের-শত্রুদের ঢিট করার অস্ত্র।

হানার ভূমিকায় ছিলেন সুইৎজারল্যাণ্ডের মেয়ে গার্ডি হুটার। তিনি পেশাদার ক্লাউন। মোটাসোটা ধোপানির ভূমিকাটা তিনি নিজের জন্য তৈরি করে নিলেও আসলে তাঁর গড়ন ছিপছিপে। ক্লাউনরা সাধারণত মুখে রঙ মেখে নেন। সুইৎজারল্যাণ্ডের এই মহিলা ক্লাউন গার্ডি হুটার তার ধার ধারেন না। ক্লাউনরা সাধারণত ইচ্ছে করে বোকা সাজেন, বোকামির ভান করেন, যেটা হলে বা যেটা করলে অপরে হেসে ওঠে, ক্লাউনরা ঠিক সেই কম্মটি করেই বিষণ্ণতার ভান করেন। তাঁদের ব্যথার মুখোশ দেখে লোকে হেসে উঠবে, আকাটপনা দেখে লোকে গড়িয়ে পড়বে, এটাই তো চিরকেলে রীতি। গার্ডি হুটার এই রীতি মানেন না তেমন। তাঁর ধোপানি হানা বিষণ্ণ নন, বিরক্ত। একঘেয়ে সনাতন মহিলাসুলভ এই কাজ (অপরের কাপড় কাচা), তাঁর পেশা আর জগৎ সংসারের ওপর রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে ভয়ানক ব্যাজার মুখে হানার আবির্ভাব । তারপর সেই বিরক্তি, একঘেয়েমি ঝেড়ে ফেলে তাঁর স্বপ্ন। স্বপ্ন থেকে সংগ্রাম। আপাতদৃষ্টিতে এই সংগ্রাম হাস্যকর। দর্শককে হাসাতে তো হবেই, নয়তো আর ক্লাউনের তামাশা কিসের? কিন্তু আসলে কি তাই? যে-কোনও দর্শক সহজেই টের পাবেন, এই মহিলা ক্লাউনটি কিন্তু বোকামির ভান করছেন না। দর্শকদের দিকে তিনি না-তাকাচ্ছেন হাবাগোবার চোখে, না-তাকাচ্ছেন কপট বিষণ্ণ মুখে। এ-ক্লাউনের দৃষ্টিতে বরং ফুটে উঠছে ক্রোধ, বিদ্বেষ। বিদ্রোহ। একটি

মুহূর্তের জন্যেও ক্লাউনের হাবেভাবে তামাশা নেই, অসহায়তা নেই নির্বুদ্ধিতা নেই। যে বিদ্বেষ ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন তিনি পেছন থেকে হামলে-পড়া পুরুষদের জামাকাপড় আর অন্তর্বাসের দিকে, সেই একই দৃষ্টি তাঁর দর্শকদের ওপরেও নিবদ্ধ। একটানা সত্তর মিনিটের এই অনুষ্ঠানে দর্শকরা প্রথমে হাসবেন বটে এই মহিলা ক্লাউনকে দেখে, কিন্তু তারপর কোনও এক সময়ে তাঁদের হাসি পাবে পুরুষদের ওই পোশাকগুলোর কথা ভেবেই। সুইৎজারল্যাণ্ডের গার্ডি হুটারের অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে আর ক্লাউন নন, ক্লাউন বরং ওই হানাদার পুরুষ পোশাকগুলো। হানা ক্লাউন নন, হানাদারেরা ক্লাউন। বেদনাদায়ক হাস্যকররকম অযৌক্তিক বরং এই গোটা ব্যবস্থাটা যেখানে একদল কাপড় ময়লা করবে, আর অপর এক দল সে কাপড় কেচেই যাবে।

এই অদ্ভুত, ধোপানি হানা তাই এক সময়ে আর ময়লা কাপড় কাচছেন না, কাপড়ের ময়লা অংশগুলো তিনি কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক যেমন, বিশেষ বিশেষ সমাজব্যবস্থায় ময়লাগুলোকে আর চিরাচরিত পদ্ধতিতে ধুয়ে কেচে সাফ করা যায় না, তাতে লাভ হয় না বিশেষ; কারণ ও ময়লা আবার গজায়, ফিরে ফিরে আসে। ও জঞ্জাল তাই কেটে সাফ করে দেওয়াই ভাল।

হাসির নাটকে, তামাশায় মৃত্যু নাস্তি। মৃত্যু এমনই জিনিস যে অতিবড় শত্রুও মারা গেলে মানুষ এক ধরনের স্বস্তি পায় হয়তো, কিন্তু হেসে ওঠে না তাই বলে। তেমনি, ক্লাউনের কোনও অনুষ্ঠানেই ক্লাউন আর যাইই করুক, যতো ব্যথাই পাক, সে মরবে না। বিদূষক অমর। কিন্তু সুইৎজারল্যাণ্ডের এই মহিলা ক্লাউনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ধোপানি হানার পরিণতি মৃত্যু। তাঁর সংগ্রামে যেমন, তাঁর মৃত্যুতেও তেমনি মোটাসোটা নেহাতই সাদামাটা হানা আর ঠিক ধোপানি নন, তিনি সংগ্রামী, এমন কি তিনি শহিদ।

এ কেমন ক্লাউনপনা, এ কেমন তামাশা, যার শেষ হয় মৃত্যুতে? এ প্রশ্ন করলে পাল্টা প্রশ্ন করা যায় : শুধু ময়লা সাফ করতে করতে, অপরকে ময়লা করতে দিতে দিতে, হেঁসেল ঠেলতে ঠেলতে, বাপের না দেওয়া যৌতুকের মাশুল দিতে দিতে, মেয়ে হয়ে জন্মানোর বা একটি বিশেষ শ্রেণীতে জন্মানোর শুল্ক দিতে দিতে কতো মানুষ ফুরিয়ে গেল, মরে গেল, মরে যাচ্ছে,—এ কেমন তামাশা? সুইৎজারল্যাণ্ডের মেয়ে গার্ডি হুটার জানেন, রঙ্গ-বিনোদনের দুনিয়ায় মেয়েরা ক্লাউন হন না। মেয়ে ক্লাউন জগতে কজন, মানে পেশাদার ক্লাউন? ইউরোপে আজ একজন মেয়ে ক্লাউন করে খাচ্ছেন, অনেক দিনের একটা রীতিকে উল্টে দিয়ে। তাই যদি হয় তো ক্লাউনপনার রীতি, তামাশার নিয়মগুলোকেই বা উল্টে দিলে দোষ কি? মানুষ তো মরছেই, যেখানে সেখানে যতরকমভাবে সম্ভব বা অসম্ভব,-মরছে। মানুষের জীবনটাকে নষ্ট করে দেওয়ার, মানুষকে যেভাবে হোক মেরে ফেলার কল তো

মানুষ বানিয়েই চলেছে অবিরাম। সেই সঙ্গে হাসছে। তাহলে ক্লাউন মরলেই বা মানুষ হাসবে না কেন?

১৯৬৮ সালের ছাত্র বিপ্লবের সময়ে গার্ডি হুটার ছিলেন ছাত্রী। ইউরোপে এই প্রজন্মকে বলা হয় ৬৮'র প্রজন্ম। তিনি বলছেন—'আমার প্রজন্মের অনেকেরই মতো আমি প্রথমে চেয়েছিলাম সরাসরি রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে। পারলাম না। তারপর চাইলাম এমন একটা সামাজিক পেশা বেছে নিতে যেটা আমাকে, ছোট আকারে হোক, সুনির্দিষ্ট কোনও কোনও জিনিস বা অবস্থা পাল্টাতে সাহায্য করবে। তা কতোটা পেরেছি জানি না। শেষ পর্যন্ত ধরেছি শিল্পের পথ।" শিল্প যদি পরিবর্তন না আনল, পাল্টে না দিল, তো কিসের শিল্প? চিরকেলে পুরুষ ক্লাউনরা লোককে হাসিয়ে মারেন। আজকের মেয়ে ক্লাউন একটি সাধারণ খেটে খাওয়া মেয়ের ভূমিকায় (যে-মেয়ের মুখে রঙ নেই, রঙ আছে শুধু তার ক্লাউনের নকল নাকে) সে-মেয়েকে মেরে লোককে হাসাচ্ছেন। মেয়েরা ক্লাউন হয় না কেন সচরাচর? মেয়ে ক্লাউন গার্ডি হুটারের উত্তর : 'ক্লাউনের ক্লাসিক ভূমিকাটার সঙ্গে বোধহয় ভাবনার, স্বাধীনতার, একেবারে স্বাধীনভাবে ভাবতে পারার প্রশ্নটা জড়িত। অপরকে নিয়ে হাসতে পারে পরাধীন মানুষেও। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে নিয়েও হাসতে ও অপরকে হাসাতে পারার ক্ষমতাটা থাকে কেবল সত্যিকার স্বাধীন মানুষের। আমরা মেয়েরা অপরকে নিয়ে যত হাসি, নিজেকে, নিজেদের নিয়ে ততটা হাসি না বোধহয়। এই ক্ষমতা, এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করে নিতে হবে লড়াই করে।"

ঠিক যেমন মোটাসোটা সাদামাটা ধোপানি হানাকে লড়াই করতে হয়েছে। সে-লড়াই ধোপানিরও, আবার লাল প্লাস্টিকের নাক-পরা মেয়ে ক্লাউনেরও।

# গান ও নির্বাসন

তৃতীয় সুর আর ষষ্ঠ সুরের প্যাঁচে পড়ে গুপি গাইনকে বহুদূর যেতে হয়েছিল। সরকারি রোষানলের আঁচে পড়ে পূর্ব জার্মানির গণগাইন স্টেফান ক্রাভ্‌চিক্‌কেও যেতে হল বহুদূর। ৩২ বছর বয়সী গীতিকার, গায়ক স্টেফান ক্রাভ্‌চিক। দেশ পূর্ব জার্মানি। স্টেফানের চুল এত ছোটো করে ছাঁটা যে হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ক'দিন আগেই মাথা কমিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এক মুখ দাড়ি। অবিরাম কাঁচির শাসনে তা যেন কিছুতেই বাড়তে পারছে না। স্টেফানের গায়কজীবনের ওপরেও তো পড়েছে এক-ধরনের কাঁচি। কাঁচির শাসন। এ-শাসন শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। ঐ সময় থেকে স্টেফান ক্রাভ্‌চিক আর সরকারিভাবে পূর্ব জার্মানিতে কোনও গানের অনুষ্ঠান করতে পারেননি।

সরকারি স্বীকৃতির দরজাটা তার আগে কিন্তু খোলাই ছিল। গায়ক হিসেবে স্টেফান ক্রাভ্‌চিকের যা দাম, গীতিকার হিসেবে তাঁর মূল্য তার চেয়ে বেশি। এবং স্বরচিত গানের গাইয়ে হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ পূর্ব জার্মানিতে উজ্জ্বলই ছিল বলা চলে। গলাটা খুব জোরালো, আমাদের দেশের গণসংগীতবোদ্ধারা যাকে কিনা "বলিষ্ঠ" বলে থাকেন। গানের সঙ্গে নিজেই গিটার, মাউথ অর্গ্যান ও ব্যান্‌ডেনিওন নামে একটা যন্ত্র বাজান, যা দেখতে কতকটা অ্যাকর্ডিয়নের মতো, আওয়াজটা অবশ্য ভীষণ খ্যান্‌খ্যানে আর তীব্র।

এই যন্ত্রটাই বেশি বাজান তিনি। বোধহয় এই কারণেই তাঁকে সারাক্ষণ অত জোরে গাইতে হয়, নয়তো বাজনার দাপটে গানটান সব ঢাকা পড়ে যাবে যে। স্টেফান ক্রাভ্চিকের গায়কির আর এক বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর কণ্ঠস্বর যেন সারাক্ষণ একই গ্রামে বাঁধা। উত্থান-পতন বিশেষ নেই। তাঁর গানের ভাষা যারা বুঝবেন না তাঁদের মনে হবে, পাড়া মাৎ করে কী-একটা জরুরি কথা তিনি যে বলে দিতে চাইছেন সুর করে। হয়তো কোনও ঘোষণা। যদি তা মনে হয় তো ভুল হবে না। ''দুত্তোর, এ-কেমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা/হয় থাকো নয় ভাগো,/ভাগিয়ে-দেওয়া বন্ধুদের সম্পর্কের সুতো/রঙচঙে পোস্টাকার্ডের চেয়ে পুরু নয়।/হায় ইতালি, স্বপ্নে-মাখামাখি এক টুকরো আবেগ,/তোমার চুড়োয় গায়ে কি-সুখেই চুমু খাওয়া যেত,/এ-দেশের হিংসুটে মালিকরা চায়,/আগে চুমু খাই আমি ওদের জুতোয়।/আশা রাখি এতোটা নামবোনা,/যে দূরের হাতছানি এ-মাটিতে হামাগুড়ি দেওয়াবে,/দূরের বান্ধবীকে তাই আজই বলে দেবো,/সে যেন এখন শুধু চিঠিই লেখে।''-শিথিলতম গদ্য-তর্জমায় স্টেফান ক্রাভ্চিকের একটি গানের এই অংশটুকু হয়তো বলে দেবে তাঁর জরুরি কথাটা কেমন ধারা।

এমনধারা গান তিনি ৮১ সালেও লিখতেন না। সে-সময়ে তাঁর গাওয়ার ভঙ্গিটাও ছিল আধো-আধো। কেউ কেউ বলত-ছেলেটা গান লেখে বেশ, কিন্তু ঠিক গেয়ে উঠতে পারে না। এ হেন স্টেফান ক্রাভ্চিক ১৯৮১ সালে পূর্ব জার্মানির এক গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুরস্কারটি নিয়েছিলেন তিনি পূর্ব জার্মানির খোদ সংস্কৃতিমন্ত্রীর হাত থেকে। সরকারি স্বীকৃতির দরজা এই তরুণ শিল্পীর সামনে তো খোলাই ছিল। চাইলে তিনি পূর্ব জার্মানির এক প্রাতিষ্ঠানিক গীতিকার-গায়ক হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চাইলেন না। তাঁর গান অন্যদিকে যেতে শুরু করল। এককাট্টা সরকারি আমলাতন্ত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক অনমনীয়তার বিরুদ্ধে পূর্ব জার্মানির যুবশক্তির একটা বড় অংশ অনেকদিন ধরেই সংগঠিত। আর এক গীতিকার-গায়ক ভল্ফ বিয়ারমান ও পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট হাফেমান একসময়ে এঁদের গুরুস্থানীয় ছিলেন। সে প্রায় এক যুগ আগের কথা। ৮৫ সাল থেকে স্টেফান ক্রাভ্চিকের যা অবস্থা, তার বছর দশেক আগে ভল্ফ বিয়ারম্যানের সেই একই অবস্থা ছিল। তাঁর গানের ওপরেও ছিল সরকারি নিষেধ। বিয়ারমানকে পূর্ব জার্মান সরকার হঠাৎ পশ্চিম জার্মানিতে জলসা-সফরে আসার অনুমতি দেন।

বিয়ারমান দিব্যি খোশমেজাজে অনুষ্ঠান করছেন পশ্চিম জার্মানিতে, এমন সময়ে পূর্ব জার্মান সরকার তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নিলেন। সে তো সেই সত্তর দশকের কথা। বিয়ারমান সেই থেকে পশ্চিম জার্মানির বাসিন্দা। পূর্ব জার্মানির গীতিকার-গায়কদের সারিতে প্রতিবাদী মানুষ হিসেবে বিয়ারমানের যে জায়গাটা ছিল, তিনি নির্বাসিত হবার পর সেই জায়গায় আর অনেকদিন কাউকে পাওয়া যায়নি তেমন। স্টেফান ক্রাভ্চিক সেই শূন্যতা ভরিয়ে দিতে শুরু করলেন। তাঁর গান হয়ে উঠতে

লাগল পূর্ব জার্মানির নবীন প্রতিবাদীদের গান। না, ভুল করবেন না। সমাজবাদের বিরোধী তাঁরা নন। সাম্যবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই নীতিগত কোনও বিরোধ নেই। তাঁরা শুধু তাঁদের দেশের সরকারি বজ্র-আঁটুনির বিপক্ষে। দেশময় আরও উদারনীতি আসুক, সরকার যা বলবেন সেটা ছাড়া অন্য কিছুই চলবে না তা কেন হবে, পূর্ব জার্মানির সমাজব্যবস্থা আরও মুক্ত হয়ে উঠুক, আমলাতন্ত্রের চাপ কমুক—এই হল তাঁদের দাবি। '৮১ সালের পর স্টেফান ক্রাভ্চিকের গানে এই দাবিই ভাষা পেতে শুরু করে। ফলে '৮৫ সালে সরকার হুকুম দেন-এই গায়ক আর প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করতে পারবেন না।

স্টেফান ক্রাভ্চিককে তারপর পূর্ব জার্মানির আরও অনেক তরুণ প্রতিবাদী শিল্পীর মতো গির্জার আশ্রয় নিতে হল। সে-দেশের গির্জার আশ্রয়ে এক নতুন ধরনের আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ হল যাকে বলে 'নীচের-তলার গির্জা'। এই আন্দোলন গির্জার ছত্রচ্ছায়ায় থাকলেও আসলে তা র‍্যাডিকাল রাজনীতিমুখী। সেখানে সরকারবিরোধীরা ভিড় জমান। সমবেত হন পরিবেশবাদীরা, শান্তিবাদীরা। গির্জার ভেতরে সরকার অতোটা নাক গলাতে পারেন না, খুব একটা চানও না, ফলে প্রতিবাদীরা সেখানে মোটামুটি মুক্ত পরিবেশে মিলিত হতে পারেন, মতবিনিময় করতে পারেন। '৮৫-র নিষেধাজ্ঞার পর স্টেফান ক্রাভ্চিক ঐ ধরনের গির্জাতেই গান গাইতে লাগলেন। গানটা যেহেতু গির্জার ভেতরে হচ্ছে, সরাসরি প্রকাশ্যে নয়, সরকার তাই আর কিছু বললেন না। ১৯৭৮ সাল থেকে পূর্ব জার্মানির গির্জার সঙ্গে সরকারের মোটামুটি একটা বোঝাপড়াও হয়ে গিয়েছে। ফলে এই তরুণ শিল্পী একের পর এক অনুষ্ঠান করে যেতে পারলেন, তবে কেবলমাত্র গির্জায় গির্জায়। তাঁর গানের পর শ্রোতারা পয়সা দিতেন। সেই চাঁদার টাকায় স্টেফান ক্রাভ্চিক ও তাঁর স্ত্রী ফ্রায়া ক্লিয়ারের চলে যাচ্ছিল কোনও রকমে। ফ্রায়া ক্লিয়ার আবার নাটক করতেন। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে গান আর নাটক মিশিয়ে তাঁরা একটা নতুন মাধ্যমও তৈরি করে নিয়েছিলেন,-এক নতুন আঙ্গিকের সমালোচনাপূর্ণ অনুষ্ঠান।

স্টেফান ক্রাভ্চিকের ভক্তের সংখ্যা পূর্ব জার্মানিতে বাড়তে থাকল। বিয়ারমানের জায়গাটা তিনি প্রায় পুরোপুরিই নিয়ে ফেললেন। ইতিহাসের খেলা এবারে অন্যরকম। বিয়ারমান যখন পূর্ব জার্মানিতে বসে প্রতিবাদী গান বাঁধছিলেন ও গাইছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্বাচভের যুগ তখন দূর অস্ত। মাঝের ক'বছরে রাশিয়ার ভল্গা আর দুই জার্মানির নদী এল্‌বে দিয়ে বিস্তর জল বয়ে গিয়েছে। স্টেফান ক্রাভ্চিক যখন পূর্ব জার্মানির গির্জায় গির্জায় প্রতিবাদের গান লিখছেন আর গাইছেন, ক্রেম্‌লিন থেকে গর্বাচভও ততদিনে সজোরে ডাক পাঠাতে শুরু করেছেন উদারনীতির। গ্লাসনস্তের হাওয়া পূর্ব জার্মানির নবীন প্রতিবাদীদের ছুঁয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। তাঁদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে আরও তীক্ষ্ণ। ততক্ষণে তাঁরা আরও সক্রিয়, সরব, বেপরোয়া। রোজা লুক্‌সেমবুর্গের বাণী লেখা পোস্টার নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়ছেন তখন পথে।

তাতে লেখা : "যাঁদের মত, চিন্তাধারা অন্য, তাঁদের স্বাধীনতাটাই তো স্বাধীনতা।"- পূর্ব জার্মানির এই প্রতিবাদী প্রজন্মকে, তাঁদের দাবিদাওয়াগুলোকে বুঝে নেওয়া দরকার তাঁদের এই স্লোগানের সুরে, রোজা লুক্সেমবুর্গের চিন্তাধারার আলোয়।

ইতিহাসের আর এক খেলা : ১৯৮৬ সালে, বার্লিন মহানগরীর ৭৫০-তম জন্মদিন পালন করা হল পূর্ব পশ্চিম দুদিকেই, মহাসমারোহে। একই শহরকে নিয়ে দু'পাড়ায় দুই মহোৎসব, মাঝখানে এক বিরাট পাঁচিল। বার্লিনের বুকচেরা দেয়ালটা কিন্তু বার্লিন-উৎসবের শরিক হতে পারল না। পূর্ব জার্মানির গীতিকার স্টেফান ক্রাভ্চিক এই উৎসবকে নিয়ে গান লিখলেন : 'উৎসবের বছরে আমি একবার পশ্চিম বার্লিন যেতে চাই তবে সরকারি দপ্তরে জুতোর শুকতলা না খুঁইয়ে।/নগরপাল যখন বলবে- 'অতোই যদি সখ, ওপারেই পালাও না বাপু',/আমি তখন তেরছাভাবে পশ্চিমে নয়, সোজাসুজি পুর্বদিকেই যাবো হেঁটে হেঁটে।/....উদোম উৎসব আমিও করতাম, যদি কারণ থাকতো,/খবরকাগজ এত রদ্দি একঘেয়ে না হলে ভোর-ভোর উঠে পড়তাম ঠিকই।/পূব আর পশ্চিমের বাচ্চারা আমাদের দু'তরফের আবর্জনা সাফ করার পর/হয়তো একদিন সেই উৎসব করবে, আমি যার মাঝেমাঝে স্বপ্ন দেখি।..."

বার্লিন উৎসব প্রায় শেষ হতে চলেছে এমন সময়ে, গত নভেম্বরে ক্রাভ্চিক ও তাঁর স্ত্রী ফ্রায়াক্লিয়ার পূর্ব জার্মানির নেতাদের উদ্দেশে লেখা একটি খোলাচিঠি পাঠ করলেন প্রকাশ্যে। আহ্বান করলেন—"সোভিয়েত ইউনিয়নে যে উদার নীতির আর্দশ তৈরি হয়েছে, পূর্ব জার্মানির নেতারা এবারে অন্তত তা অনুসরণ করুন এবং এক নতুন সমাজবাদী চিন্তাধারা ও পদ্ধতি চালু করুন।' চিঠিটি বেশ জোরালো ভাষাতেই লেখা। পূর্ব জার্মান সরকারের প্রতিক্রিয়াও হল সমান জোরালো। তাঁরা স্টেফান ক্রাভ্চিকের ওপর চরম নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন : তিনি আর কোনও অবস্থাতেই কোথাও গান গাইতে পারবেন না বা অনুষ্ঠান করতে পারবেন না। গির্জাতেও নয়। বেশকিছু বছর আগে ভল্ফ বিয়ারমানের বেলা যা হয়েছিল, ঠিক সেটাই আবার হয়ে গেল তরুণ গায়কের বেলা। পূর্ব জার্মানির প্রতিবাদী শিল্পী আর তরুণ-তরুণীদের সামনে স্টেফান ক্রাভ্চিক এবার হয়ে উঠলেন লড়াইয়ের পূর্ব প্রতীক। ক্রাভ্চিক অবশেষে হয়ে উঠলেন আজকের বিয়ারমান। এই হয়ে-ওঠাটা অবশ্য পূর্ব জার্মানির ঘটনাধারার নিরিখে।

একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয়, পূর্ব জার্মানির দুই প্রজন্মের দুই প্রতিবাদী গীতিকার গায়কের মধ্যে অমিলও রয়েছে। বিয়ারমানের গানে সন্দেহবাদের পাশাপাশি এক গভীর মানবতাবাদী সমাজবাদী ভাবনা কাজ করে গিয়েছে যা প্রখর সমালোচনার সঙ্গে কোমলতাকেও প্রশ্রয় দেয়। বিয়ারমানের সন্দেহবাদ কখনও তাঁর আশাবাদের কণ্ঠরোধ করেনি। তাঁর গানে শুধু প্রবল সমালোচনাই নয়, নিবিড় মানবতা, হাসিঠাট্টাও স্থান পেয়েছে। তাঁর গায়কিও তাই আলাদা। তাতে আবেগের উত্থান-পতন লেগেই আছে। গানের আঙ্গিকেই কিভাবে বিকট রাগে ফেটে পড়তে হয়, ধারালো ব্যঙ্গের

চাবুক চালাতে হয় বিয়ারমান তা জানেন। আবার ফিসফিস করে বলার কথাগুলো তিনি ফিসফিস করেই বলেন, তাঁর গিটারটি তখন তাঁর হয়ে গান গেয়ে যায়। স্টেফান ক্রাভ্চিকের গানে সন্দেহবাদের সহযাত্রী হলো রাগ, বিক্ষোভ। কোমলতার স্থান নেই সেখানে। তাঁর গানের কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করেন সক্রোধে। তাঁর বাজনার ধরনও সেই মতো। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, পূর্ব জার্মানিতে প্রতিবাদীদের সমালোচনা দিনে দিনে আরও ধারালো, আরও জোরালো হয়ে উঠছে। ক্রাভ্চিক নিজেই এক জায়গায় বলেছেন : "অনেক দিন ধরে যা ভেতরে ভেতরে পাকাতে থাকে, শেষমেষ তা পরিণত হয় রাগে।"

গত দোসরা ফেব্রুয়ারি পূর্ব জার্মান সরকার স্টেফান ক্রাভ্চিক ও তাঁর স্ত্রীকে পশ্চিম জার্মানিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বদেশের নাগরিকত্ব খুইয়েছেন তাঁরা। ক্রাভ্চিক তাঁর বার্লিনের গানে লিখেছিলেন—"তেরছাভাবে পশ্চিমে নয়, সোজাসুজি পূব দিকেই যাবো হেঁটে হেঁটে।"—তাঁকে কিন্তু তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে সেই পশ্চিমেই আসতে হল, যা তাঁরা মোটেও চাননি। তাঁর গানের গুরুত্ব ছিল কিন্তু পূবে। পশ্চিম জার্মানিতে তিনি থাকতে চান না। পশ্চিমি দুনিয়ায় থাকতে চান না তিনি। বিয়ারমানও তা চাননি, চান না। কিন্তু বিয়ারমানের মতো তাঁকেও থাকতে হবে এমন এক দেশে যেখানে লোকে তাঁর ভাষাতেই কথা বলে তবু যেন ভিন্ভাষী। তাঁর প্রতিবাদী গানের আসরে প্রথমে জমবে কৌতূহলীদের ভিড়, সাংবাদিকদের ভিড়। তারপর একদিন, ক্রাভ্চিক যদি তখনও এখানে থাকেন,—তাঁর প্রতিবাদী গান ঠাঁই পাবে পশ্চিমি টেলিভিশনের "বিনোদন অনুষ্ঠানে"—যেখানে গিটার-হাতে বিয়ারমানকে বছরে কয়েকবার দেখা যায়।

# বার্‌বারার চোখে রবীন্দ্রনাথ

*"And you want to travel with him*
*And you want to travel blind*
*And you know you can trust him*
*For he touched your perfect body with his mind."*

**Leonard Cohen (Suzanne)**

বার্‌বারা আজারি পশ্চিম জার্মানির মেয়ে। বয়স চল্লিশ। থাকেন কোলোনের কাছেই। পেশায় তিনি আলোকচিত্র শিল্পী। কিন্তু শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি তিনি এ-দেশে এখনো পাননি। ক'রেকম্মে খান বিদ্যে ভাঙিয়ে, এ-পর্যন্তই। তার বেশি তাঁকে কেউ চেনে না।

ছেলেবেলায় তাঁর হাতে পৌঁছে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের একখানি বই। ছোট ছোট কিছু উক্তি ও উদ্ধৃতির সংকলন। হয়তো-বা কোনও কবিতার বা গানের দুটি লাইন। বইটি ছিল ছোট্ট। সেই ছোট্ট বইটি দিয়েই রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে ছোট্ট বার্‌বারার পরিচয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বার্‌বারা আজারির নিত্যসহচর। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্য কিছু বইও পড়েছেন জার্মান তর্জমায়। কিন্তু ছেলেবেলায় আবিষ্কার করা সেই ছোট্ট সংকলনটির স্থান অন্য কিছুই নিতে পারেনি।

ফোটোগ্রাফিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব নেবার আগে বার্‌বারা তাঁর নিজস্ব

রবীন্দ্রভাবনাকেই ফোটো-প্রজেক্টের বিষয় করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট্ট একটি সংকলনের ওপর পশ্চিম জার্মানির কোনও মেয়ে যে ছবি তুলবেন এবং সেই ছবির সিরিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার জন্য জমা দেবেন, এটা শিক্ষকদের কল্পনাতেও ছিল না। শেষ পরীক্ষার এই প্রজেক্টে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একজন করে লোক ঠিক করে দেওয়া হয়। কিন্তু বার্‌বারা আজারির প্রকল্পের কথা শুনে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এত হতভম্ব হয়ে গেলেন যে, এ-ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য করতে চাইলেন না। তাঁদের যুক্তি : এ-প্রকল্প এত কঠিন ও উদ্ভট যে সহায়তা করার লোক পাওয়া অসম্ভব।

বার্‌বারা আজারি কিন্তু করে ছাড়লেন। খেতাবও পেলেন। অলোকচিত্রের এই সিরিজটির ওপর তিনি একটি বইও বের করলেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের উক্তি। অন্যদিকে বার্‌বারার ক্যামেরায় তোলা ছবি। বইটি তিনি আদ্যোপান্ত নিজেই তৈরি করেন এবং নিজেই প্রকাশ করেন। এবারেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও বিস্তর খরচে। বইগুলি তিনি তারপর পরিচিত মহলে উপহার দেন।

বার্‌বারার আশা ছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে তিনি যেমন সেই ছেলেবেলাতেই নড়ে উঠেছেন, আর পাঁচজনেও হয়তো সেইভাবে নড়ে উঠবেন। আর, এতে সহায়তা করবে তাঁর ছবিগুলি। কিন্তু ফল হল না।

তখন পশ্চিম জার্মানিতে ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন চলছে। বার্‌বারা তাতে জড়িয়ে পড়েন সচেতনভাবেই। তাঁরই কথায় বলতে গেলে : "পৃথিবীটাকে পাল্টাতে চাইছিলাম আমরা। সময়টাকে পাল্টাতে চাইছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সমাজটাকে পাল্টাতে গেলে মানুষের মনের ভেতরেও পরিবর্তন আনতে হবে, আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে এই ভেতরের পরিবর্তনে সহায়তা করবেন রবীন্দ্রনাথ। আমি তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমার-চেনা রবীন্দ্রনাথকে যে-ভাবে পারি আমার সতীর্থদের কাছে, আমার সমকালের কাছে পৌঁছে দিতে। আমার মনে হয়েছিল, আমাদের মানসিকতায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন আসা দরকার।"

রবীন্দ্রনাথের বিক্ষিপ্ত কিছু ভাবনার প্রতিঘাতে ছবি-তোলার প্রয়াস ছিল ঐ লক্ষটাকে সামনে রেখেই। কিন্তু সতীর্থদের মনে হয়েছিল, বার্‌বারার কাজ বড় উঁচুস্তরের। সাধারণের ভাবনা অত দূর পৌঁছবে না।

এর বহু বছর পর ১৯৮৪ সালে বার্‌বারা আজারি ঐ ছবিগুলি দিয়েই মিউনিখে একটি প্রদর্শনী করেন। আবার রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিগুলি সাজালেন তিনি। এবারে মিউনিখের শিল্পীসমাজ কিছুটা আগ্রহ দেখালেন। একেবারে নতুন আঙ্গিকের কাজ, তাই শিল্পীদের আগ্রহ থাকবেই। কিন্তু সাধারণ দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। কোনও কোনও শুভার্থী পরামর্শ দিলেন—ছবিগুলো বেচে দাও যেখানে পারো, তাতে অন্তত পয়সাটা উঠে আসবে।

কিন্তু পয়সা ওঠানো বা বানানো কোনও উদ্দেশ্যেই—বার্‌বারা এ-কাজ করেননি।

তাঁর গোঁ,—রবীন্দ্রনাথের ওপর এই কাজগুলো দিয়ে তিনি ব্যবসা করবেন না।

বার্‌বারা আজারি তাঁর সংকল্প আঁকড়ে পড়ে আছেন এতগুলো বছর। মিউনিখের ঐ প্রদর্শনীই তাঁর রবীন্দ্রপর্বের শেষ প্রদর্শনী। অন্যদের আগ্রহের অভাব দেখে তিনি তাঁর এই কাজগুলি লুকিয়ে ফেলেছেন। কাউকেই আর দেখান না বড় একটা। এখন তিনি পেশাদার কাজ করছেন অন্যান্য বিষয়ে।

বার্‌বারা আজারির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটনাচক্রে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভাবিয়েছেন জানতে পেরে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম ছবিগুলো দেখাতে। সে-ছবির ছবিও তুলতে দিয়েছেন তিনি আমায়। আর দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলার সুযোগ। ছেলেবেলায় পাওয়া রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট সংকলনটি আজও এই জার্মান মহিলার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সংলাপ চলেছে আজও। এ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ।

**প্রশ্ন : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই নামটির সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হয়েছিল কীভাবে?**

বার্‌বারা আজারি : বাবার লাইব্রেরির বইপত্র ঘেঁটে। তার মধ্যে পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের বই। পড়তে শুরু করেছিলাম।

**প্রশ্ন : বই-এর নাম মনে পড়ে?**

বার্‌বারা : ছোট্ট ছোট্ট পকেট-বই। একটির নাম ছিল 'জোনাকি' (জার্মান অনুবাদ)। বাবার বেশিরভাগ বই ছিল মোটা মোটা। তারই ফাঁকে পেয়ে গেলাম ছোট্ট একটি বই। আমি নিজেও তো তখন ছোট। তা ভাবলাম, বড় বইগুলো তো বড়দের, ছোট্ট এই বইখানা নিশ্চই আমার মতো ছোট্টদের জন্য। এ-বই আমি নিশ্চই পড়তে পারব, পড়ে বুঝতে পারব। পড়ে ফেললাম। যাই-ই বুঝে থাকি না কেন, আমার ছোটবেলার সেই ছোট ছোট উপলব্ধি আজও আমার সহচর।...রবীন্দ্রনাথের সেই ছোট্ট বইখানি পড়ে প্রথমে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি কোথাও।

**প্রশ্ন : অবাক হয়েছিলেন কেন, মনে পড়ে?**

বার্‌বারা : মনে পড়ে বৈকি। তখন আমার বয়স সাত কি আট। কত বছর চলে গেল, ভুলিনি তাও। বিস্ময়টা কোথায় ছিল জানেন,...ঐ ছোট্ট বইটির ছোট ছোট কথা যেন আমার ভেতরটা স্পর্শ করছিল। শিশুর অন্তরটা শিশুর বড় নিজস্ব। বড়রা সচরাচর তার খবর রাখে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐ কথাগুলো যেন বেজে উঠছিল একটা অদ্ভুত ঘণ্টার মতো। আর তাঁরই অনুরণনে বেজে উঠছিল আমার ভেতরকার একটা লুকোনো ঘণ্টা। কথাগুলো যেন আমার ভেতরে একটা সুর তুলছে। সুরটা আমার নিজস্ব। কিন্তু বাইরের ঐ সুরটা না বেজে উঠলে আমার অন্তরের সুর যেন বেজে উঠত না অমন করে।

**প্রশ্ন : বাইরের ঘণ্টাটা কী বলছিল আপনাকে?**

বার্‌বারা : সব তো একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মনে নেই। একটি উক্তি ছিল

যেমন : চিরনৃত্যের বৃত্তে কেন্দ্রবিন্দুটি কিন্তু স্থির, নীরব। ব্যাস্, এটুকুই। ছোট ছোট কথা, কথার টুকরো, হয়তো শুধু একটি বাক্য লেখা ছিল। তার বেশি নয়।

**প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের কোনও ছবি ছিল সেই ছোট্ট বইটিতে?**

বার্‌বারা : নাঃ। রবীন্দ্রনাথের একখানা ফোটোগ্রাফ প্রথম দেখেছি বেশ বড় হয়ে। তাও আবার ছবিটা ছিল বাজে।

**প্রশ্ন : ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো পড়ে, তা নিয়ে ভেবে, মনে মনে তাঁর ছবি আঁকতে চেষ্টা করেননি কখনও?**

বার্‌বারা : না। একবারও না। আঁকার দরকার কী? কথাগুলো পড়তে পড়তে ভাবতে ভাবতে বক্তার একটা ছবি আমার মনের মধ্যে তৈরিই হয়ে গিয়েছিল। নিজে থেকেই। চেষ্টা করে কল্পনা করতে হয়নি।

**প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাত-আট বছরের ছোট্ট মেয়ে বার্‌বারার পরিচয় না হয় হল। তারপর?**

বার্‌বারা : তারপর তেত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে। ছেলেবেলায় পড়া সেই ছোট্ট বইটা আজও আমার সঙ্গী। যেখানেই গিয়েছি, দুটি জিনিস আমার সঙ্গে থেকেছে। আমার বাঁশিটা, আর ঐ ছোট্ট বই। বইখানা কাছে না থাকলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

**প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বই পড়েননি?**

বার্‌বারা : কয়েকটি উপন্যাস পড়েছি অনুবাদে। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এইসব। বেশি বয়সে পড়া বই। তাঁর কাহিনির নারীচরিত্রগুলো আমার খুব কাছাকাছি। এই দেখুন, বলতে বলতেই আমার মনে পড়ছে 'চোখের বালি'। আমার একটা সমস্যা হল, রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলো আমার এত চেনা লাগে যে আমি বড় সহজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলি ওদের মধ্যে। এ-একটা ফাঁদ, বুঝলেন! আমার কাছে অন্তত। আমার ভয় করে।—ছেলেবেলায় আবিষ্কার করা সেই প্রথম-রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমায় স্বস্তি দেন। না না, ঠিক বোঝাতে পারলাম না বোধ হয়। এইভাবে বলি : রবীন্দ্রনাথের চরিত্রবর্ণনা যেন আমারই বর্ণনা। বড় ভয়ানকভাবে আমার মতো। কিন্তু ধরুন, আমার মাথার ভেতর কত মুহূর্তে কত কথা জন্ম নিতে চায়। ভাবনাও বলতে পারেন। কিন্তু তার ভাষা? রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট উক্তি বা উদ্ধৃতির সংকলনে আমি বারেবারে দেখতে পাই আমার ভাবনাগুলোকে কিভাবে যেন আঁচ করতে পেরে তিনি আমায় ভাষার, উচ্চারণের খেই ধরিয়ে দিচ্ছেন। আমারই মনের কথাগুলো তিনি ছোট ছোট কথায় আমার চেয়ে ঢের মোক্ষমভাবে বলে দিয়েছেন। আমারই না বলা কথা কেউ কি-সুন্দর বলে দিল,—এই 'বলে-দেওয়ায়' একটা স্বস্তি, একটা সান্ত্বনা আছে না?—নিবিড়তম দুঃখ, আদিমতম সুখ—যে-কোনও মুহূর্তে তিনি আমার ভেতরের কথাটিকে এক-ধরনের মুক্তি দিয়েছেন। এর স্বাদ অন্য। এটা আমি

তাঁর কাহিনিতে পাই না। আমি কিন্তু পাঠিকা হিসেবে আমার একেবারে নিজের কথা বলছি।

**প্রশ্ন : তা হলে কি ধরে নেব—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপনি কখনও খুঁজছেন আত্মপক্ষের সমর্থককে, কখনও খুঁজে চ'লেছেন আপনার ভাবনার ধাত্রীকে, কখনও খুঁজছেন সান্ত্বনা?**

বার্‌বারা : আপনার কথাগুলোকে আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাই না। শুধু একটু সম্পূরণ করতে চাই। দেখুন, রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট উক্তি,—আমার কাছে যার একটি সংকলন রয়েছে সেই কবে থেকে,—এগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে যে তাঁর অভিজ্ঞতার গভীরতা ও পরিধি বিরাট। আমিও তো এক জীবন্ত মানুষ। আমার জীবনেও কিন্তু খুব গভীর অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার কাছে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার দাম অনেক। এগুলো আমার জীবন-দিয়ে অর্জন করা জিনিস। কোনও বড় লেখক বা শিল্পীর বই পড়ে, বা ছবি দেখে এগুলো জোগাড় করিনি আমি। স্বাধীন মানুষ ও নারী হিসেবে আমার যে জীবন-নিংড়ানো গভীর অভিজ্ঞতা, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার গভীরতায় আমি তার দোসরকে খুঁজে পাই।—এই যে ধরুন, প্রতিদিনের বেঁচে-থাকা, এর বেশির ভাগটাই তো বাহ্যিক। ওপরে-ওপরে যা ঘটছে সেটা নিয়েই ব্যস্ত আমরা। এক ঘটনা থেকে দ্রুত চলে যাচ্ছি আমরা অন্য ঘটনায়। ঘটনার অন্তরালে যে অভিজ্ঞতা, তা নিয়ে ভাবার অবকাশ কই! অথচ এই ভাবনাটা জরুরি। এ-জন্য একটু স্থির হওয়া চাই। অভিজ্ঞতাগুলোকে একটু স্থির হয়ে তলিয়ে দেখা চাই। নয় তো সে অভিজ্ঞতা হজম হয় না। মগজের মধ্যে তা অর্থপূর্ণ হয়ে ধরা দেয় না। ভাবনার বনেদ গড়তে গেলে, আমি মনে করি, অভিজ্ঞতার অর্থ খুঁজতে হয়। যতক্ষণ না মর্মটা স্বচ্ছ হয়ে উঠছে, ততক্ষণ এক-একটি অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবতে হবে। অভিজ্ঞতাগুলোকে খতিয়ে না দেখে তার ওপর দিয়ে শুধু হেঁটে গেলে কোনও কিছুরই মর্ম বোঝা যায় না। আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার মর্ম খুঁজেছিলেন ও বুঝেছিলেন। তাঁর ছোট ছোট উক্তির মধ্যে আমি সেই সন্ধানের অন্বেষণের পরিচয় পেয়েছি। আপনি বলছিলেন আমার আত্মপক্ষের সমর্থন খুঁজে পাওয়া। সমর্থন তো বটেই। সেই সঙ্গে আত্মভাবনার মুক্তিও বলতে পারেন। বলতে পারেন সংকটের নিরসন।—দেখুন, রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না। আমার তবু বারবার মনে হয়, ভেতরে ভেতরে তিনি বহু যন্ত্রণাকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। মনে হয় যেন, ইচ্ছে করেই। বাইরে তিনি কী করতেন, আমি জানি না। আমি শুধু জানি যে ভেতরে তাঁর বিষাদ ও যন্ত্রণার একটা প্রকাণ্ড ভাণ্ডার ছিল। এমনও হতে পারে যে অপরের দুঃখকেও খুব সহজে নিজের করে নেওয়ার একটা বিরাট ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর লেখায় আমি সেই সংবেদনশীল মানুষটিকে পাই, যাঁর আবেগের রং অসংখ্য।

**প্রশ্ন : অন্য কোনও লেখক কি আপনার মনে এতটা দাগ কেটেছেন কখনও?**

বার্‌বারা : না। হ্যার্‌মান্ হেসে হয়তো কিছুটা। কিন্তু হেসের প্রভাবটা বলতে

পারেন নিছক মগজসর্বস্ব। হৃদয়বৃত্তির যে প্রত্যক্ষতা আমি রবীন্দ্রনাথে পেয়েছি তার মাত্রা অন্য। একসময়ে এই পশ্চিম জার্মানির সমাজেই অল্পবয়সীদের মনে বিপ্লবচিন্তা এসেছিল। তখন ছিল ষাটের দশক। সেই সময়ে, কায়েমি এই যান্ত্রিক জীবনের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমরা হ্যারিম্যান হেসের কিছু কিছু চিন্তায় একধরনের প্রশ্রয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপর, উতরোল শেষ হয়ে যাবার পর ফিরে আসতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে।

**প্রশ্ন : আপনার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আর কেউ আছেন, যিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েন?**

বার্‌বারা : (তুমুল হাসি)—না না, এ-ব্যাপারে আমি একা। গোড়ার দিকে তো...(আবার হাসি)...গোড়ায় তো কেউই কিছু বুঝত না। ধরুন, রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট উক্তির স্মৃতিতে ভর করে আমি যখন ছবি তুলেছি, আমার সঙ্গীরা তখন হতভম্ব। ওদের ভাবখানা ছিল—আরে করছটা কী? এ দিয়ে তো টাকা হবে না! (হাসি)। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার সমসাময়িকদের মধ্যে দেখিনি তখন। মাঝে মাঝে, পরীক্ষা করার জন্য আমি আমার বন্ধুদের পড়তে দিয়েছি রবীন্দ্রনাথের বই। তারপর অপেক্ষা করেছি। ভেবেছি, এইবারে! এইবারে কিছু একটা হবে। কিন্তু কই? কোথাও তো কোনও পরিবর্তন হল না! কারও ভাবনায় তো সেই হাওয়াটা লাগল না, যা কিনা আমার ভাবনায় লেগেছে! এখানকার লোকে যেভাবে পোস্টার পড়ে, ঠিক সেইরকম মুখ করে তারা পড়েছে তখন রবীন্দ্রনাথ; বা পড়েনি। আমার ছবিগুলো দেখেছে, রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলো পড়েছে। অম্লানবদনে চ'লে গেছে,—যেন ওটা কোনও ব্যাপারই নয়।—কিন্তু হালে দেখছি অন্য ব্যাপার। এই তো সেদিন আমার এক বন্ধুর বাচ্চা হল। সেই খবরটা লিখে জানাতে গিয়ে দেখছি বন্ধুটি রবীন্দ্রনাথের একটি লাইনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

**প্রশ্ন : হঠাৎ করে এটা হল কেন?**

বার্‌বারা : কেন আবার, এতদিনে লোকের মাথায় একটু একটু করে ঢুকছে বলে। (হাসি)—তা ছাড়া আজকাল ছোট ছোট রঙিন ক্যালেণ্ডারে মাঝেমধ্যে দেখছি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি। নোট বইতেও। আরও একটা ব্যাপার ইদানিং হতে দেখছি। আজকাল ফোটোকপি, করা যায়। কারও হয়তো কোনও একটা লেখা ভাল লাগল, সে অমনি তার কতকগুলো ফোটোকপি করে পাঠিয়ে দিল তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে। এইভাবে অনেক লেখাই ছড়িয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের লেখাও। তার মানেই এই নয় যে সবাই সবকিছু বুঝে ফেলেছে। ভালও লাগছে কোনও একটা কারণে, এটাই বেশি।—আমার বাবার কাছে যেমন রবীন্দ্রনাথের বইগুলো ছিল সম্পদের মতো। সেকালে বইগুলো দেখতেও ছিল ভাল। রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট ছোট্ট সংকলন, কিন্তু কি সুন্দর দেখতে। দামও ছিল। হাতে টাকা না থাকলে ওগুলো কেনা যেত না।

**প্রশ্ন : ছেলেবেলায় আপনার বাবার সঙ্গে কখনও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কথা হয়েছে?**

বার্‌বারা : একবার বাবা আমায় পাকড়াও করে জানতে চেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ

যে পড়ছি, তার বুঝছি কতটুকু? আমি ঐ ছড়িয়ে-পড়া তরঙ্গের বৃত্ত আর স্থির কেন্দ্রবিন্দুর কথাটা বললাম। বললাম, আমি পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে দেখতে পেয়েছি যে কথাটা সত্যি। আমার বাবা বড় কড়া লোক ছিলেন। খুব মারধর করতেন। একদিন বাবাকে বললাম—যতই পেটাও না কেন, আমার খুব ভেতরে একটা স্থির শান্ত জায়গা আছে। তোমার মার অতদূর পৌঁছোয় না। এ কথা শুনে বাবা তাঁর রবীন্দ্রনাথের বইগুলো আমায় দিয়েছিলেন গম্ভীর মুখে। বেশি অবশ্য ছিল না।

**প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয়, আজকালকার চেয়ে আপনার বাবার আমলে জার্মানির মানুষ রবীন্দ্রনাথের লেখা বেশি পড়তেন?**

বার্‌বারা : বলা মুশকিল। আমার বাবা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বই দুটো পেয়েছিলেন, তাঁর বাবার কাছ থেকে। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন শিক্ষক। কই, আমার চেনাজানা অন্য কারও বাড়িতে তো রবীন্দ্রনাথের বই দেখিনি। ছেলেবেলাতেও না, পরেও না।

**প্রশ্ন : সাধারণত লোকে তাদের প্রিয় লেখক বা বই সম্পর্কে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।**

বার্‌বারা : রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কারও সঙ্গে তেমন কোনও কথা বলার সুযোগ আমার হয়নি। তার কোনও প্রয়োজনও বোধ করিনি। আমার স্বামীর সঙ্গেও না। অথচ আমার শ্বশুর রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে তাঁকে একবার অন্তত নিজের চোখে দেখার জন্য ইরান থেকে ভারতে গিয়েছিলেন। আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল ইরানে।...আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোটোগ্রাফি নিয়ে লেখাপড়া করি। ডিগ্রিও পেয়েছি এ-বিষয়ে। ডিগ্রির জন্য একটা বড় কাজ জমা দিতে হয়। আমার কাজটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের ওপর। বরং বলা উচিত, ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট উক্তি পড়ার পর আমার ভেতরে যেসব ছবির আভাস গড়ে উঠেছিল, সেগুলোকেই আমি বাইরের ছবি দিয়ে ধরতে চেয়েছি। ক্যামেরার মাধ্যমে।

**প্রশ্ন : আপনার এই ছবিগুলোর যে-কটা আমি দেখেছি তার বেশির ভাগই কবরখানার ছবি, সমাধির ছবি। আপনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের কথাগুলোই আপনার ছবির বিষয়। সম্পর্কটা কোথায়?**

বার্‌বারা : মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়। ছেলেবেলায় আমার এক আত্মীয় মারা যাবার পর আমায় কবরখানায় যেতে হয়েছিল। সেই থেকে আমি সুযোগ পেলেই কবরখানায় গিয়ে খেলা করতাম। আমার কাছে কবরখানাটা ছিল খেলার জায়গা। শহরের মধ্যিখানে এই জায়গাটাতেই অনেক গাছপালা দেখতাম। চারদিকে সবুজ। ভাল লাগত। কবরের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলা যেত চমৎকার।

কিন্তু খেলার এই জায়গাটিতেই যে আমার এক কাছের মানুষ ঘুমিয়ে আছেন, এটাও আমি জানতাম। তাঁকে যে আর কখনো পাব না, এটাও বুঝেছিলাম। গাছপালা আর কবর নিয়ে খেলাও ছিল, আবার সেই-বয়সের-মতো একটা গভীর দুঃখও

ছিল।—সবুজের ওপর রোদ্দুরের খেলা, ছায়ার খেলা, রং আর আলোছায়ার এই আনন্দ, আর তার নীচেই শোক। কবরের স্তব্ধতা, সেই স্তব্ধতার গভীরে মৃত্যু, শোক, দুখঃ, বিচ্ছেদ। আবার সেই কবরের ওপরেই আলোছায়ার প্রলেপ, আনাচে কানাচে চারাগাছ, ঝোপঝাড়,—সবুজ জীবন। জীবনের আস্ফালন আর মৃত্যু ও চিরবিচ্ছেদের স্তব্ধতা-এই দুটোকে ধরতে চেয়েছি আমি। রবীন্দ্রনাথের লেখা যতটুকু পড়েছি, তার মধ্যে জীবন ও মৃত্যু, আনন্দ ও বেদনা সরব ধ্বনি ও নীরব স্তব্ধতা, আলো ও ছায়ার এই অমোঘ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটাকে পেয়েছি বারবার। তাঁর ছোট ছোট লেখা একে চিনতে শিখিয়েছে আমায় সেই ছেলেবেলা থেকে। অনেক পরে সেই চেনা-মর্মটাকেই ধরতে চেয়েছি ক্যামেরা দিয়ে। তেমন কোনও পরিকল্পনা করিনি। ছবি তুলে গিয়েছি একের পর এক। আমার নিজস্ব রবীন্দ্রভাবনার ছবি।

**প্রশ্ন : কিন্তু এ-ছবি শুধু কবরখানায় কেন?**

বার্‌বারা : রবীন্দ্রনাথকে আমি আমার মতো যেটুকু ধরতে পেরেছি, তাঁর কিছু বাক্যের যে মর্ম আমায় স্পর্শ করেছে, তার ছবি যদি বানাতে হয় তো আমাদের এই সংস্কৃতিতে কবরখানাই হয়তো প্রকৃষ্ট জায়গা। আমাদের সভ্যতায় দেখুন, লোকে মারা গেলে তাকে কবর দেওয়া হয়। বেঁচে যারা আছে তারা মৃতকে কবর দিয়ে তার ওপর একটা পাথর চাপা দিয়ে দেয়। তার ওপরে সমাধিফলক। তাতে নানান বাণী লেখা। মৃত্যুকে আমরা যেন ধামাচাপা দিয়ে দিলাম 'মৃত্যু, তুমি এইখানে পাথরচাপা থাকো'—এই বলে। সেই পাথরে এসে আমরা মোমবাতি জ্বালাই, ফুল সাজাই,—তুলে-আনা ফুল, আর এক মৃত্যু। নকল আলো জ্বেলে আমরা কাঁদি। চোখ মুছে এক সময়ে চলে যাই,—যেন মৃত্যু আর কান্না ঐ কবরখানাতেই প'ড়ে রইল। এই হল আমাদের পরিপাটি চিন্তা। অথচ দেখুন পাথরচাপা, মৃতদেহের এলাকাতেই জীবন বেরিয়ে আসছে অদম্য উৎসাহে। কবরের চারপাশে গাছপালা। পুরনো কবর খুঁড়ে ছোট্ট চারাগাছ। তাতে ফুল ধরছে। পোকামাকড় কিলবিল ক'রে উঠছে। মৃত্যু আর পাথরচাপা রইল কই! সে তো অনন্ত জীবন হয়ে বেরিয়ে এল, আর হবি—তো-হ-এই কবরখানাতেই। চারপাশে শহরটা দেখুন। কটা গাছ? কটা পাখি? শহরের এই কবরখানাটায় আসুন। এটা তো মৃত্যুর পাড়া, মৃতদের পাড়া। অথচ এখানেই কিনা সবুজের সমারোহ, উড়ন্ত পোকাদের গুঞ্জন, এখানে পাখি। চারদিকে কত রোদ্দুর। আবার ছায়াও। মৃত্যু আর জীবন এখানে স্বচ্ছন্দে গলাগলি করছে এ ওর সঙ্গে। এ-গলাগলি, এ-সম্পর্কের ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমি সম্পর্কের পরিচয় পেয়েছি। তাই ছবি তুলেছি এখানে আর ছবির পাশে বসিয়েছি কবিকে। তাঁর কথাগুলোকে।।

## উপসংহার

বার্‌বারা আজারি কোনওদিন ভারতে যাবার সুযোগ পাননি। রবীন্দ্রনাথের জন্ম যে কলকাতায়, এ-তথ্যটুকু তাঁর জানা। তার বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথ যে গান লিখতেন, ছবি আঁকতেন, বার্‌বারার তা জানা ছিল না। এই লেখকের আগে কোনও বাঙালি বা উপমহাদেশীয়র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কথা বলার সুযোগও বার্‌বারা আজারির হয়নি। তাঁর প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের দেশের কোনও ব্যক্তিকে আলাদা আমন্ত্রণও জানাননি বার্‌বারা। বইটির প্রকাশকালে কোনও বাঙালি বা ভারতীয়র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না বলে সে-বই কোনও উপমহাদেশীয়র হাতে পৌঁছোতেও পারেনি! এসবের কোনও প্রয়োজনও বোধ করেননি বার্‌বারা। কারণ, তাঁর ধারণা, পৃথিবীতে সর্বকালে, সর্বত্র কিছু কিছু মানুষ জন্মান, যাঁদের চিন্তা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় বিশ্বপথিকের মতো। রবীন্দ্রনাথকে কোনও বিশেষ দেশ বা জাতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে জার্মানির এই খ্যাতিহীনা ভাবুক ও শিল্পী নারাজ।